বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ভূমিকা ১৯৪৭-৭১ (মার্চ)

বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ভূমিকা ১৯৪৭-৭১ (মার্চ)

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যোলয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

গবেষক

এ. এস. এম. মোহসীন

রেজিস্ট্রেশন নম্বর – ৪৩

শিক্ষাবর্ষ – ২০১১-২০১২

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষকের ঘোষণাপত্র

আমি এ. এস. এম. মোহসীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একজন এম.ফিল. গবেষক (রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ – ৪৩/২০১১-২০১২)। আমার গবেষণার বিষয় – বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ভূমিকা ১৯৪৭-৭১ (মার্চ)। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন (অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এর তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত অভিসন্দর্ভটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। এ অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোথাও কোনো ডিগ্রি অথবা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

(এ. এস. এম. মোহসীন)

রেজিস্ট্রেশন নম্বর – ৪৩
শিক্ষাবর্ষ – ২০১১-২০১২
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়নপত্র

এ. এস. এম. মোহসীন (রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ – ৪৩/২০১১-২০১২), ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত "বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ভূমিকা ১৯৪৭-৭১ (মার্চ)" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোনো অংশ কোনো ডিগ্রি অথবা প্রকাশনার জন্য অন্য কোথাও দাখিল করা হয়নি। এটি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার জন্য সুপারিশ করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

(ড.আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ - "বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ভূমিকা ১৯৪৭-৭১ (মার্চ)"। আলোচ্য বিষয়ে গবেষণা সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে আমি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন এর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা ছাড়া এ গবেষণা সমাপ্ত করা সম্ভব ছিল না। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. আহমেদ কামাল, ড. ইফতিখার-উল-আউয়াল, ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ড. সোনিয়া নিশাত আমিন, ড. নূরুল হুদা আবুল মনসুর, ড. রাণা রাজ্জাক, ড. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী, ড. আশা ইসলাম নাঈম, ড. আশফাক হোসেন, জনাব মোহাম্মদ গোলাম সাকলায়েন সাকী, ড. আলী মোহাম্মদ আমজাদ, ড. আকসাদুল আলম এবং মিস লুকনা ইয়াসমিন এর প্রতি। তাঁরা সবসময় আমার পড়ালেখার খোঁজখবর নিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। আমি আমার মা-বাবার কাছে কৃতজ্ঞ, যাঁদের ঋণ কখনই শোধ করা সম্ভব নয়।

(এ. এস. এম. মোহসীন)
রেজিস্ট্রেশন নম্বর – ৪৩
শিক্ষাবর্ষ – ২০১১-২০১২
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
সারসংক্ষেপ	১-২
প্রথম অধ্যায়	
ভূমিকা	৩-১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	
বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা	১১-২৫
তৃতীয় অধ্যায়	
ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ক্রমবিকাশ (১৯৪৭-৭১)	২৬-৪১
চতুর্থ অধ্যায়	
প্রাক সামরিক আমল (১৯৪৭-৫৮) ও সংবাদপত্রের ভূমিকা	৪২-১১২
পঞ্চম অধ্যায়	
আইয়ুব আমল (১৯৫৮-৬৯) ও সংবাদপত্র	১১৩-২২২
ষষ্ঠ অধ্যায়	
১৯৭০ সালের নির্বাচন, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও সংবাদপত্র : ১৯৭০-৭১(মার্চ)	২২৩-২৬৭
সপ্তম অধ্যায়	
উপসংহার	২৬৮-২৭১
পরিশিষ্ট	২৭২-২৮৪
গ্রন্থপঞ্জি	২৮৫-২৯৪

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে। ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮ ও ১৯৫২), ১৯৫৬ সালের সামরিক শাসন, ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালের ছাত্র আন্দোলন, আইয়ুব আমলে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এবং বাংলা ভাষা সংস্কার ও রবীন্দ্র সঙ্গীত বর্জনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ইত্যাদি ঘটনা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে একেকটি মাইলফলক বা ভিত্তিভূমি। এসব ভিত্তিভূমিকে অবলম্বন করে জনমতকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে এ সময় পত্রিকাগুলো যতটা সাংবাদিকতার নীতি ও আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি পরিচালিত হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও নীতির প্রভাবে।

ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রথম প্রকাশ ঘটে । এ সময় ভাষার পক্ষে যে সব যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে তার প্রায় সবই ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার পাতায় ছিল। তবে এ সময় পত্রিকাগুলো রাজনৈতিক আদর্শগত কারণে বাংলা ভাষার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে পারেনি। মুসলিম লীগ সমর্থক *মর্নিং নিউজ* ও *সংবাদ* ভাষা আন্দোলন বিরোধী ভূমিকা রাখে। *আজাদ* ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখলেও পত্রিকাটির নীতি ছিল অনেকাংশেই বৈপরীত্যমূলক। কারণ পত্রিকাটি অনেকক্ষেত্রেই বাংলা ভাষা বিরোধী সংবাদ, সম্পাদকীয় ও নিবন্ধ প্রকাশ করে। এর বাইরে *পাকিস্তান অবজারভার*, *ইনসাফ* ও *মিল্লাত* ভাষা আন্দোলনের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার আবির্ভাব হয়। এরপর থেকে বাঙালির প্রতিটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পত্রিকাটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। ফলে পত্রিকাটিকে একাধিকবার নিষিদ্ধ হতে হয়। *ইত্তেফাক* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াও একাধিকবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৭-৭১(মার্চ) কালপর্বে অপর উল্লেখযোগ্য পত্রিকা ছিল *আজাদ*। পত্রিকাটি সমগ্র পাকিস্তান আমলেই বৈপরীত্যমূলক নীতির পরিচয় রাখে। আগরতলা মামলা বা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে পত্রিকাটির যেমন শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে, তেমনি রবীন্দ্র সংগীতের বিরোধিতা, ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানের ইসলামি দিক সমর্থন, ইসলাম রক্ষার নামে মুসলিম লীগকে সমর্থন ইত্যাদি বিষয় পত্রিকাটির সাম্প্রদায়িক নীতির প্রকাশ ঘটিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সমগ্র পাকিস্তান আমলে মালিকানা পরিবর্তন ও অন্যান্য বিভিন্ন কারণে সবচেয়ে বেশি নীতির পরিবর্তন ঘটেছে *সংবাদ*-এর। দলনিরপেক্ষ পত্রিকা হিসেবে যাত্রা শুরু করেও বিভিন্ন পর্যায়ে *সংবাদ* মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এর সমর্থকে পরিণত হয়। পাকিস্তান আমলের ইংরেজি দৈনিক *পাকিস্তান অবজারভার* পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য তুলে ধরে, বাংলা ভাষা সংস্কারের বিরোধিতা করে ও রবীন্দ্র সংগীতের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে ইতিবাচক ভূমিকা রাখলেও পত্রিকাটি ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে আপোশমূলক নীতি নেয়। পত্রিকাটির মালিক হামিদুল হক চৌধুরী মহান মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী ভূমিকা পালন করেন। অপর ইংরেজি দৈনিক *মর্নিং নিউজ* সমগ্র পাকিস্তান আমলজুড়েই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরোধী অবস্থান নেয়। সরকারি পত্রিকা হলেও উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকেই *দৈনিক পাকিস্তান* একটি ভিন্ন চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয় এবং আন্দোলনের বিভিন্ন খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতে থাকে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময়ও পত্রিকাটির এই নীতি অব্যাহত ছিল। এ সময় ইংরেজি দৈনিক *দি পিপল* সরাসরি স্বাধীনতার দাবি নিয়ে আবির্ভূত হয়।

সমগ্র পাকিস্তান আমলেই রাজনৈতিক আদর্শজনিত কারণে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের মধ্যে বিভিন্ন বিভক্তি থাকলেও ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর এই বিভক্তি হ্রাস পায়। *মর্নিং নিউজ*, *পাকিস্তান অবজারভার* বা *দৈনিক সংগ্রাম* বাদে অধিকাংশ পত্রিকাই 'বাংলাদেশ' প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ নীতির প্রতিফলন ঘটায়।

সার্বিকভাবে বলা যায় যে, ১৯৪৭-৭১(মার্চ) সময়কালে বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকার ভূমিকা ছিল বৈচিত্রময়। *ইত্তেফাক* ধারাবাহিকভাবেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে ভূমিকা রাখে। এর সাথে বিভিন্ন সময়ে যুক্ত হয় *সংবাদ*, *মিল্লাত* ও *দি পিপলস*। *আজাদ* বিভিন্ন সময় প্রকাশিত সংবাদ ও সম্পাদকীয়তে সাম্প্রদায়িক নীতির প্রকাশ ঘটালেও পত্রিকাটি ১৯৬০ এর দশকের শেষে এসে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে অবস্থান নেয়। এমনকি সরকারি মালিকানাধীন হলেও *দৈনিক পাকিস্তান* বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে কৌশলী অবস্থান নেয়। সরকারি মালিকানাধীন অপর দৈনিক *মর্নিং নিউজ* সমগ্র পাকিস্তান আমল জুড়েই বাঙালি বিরোধী অবস্থান বজায় রাখে। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর অবস্থান পরিবর্তন ঘটে *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার। বাঙালি বিরোধী আরেকটি পত্রিকা ছিল জামায়াত-ই-ইসলামি সমর্থক *দৈনিক সংগ্রাম*। এই দু'একটি পত্রিকা ছাড়া ঢাকা থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ দৈনিক ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থক যেটি ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর একটি দৃঢ় ভিত্তি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ হলো একমাত্র দেশ যে দেশের অধিবাসীরা সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তবে এর প্রেক্ষাপট একদিনে তৈরি হয়নি। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো রাষ্ট্রের জন্মের পর ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে এই প্রেক্ষাপট। তাই বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৪৭-৭১ সময়কাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মূলনীতিকে পরিবর্তন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিবর্তে বাংলাদেশের পরিচিতি হয় পাকিস্তানের একটি অংশ হিসেবে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে নতুন প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের অধীনে চলে যায় পূর্ব বাংলার জনগণ, শুরু হয় পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সীমাহীন বৈষম্য। পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর নেমে আসে শোষণ, নির্যাতন। এসবের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ যে চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছে সেটি নিঃসন্দেহে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চৈতন্যের উন্মেষের ফলেই সম্ভব হয়েছে। এই জাতীয়তাবাদী চেতনায় বাংলার হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ সবাই ছিল বাঙালি। ১৯৪৭-৭১(মার্চ) পর্যন্ত সময়কালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে যেসব উপাদান ভূমিকা রেখেছে তার মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।

সংবাদপত্রে প্রতিফলিত জনমত

সংবাদপত্র সম্পর্কিত গবেষণা মূলত দুইভাগে বিভক্ত - সংবাদপত্রের ইতিহাস প্রণয়ন এবং সমসাময়িক ও জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা নির্ধারণ। সংবাদপত্রের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হলো জনমতের প্রতিফলন ও জনমত গঠনে এর শক্তিশালী ভূমিকা। সংবাদপত্রের পাতায় পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের লেখা প্রবন্ধ ও অভিমত, কলাম লেখকদের তর্কবিতর্ক, যুক্তি প্রদান ও যুক্তি খণ্ডন, পত্রিকার নিজস্ব সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় ইত্যাদি বিষয় জনমত গঠনে সাহায্য করে। ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে

Dhaka University Institutional Repository

জনমত তৈরিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রেডিও এবং টেলিভিশনের মতো গণমাধ্যমও জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখে। তবে তখন বর্তমান কালের মতো এত অধিক সংখ্যক টেলিভিশন বা রেডিও চ্যানেল ছিল না। রেডিও এবং টেলিভিশন ছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানায় অর্থাৎ সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং সেগুলোর ভূমিকা ছিল পাকিস্তানপন্থি। বিপরীতে সংবাদপত্রের মধ্যে কিছু ছিল সরকারি এবং কিছু বেসরকারি।[১] বেসরকারি মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংবাদ প্রকাশে সচেষ্ট ছিল। ফলে পাকিস্তান আমলে রেডিও বা টেলিভিশনের তুলনায় সংবাদপত্র জনমত তৈরিতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে পত্রিকা পাঠের অভ্যাস ছিল। সাহিত্যিক মাহবুব-উল-আলম এ বিষয়ে *ইত্তেফাক* পত্রিকার উদাহরণ দিয়ে বলেন, "সাধারণ বাঙালি – লেখাপড়া কম – কিন্তু পত্রিকা পড়তে অভ্যস্ত। এরূপ বহু বাঙ্গালিকে আমি দেখেছি নিয়মিত 'মোসাফির' এর লেখা পড়তে।"[২] পূর্ব বাংলার সংবাদপত্রের মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাসমূহ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কারণ সে সময় ঢাকাই ছিল পূর্ব বাংলার কেন্দ্র। ঢাকা থেকেই সবকিছু পরিস্রুত হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। এটি কিভাবে হতো সে বিষয়ে *ইত্তেফাক* পত্রিকার উদাহরণ দেওয়া যায়। সাংবাদিক কে. জি. মুস্তাফা এ বিষয়ে বলেন, "সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের শুধু 'পাঠক' ছিল এমন নয়, শ্রোতাও ছিল। হাটে, বাজারে, স্কুল-কলেজে, মাতব্বরের বাড়ির দাওয়ায় এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি বহুসংখ্যক শ্রোতার উপস্থিতিতে জোরে জোরে পড়া হতো। নিরক্ষর শ্রোতারা গভীর মনোনিবেশ সহকারে খবর, তার বিশ্লেষণ, মওলানা ভাসানীর আগুন ঝড়া ভাষণ, হোসেন সোহরাওয়ার্দীর চুল চেরা বিশ্লেষণে সরকারের সুযোগ উন্মোচন এসবই পাঠক ও শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। মানিক মিঞার রাজনৈতিক মঞ্চে চয়ন করা বিশেষ বিশেষ শব্দ গ্রাম বাংলার রাজনৈতিক কর্মীদের শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করত, তাদের চিন্তার খোরাক জোগাত।"[৩] এ কারণে ১৯৪৭-৭১(মার্চ) সময়কালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকাশনা পর্যালোচনা

১৯৪৭-৭১ সময়কালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে তথা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পটভূমি সৃষ্টিতে সামগ্রিকভাবে ঢাকার সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়ে আলাদা ভাবে তেমন কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি বললেই চলে। যে দু'একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোতেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং সংবাদপত্রের ভূমিকার বিষয়টি আংশিক ভাবে এসেছে। এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

১. পাকিস্তান আমলে সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে প্রধান যে গ্রন্থটি পাওয়া যায় সেটি হলো মোঃ এমরান জাহান রচিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র*।[৪] ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে লেখক পাকিস্তান আমলে অর্থাৎ ১৯৪৭-৭১ সময়কালে পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে দেশীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। গ্রন্থটি লেখকের পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভের পরিমার্জিত রূপ এবং তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণার পরিচয় বহন করে। তবে অসাবধানতাবশত গ্রন্থটিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং কিছু কিছু দৈনিক পত্রিকার ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে *আজাদ* এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে *ইত্তেফাক*-কে গুরুত্ব দেওয়া হলেও অন্যান্য অনেক পত্রিকার কথা বইটি থেকে জানা যায় না। যেমন – ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ক্ষেত্রে *আজাদ* ও *ইত্তেফাক*-এর কথা উঠে আসলেও *সংবাদ* ও *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার ভূমিকা গ্রন্থটিতে উঠে আসেনি। আইয়ুব আমলে ১৯৬২ সালের সংবিধান, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত সম্পর্কে ঢাকার সংবাদপত্রের ভূমিকা তেমনভাবে উঠে আসেনি। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পত্রিকার ভূমিকা গবেষণার বাইরে থেকে গেছে। আগরতলা মামলার বিবরণ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হলেও কি কি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে বা এর ভাষাগত কোনো পর্যালোচনা গ্রন্থটিতে পাওয়া যায় না। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে কেবলমাত্র *ইত্তেফাক* পত্রিকার ভূমিকা উল্লেখ করা হলেও *আজাদ, মর্নিং নিউজ, পাকিস্তান অবজারভার* – এসব পত্রিকার কোনো তথ্যই গ্রন্থটিতে উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি ১৯৭১ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে গ্রন্থটিতে কোনো তথ্য নেই।

২. আলোচ্য বিষয়ে দ্বিতীয় গ্রন্থটি হলো সুব্রত শংকর ধর রচিত *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*।[৫] এই গ্রন্থে লেখক বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস তথা উন্মেষকাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ক্রমবিকাশ তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। লেখক গ্রন্থটিকে সরাসরি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত না করলেও একাধিক শিরোনাম ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থটির বিষয়বস্তুকে মূলত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। এর প্রথম অংশে লেখক ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সংবাদপত্রের ক্রমবিকাশের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় অংশে ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা আলোচ্য গবেষণার সাথে সম্পর্কিত। তবে গ্রন্থটিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অনুপস্থিতি রয়েছে। যেমন – ১৯৬২ সালের সংবিধান, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য, আগরতলা মামলা, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে বাঙালি জাতীয়তাবাদের মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে কোনো তথ্য এই গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

৩. বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম রচিত *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*।[৬] লেখক এই গ্রন্থে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন, তবে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে সংবাদপত্রের ভূমিকা পরিপূর্ণভাবে উঠে আসেনি। গ্রন্থটির অন্যতম সীমাবদ্ধতা হলো - লেখক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সব পত্রিকাকে বিবেচনায় আনেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখক *ইত্তেফাক*-এর উদাহরণ দিয়েছেন এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে *আজাদ* ও *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার উল্লেখ করেছেন। এর ফলে ১৯৪৭-৭১ সময়কালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ পত্রিকাই বিশ্লেষণের বাইরে থেকে গেছে। যেমন - তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক ১৯৫৪ সালের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শিরোনাম করেছেন 'যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ও সংবাদপত্র'। কিন্তু এক্ষেত্রে কেবলমাত্র *ইত্তেফাক* ছাড়া অন্যান্য পত্রিকার ভূমিকা লেখক তুলে ধরেননি। একই ভাবে ১৯৫৪-৫৮ সাল পর্যন্ত বাঙালি জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র *আজাদ* ও *ইত্তেফাক* পত্রিকা, ছয় দফা এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে *ইত্তেফাক* ছাড়া অন্যান্য পত্রিকার ভূমিকা এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়নি। গ্রন্থটিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচন পর্যন্ত সংবাদপত্রের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়েছিল সেটি আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে অনুপস্থিত থেকেছে। গ্রন্থটিতে লেখক প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ে তথ্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন। যেমন - ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি গণপরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবি জানান- এই তথ্যটি লেখক মোট চারবার যথাক্রমে ৩৮, ৪১, ৪৫ ও ৪৭ পৃষ্ঠায় ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থটির ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে '১৯৭০ সালের নির্বাচন' কিন্তু লেখক এখানে ১৯৪৭-৬৯ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন যেটি আগেও একবার করা হয়েছিল।

৪. আলোচ্য গবেষণার সাথে সম্পর্কিত চতুর্থ যে গ্রন্থটি পাওয়া যায় সেটি হলো জুলফিকার হায়দার রচিত *বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা*।[৭] এটি সংবাদপত্রের ইতিহাসমূলক একটি গ্রন্থ। ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের সূচনালগ্ন থেকে অর্থাৎ ১৭৮০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯৬ সালের আওয়ামী লীগ সরকার পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস এতে তুলে ধরা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সমসাময়িক জাতীয় ঘটনাবলিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা তেমনভাবে গ্রন্থটিতে নেই। তবে সার্বিকভাবে বইটি গবেষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং ১৯৪৭-৭১(মার্চ) সময়কালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে উঠে আসেনি এবং পদ্ধতিগত গবেষণায় এই ভূমিকা পরিস্ফুটনের প্রয়োজন আছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

১৯৪৭-৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার জনগণের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্র কি ধরনের ভূমিকা পালন করেছে সেটি যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করে এ সময়ের ইতিহাস পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখাই এ গবেষণার উদ্দেশ্য। মুক্তিযুদ্ধের ওপর ইদানিং প্রচুর গবেষণা ও কাজ হচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং বাঙালি জাতীয় জীবনের মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত বিভিন্ন ঘটনা গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। এসব গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সংবাদপত্রের সহায়তা নেওয়া হলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে তথা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পটভূমি সৃষ্টিতে সামগ্রিকভাবে সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়ে তেমন কোনো কাজ হয়নি। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো গ্রন্থ নেই। আমাদের জাতীয় ইতিহাস প্রণয়নে এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন আছে। পাকিস্তান আমলে বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস প্রণয়নে বিষয়টি খুবই প্রয়োজনীয়। বর্তমান গবেষণা সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের বিষয়টি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সংযোজিত হবে।

গবেষণা পদ্ধতি ও উপাদান

সংবাদপত্রের নিরপেক্ষ নীতি বলে কিছু নেই। সংবাদপত্র সবসময় জনগণের একটি অংশের মত প্রকাশ করে। পাকিস্তান আমলে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো এর ব্যতিক্রম ছিল না। এ সময় ঢাকার পত্রিকাগুলো ছিল কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক ও মালিকানা পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে পত্রিকার চরিত্রও পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন- *সংবাদ* পত্রিকা ১৯৫১ সালের ১৫ মে একটি প্রগতিশীল পত্রিকা হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও আর্থিক সংকটের কারণে কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকাটি কিনে নেয় মুসলিম লীগ। এ সময় পত্রিকাটির ভূমিকা ছিলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরোধী। ১৯৫৪ সালে পত্রিকার মালিকানা পুনরায় পরিবর্তিত হওয়ায় এর চরিত্রও পরিবর্তিত হয়। মানিক মিয়ার সম্পাদনায় *ইত্তেফাক* পত্রিকার

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্র ছিল শুরু থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে। তাছাড়া ১৯৪৭ সালের পর ধীরে ধীরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং সামগ্রিকভাবে সংবাদপত্রের একটি চরিত্র গড়ে উঠতে থাকে। এক্ষেত্রে মূল উপাদান হিসেবে কাজ করেছে তৎকালীন সময়ে জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা। তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে হবে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসনের সূচনা, ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালের ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলন, আগরতলা মামলা ও ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে যদি চেতনার একেকটি মাইলফলক ধরা হয় তাহলে দেখতে হবে পত্রিকাগুলো এসব ঘটনাকে কিভাবে মূল্যায়ন করেছে। এক্ষেত্রে আমার গবেষণার পদ্ধতি হবে সম্পূর্ণভাবে পত্রিকা বিশ্লেষণ।

যে কোনো গবেষণা কর্মেই মুখ্য উপাদান ও গৌণ উপাদান ব্যবহার করা হয়। এই গবেষণায় মুখ্য উপাদান হিসেবে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র, বিভিন্ন সরকারি তথ্য বিবরণী, আরকাইভাল রেকর্ডস ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঢাকার সাপ্তাহিক পত্রিকার সহায়তা নেওয়া হয়েছে। অপরদিকে গৌণ উৎস হিসেবে ১৯৪৭-৭১ সময়কালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত দেশি বিদেশি গ্রন্থ ও বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন

আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর প্রথম অধ্যায় ভূমিকা যেখানে প্রকাশনা পর্যালোচনা এবং গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু আলোচ্য গবেষণার শিরোনাম বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ভূমিকা, তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আলোচনা অপরিহার্য। এই অধ্যায়ে ব্রিটিশ আমলে খণ্ডিত ও সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি এবং এরই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দেশবিভাগের সময় জাতীয়তাবাদের ধর্মীয় উপাদানটি সক্রিয় থাকলেও ধীরে ধীরে বাঙালি জনগণের কাছে এর অসারতা প্রমাণিত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

বৈষম্যের শিকার এ অঞ্চলের জনগণ ধীরে ধীরে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং এই চেতনার ভিত্তিতে সংঘটিত মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

তৃতীয় অধ্যায়ে ১৯৪৭-৭১(মার্চ) কালপর্বে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হয়েছে। পাকিস্তান আমলে সংবাদপত্রের প্রকাশনার সাথে জড়িত অধিকাংশ ব্যক্তিরা ছিলেন রাজনীতির সাথেও জড়িত। ফলে সংবাদপত্রের নীতিতেও এর প্রভাব পড়ে। পাশাপাশি আর্থিক ও অন্যান্য কারণে এ সময় পত্রিকার মালিকানাও পরিবর্তিত হয়। এ সবকিছু মিলে পাকিস্তান আমলে সংবাদপত্রের যে ক্রমবিকাশ সেটি তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ১৯৫৮ সালে প্রথম সামরিক শাসন জারি পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের মাইলফলক হিসেবে তিনটি পর্যায়কে সামনে রেখে ঢাকার সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ তিনটি পর্যায় হলো – ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮ ও ১৯৫২), ১৯৫৪ সালের নির্বাচন এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধান।

পঞ্চম অধ্যায়ে আইয়ুব আমলে অর্থাৎ ১৯৫৮ সাল থেকে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে সংবাদপত্রের ভূমিকা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে এ সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়কালে একদিকে যেমন আইয়ুব খান রাজনীতি ও সংবাদপত্রের ওপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করেন তেমনি এই স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয় একের পর এক আন্দোলন যা শেষ পর্যন্ত গণ-অভ্যুত্থানে পর্যবসিত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের এই বিকাশে সংবাদপত্রের ভূমিকাকে - সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র আন্দোলন (১৯৬২ ও ১৯৬৪), রাজনীতির ওপর বিধিনিষেধ, ১৯৬২ সালের সংবিধান, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত, ছয় দফা আন্দোলন এবং উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ইত্যাদি শিরোনামের অধীনে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত শিরোনামে রোমান হরফে বাংলা প্রবর্তন, লেখক সাহিত্যকদের সমর্থন আদায়, রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালনের বিরোধিতা, রবীন্দ্র সাহিত্য ও সাম্প্রদায়িকতা, বাংলা একাডেমির মাধ্যমে বানান সংস্কার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বানান সংস্কারের উদ্যোগ ইত্যাদি উপ-শিরোনামের অবতারণা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও এর পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী - এই দুটো পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। নির্বাচন পরবর্তী ঢাকার সংবাদপত্রের ভূমিকাকে ১৯৭১ সালের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাস অনুযায়ী পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের সপ্তম অধ্যায়ে উপসংহারে সামগ্রিক গবেষণার মূল্যায়নের মাধ্যমে সমাপ্তি টানা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২. মাহবুব-উল-আলম, 'মহান সত্বা', *ইত্তেফাক, তফাজ্জল হোসেন স্মৃতি সংখ্যা*, আগস্ট, ১৯৭৩।

৩. কে. জি. মুস্তাফা, 'বিরোধী দলীয় রাজনীতির বিকাশে সংবাদপত্রের ভূমিকা', *বিশেষ বক্তৃতামালা*, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃ.৭।

৪. মোঃ এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮।

৫. সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, ঢাকা বাংলা : একাডেমি, ১৯৮৫।

৬. ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, ঢাকা : নভেল পাবলিশিং হাউজ, ২০১৩।

৭. জুলফিকার হায়দার, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা*, ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ২০১০।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা

১৯৪৭-৭১ সময়কালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা এ অঞ্চলের ঘটনাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় এ জাতীয়তাবাদের পেছনে ধর্মীয় উপাদানটি শক্তিশালী থাকলেও ধীরে ধীরে বাঙালি জনগণের কাছে এর অসারতা প্রমাণিত হয়। এর পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতা জাতীয়তাবাদের অন্যতম উপাদান হিসেবে সামনে চলে আসে। এই পরিবর্তনের সূচনা ঘটে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের মাধ্যমে। ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনার যে উৎপত্তি ও বিকাশ তার একটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মাত্রা ছিল। এসব কিছুর মিলিত প্রবাহ যে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটায় তার ফসল ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালের ছাত্র আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী অবস্থান, ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং সর্বশেষ ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও বাঙালি জনগণ এই চেতনার ভিত্তিতেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে রায় প্রদান করে। এভাবে বাঙালি জাতীয়াতাবাদী চেতনা এবং এই চেতনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ একটি রাজনৈতিক আদর্শ। এটি আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলভিত্তি। জাতীয়তাবাদ একটি ভূভিত্তিক তথা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত চেতনা বা অনুভূতি। জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয় ইউরোপে। ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ থেকে কয়েক শতাব্দী ধরে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ পরিলক্ষিত হলেও এর প্রথম সার্বজনীন স্বীকৃতি পাওয়া যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালের প্যারিস সন্ধি সম্মেলনে প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণার মাধ্যমে।

কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে তৈরি হতে পারে। যেমন - ভাষা, ধর্ম, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ইত্যাদি। কিন্তু শুধুমাত্র একটি উপাদানের ওপর ভিত্তি করে পূর্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদ গঠিত হয় না। যেমন - ধর্ম। যুগে যুগে ধর্ম পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করতে পারলেও ধর্মের নামে এই জাতীয়তাবাদ দীর্ঘদিন টিকে থাকে না। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ পাকিস্তান। ভাষাও এককভাবে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হতে পারে না। তবে ধর্ম ও ভাষা উভয়ই জাতীয় চেতনাকে উদ্‌বুদ্ধ করতে ভূমিকা রাখে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, বহুযুগ ধরে বাঙালি একটি জাতি হয়ে ওঠার সকল উপাদানে সমৃদ্ধ হলেও জাতীয়তাবাদী চেতনার যে একাত্মবোধ তা ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল। তবে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান হলো সম্মিলিত ঐতিহ্যবোধ। ফরাসি মনীষী Ernest Renan (1823-92) জাতীয়তাবাদের পেছনে ঐতিহ্যবোধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন:

> A nation is a soul, a spiritual principle. Two things, which are really one, constitute this soul, this spiritual principle. One is the past, the other is the present. One is the possession in common of a rich inheritance of memories. The other is the present consent, the desire to live together, the will to realize the unimpaired heritage.[১]

এই ঐতিহ্যবোধ তৈরি হয় একটি ভূখণ্ডে বসবাসকারী ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব শ্রেণির জনগণের মধ্যে অতীতের সাংস্কৃতিক সচেতনতা, বিশেষ ধরনের জীবনদর্শন, ভূখণ্ডের প্রতি ভালোবাসা এবং একাত্মবোধ ও সহমর্মিতা ইত্যাদি সব কিছুর মাধ্যমে। সুতরাং জাতীয়তাবোধের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতা জড়িত।

জাতীয়তাবোধের দুটো পরস্পর বিরোধী ভূমিকা পাওয়া যায়। একদিকে যেমন জাতীয়তাবোধের ফলে বৃহৎ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে তেমনি বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী মানুষ একত্র হয়ে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছে। যেমন – জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান এবং পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। আবার ইউরোপে ইতালি কিংবা জার্মানির একত্রীকরণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমেই হয়েছে।[২]

বাঙালি জাতীয়তাবাদ

বাঙালি জাতীয়তাবাদ একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনা। ১৯৪৭ সালের আগে ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলায় যে বিশেষ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ এর সম্পূর্ণ বিপরীত চেতনা। অন্যকথায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ হলো সেই মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিরোধাভাস যা পাকিস্তান নামে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র তৈরি করেছিল। এটি বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সীমারেখায় অবস্থিত জনগণের সম্মিলিত চেতনা। এর ভীত রচিত হয়েছিল ঐতিহ্যবাহী বাংলার জনপদের হাজার বছরের ঐতিহ্যের পরতে পরতে। বাংলার ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে বাঙালি জনগোষ্ঠী একটি জাতি হিসেবে গড়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক আমলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে সৃষ্ট ক্ষোভ এবং ধর্মীয় আবহ তাতে সাময়িক বাধার সৃষ্টি করলেও বিলুপ্ত করতে পারেনি। প্রাচীন কাল থেকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একটি জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার যে প্রবণতা এবং অসাম্প্রদায়িক ধারার যে নিরন্তর প্রবহমানতা - সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। আলোচ্য অধ্যায়ে সংক্ষেপে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পটভূমি তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি

বাঙালি জাতীয়তাবাদ ব্যাখ্যায় এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, নরগোষ্ঠীর আকৃতি, ধর্মবিশ্বাস এবং ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা আলোকপাত করা প্রয়োজন।

ক. বাঙালির আত্মপরিচয়

বাঙালির আদি পুরুষের এই অঞ্চলে আগমন ও বসবাসের সঠিক কাল নির্ণয় করা কঠিন হলেও বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন থেকে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে একটি উন্নত সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ এ সভ্যতার অধিবাসীদের আদি বাঙালি হিসেবে অভিহিত করেছেন। অনেক পণ্ডিত মনে করেন বঙ্গ এবং পুণ্ড্র বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী ছিল। আর্য জনগোষ্ঠীর আগমনের আগে এই অঞ্চলের ভাষাগত ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে বাঙালির আদি পুরুষদের অস্ট্র এশিয়াটিক বা অস্ট্রিক জাতভুক্ত করা হয়েছে। অনেকে এদের

Dhaka University Institutional Repository

নিষাদ নামেও অভিহিত করেন। এদের সাথে দ্রাবিড় বা মোঙ্গল ভাষাভাষী এবং পামির মালভূমি থেকে আগত হোমো আলপাইনসদের মিশ্রণ ঘটে। এরপর কিছু আর্যও বাংলাদেশে আসে। খ্রিষ্টীয় আট থেকে বার শতকের মাঝামাঝি প্রায় ৪০০ বছর বাংলা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের অধীনে ছিল। পাল পরবর্তী সময়ে এখানে সেন রাজারা শাসন করেন যারা ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। মুসলমান শাসনকালে অর্থাৎ ১২০৪ সালের পর তুর্কী, আরব, ইরানি, আফগান, মোগল প্রমুখ জাতির সাথে এই আদি বাঙালিদের মিশ্রণ হয়। মুসলমান আমলে পূর্ব আফ্রিকার আবিসিনিয়া থেকে আগত হাবসি (সুলতান ও প্রহরী)'দের সাথে বাঙালিদের কিছু কিছু মিশ্রণ হয়েছে। একইরকম মিশ্রণ হয়েছে ষোল ও সতেরো শতকে পর্তুগীজ মগদের সাথে।[৩] এভাবে বাঙালি একটি শংকর জাতিতে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলাম বিস্তারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মৌলবাদী রক্ষণশীল প্রচারণার চেয়ে সুফী, পীর, দরবেশ ও আউলিয়াদের অবদান এ দেশে ইসলাম প্রচারে বেশি কার্যকর হয়েছে।[৪] মুসলমান বিজয়ের পর আরব, ইরান ও অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে সুফীরা ইসলামের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে যখন বাংলায় আগমন করেন তখন নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন উদার গুণাবলিকে স্বীয় ধর্মে গ্রহণ করেন, অনেকে আবার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। যেমন – শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণব আন্দোলন ছিল এ ধরনের মিশ্রণের বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু প্রাচীনকালে বাঙালির জন্য কোনো নির্দিষ্ট নামের অখণ্ড আবাসভূমি ছিল না। প্রায় ৬০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলেও এই অঞ্চল অসংখ্য জনপদে বিভক্ত ছিল। গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের বর্ণনায় খ্রিষ্টপূর্ব যুগের একটি অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায় যেটিকে তারা 'গঙ্গারিডাই' বা 'গঙ্গারিডই' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলের নাম ও সীমা পরিবর্তিত হয়েছে। তবে হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে অর্থাৎ ১২০৪ সালের আগে ও পরে বিভিন্ন অংশের নামের সাথে আধুনিক কালের বিভিন্ন অংশ মিলিয়ে বলা যায় –

১. উত্তর বাংলা – বরেন্দ্র, লক্ষণাবতী, পুণ্ড্রবর্ধন।

২. পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব বাংলা – বঙ্গ, সমতট, বাঙ্গাল, বাংলা।

৩. উত্তর ও পশ্চিম বাংলার কিছু অংশ – গৌড়।

৪. পশ্চিম বাংলা – রাঢ়।

Dhaka University Institutional Repository

এই বিভিন্ন অঞ্চল একত্রিত করে একটি অখণ্ড রূপ দেওয়া সম্ভব হয় মুসলমান আমলে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৮) এর সময়ে। তিনি লক্ষণাবতী, রাঢ়, বাঙ্গালা প্রভৃতি অঞ্চলগুলির রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেন। এ সময় থেকেই সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী ভূভাগ বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয় এবং এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বাঙালি নামে অভিহিত হতে থাকে। ইতিহাসবিদ ড. আহমেদ হাসান দানী, ড. রোমিলা থাপার, ড. আবদুল করিম প্রমুখ মনে করেন স্বাধীন সুলতানি আমলের দু'শ বছর হলো ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি গঠনের একটি মাইলফলক। মোগল আমলে এই অঞ্চল পরিচিতি পায় সুবাহ-ই-বাঙ্গালা নামে। ব্রিটিশ আমলে অঞ্চলটি ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি অংশ হিসেবে পরিচিত হয় এবং ইংরেজিতে বেঙ্গল (Bengal) আর বাংলায় বাংলাদেশ ও বাংলা উভয় নামেই পরিচিতি পায়। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো নতুন রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। এ সময় বাংলা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। পশ্চিম বাংলা যুক্ত হয় ভারতের সাথে আর পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের সাথে। সুতরাং সার্বিকভাবে বলা যায়, মুসলমান আমলে এই বদ্বীপের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং 'বাঙ্গালা' নামকরণ বাঙালি জাতীয়তাবাদে উত্তরণের এক দীর্ঘ পথযাত্রার ইতিবাচক নির্দশন।[৫]

বাঙালি জাতির মতই বাংলা ভাষার উৎপত্তি কবে হয়েছে তার সঠিক সময় নির্ণয় করা কঠিন। পন্ডিতদের মতে পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। পাল শাসনামলকে বাংলা ভাষা সৃষ্টির সময়কাল হিসেবে গণ্য করা হয়। মূলত আর্যদের মুখের ভাষা নানা রকমের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলে যে রূপ পায় সেটিই বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপ। আর্যদের মুখের ভাষার নাম ছিল প্রাকৃত। বঙ্গ অঞ্চলের প্রাকৃতকে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন গৌড়ী প্রাকৃত। এই প্রাকৃত ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অপভ্রংশের রূপ পায়। এর পরের পর্যায় অবহট্ট যা চর্যাপদের ভাষা। চর্যার ভাষায় কিছু বাংলা শব্দ থাকলেও সেগুলো খাঁটি বাংলা শব্দ ছিল না। বরং বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে। অর্থাৎ যে সময় গৌড়, বঙ্গ, বরেন্দ্র ইত্যাদি জনপদ একত্রিত হয়ে 'বাঙ্গালা' তৈরি হয় সে সময় এই অঞ্চলের ভাষাও বাংলা হয়ে ওঠে।[৬] এই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করেই বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে একটি নিজস্ব সংস্কৃতি বিকশিত হতে থাকে।

খ. ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব : পাকিস্তান সৃষ্টি

জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বিকাশের জন্য যে সব উপাদান প্রয়োজন যেমন একটি নির্দিষ্ট ভাষা, ভূখণ্ড, একই ভূখণ্ডে অবস্থারত নির্দিষ্ট ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা ইত্যাদি সবই এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তারপরও ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে জাতীয়তাবাদের ধর্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

উপাদানটি মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের অধিবেশনে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন:

> The Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies, social customs, literatures. They neither intermarry nor interline together and indeed, they belong to two different civilisations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. Their outlooks on life are different … To yoke together such nations under a single state must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be built up for the government of such a state.[৭]

জিন্নাহর এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি একটি দৃঢ় ভিত্তি পায়। জাতীয়তাবাদের এই ধর্মীয় উপাদানটি জিন্নাহর আগে সৈয়দ আহমেদ খান, আবদুল লতিফ, আমীর আলী, কবি আল্লামাহ ইকবাল প্রমুখের মাধ্যমে বিকশিত হয়।

যে সব বৈশিষ্ট্য বাঙালিকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ধর্মীয় সহিষ্ণুতা। বাংলার মানুষকে বাহ্যিক আচার আচরনের তুলনায় ধর্মের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী অনেক বেশি আকৃষ্ট করেছে। বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে যে ধারাটি প্রাধান্য পেয়ে এসেছে সেটি হলো বিভিন্ন মতবাদের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের এবং সমন্বয়ের ধারা। পণ্ডিতদের মতে শতশত বছর হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় পাশাপাশি অবস্থান করলেও সংকীর্ণ ও পশ্চাদ্‌মুখী ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে ব্রিটিশ শাসনামলে। জাতি হিসেবে বাঙালির নিজস্ব সত্তার অব্যাহত বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে ব্রিটিশ পুঁজির উপস্থিতি ও শোষণ। এ অঞ্চলের কারুশিল্প, নির্মাণ ও শিল্প কারখানা ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিক্ষা ও প্রশাসনে ঔপনিবেশিক আমলে গৃহীত বিভিন্ন নীতির মাধ্যমে এ অঞ্চলের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আসে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলার মুসলমানরা ছিলেন ন্যায্য সুযোগ সুবিধা ও অধিকার বঞ্চিত বিশাল সম্প্রদায়। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা অনুভব করতেন অর্থনৈতিক জীবনে তাদের নিজেদের পরিবর্তে রয়েছে অন্য সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য। এ সময় ভূমির মালিকানা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে আর মুসলমানরা ছিলেন মূলত রায়ত বা ক্ষুদ্র চাষী। ব্যাবসাবাণিজ্য ও গ্রামীণ শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ছিল হিন্দুদের হাতে। চা শিল্পের মত পুঁজিবাদী শিল্পের মালিকানা ছিল ব্রিটিশদের হাতে।[৮] তবে ব্রিটিশ শাসনে উচ্চশ্রেণির মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনযাত্রার মাণ উন্নয়নের সুযোগ থাকলেও বিভিন্ন কারণে

Dhaka University Institutional Repository

সেটি হয়নি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সময় পাঁচ সালা বন্দোবস্তের মাধ্যমে অনেক বনেদি মুসলমান পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে অনেক হিন্দু ব্যবসায়ী, উৎপাদক, দালাল, ভূস্বামী ও সরকারি কর্মকর্তা পুরোনো বনেদি হিন্দু ও মুসলমান পরিবারগুলোর নিলামে ওঠা ভূ-সম্পত্তি কিনে লাভবান হয়।[৯] তবে মুসলমান সমাজ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১৮৩৭ সালে সরকারি ভাষা ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি প্রবর্তনে। এর ফলে দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় –

প্রথমত, ভাষার পরিবর্তনের ফলে বিচার বিভাগের অধিকাংশ মুসলমান চাকুরিজীবী চাকুরিচ্যুত হন এবং একই সাথে মুসলমান সম্প্রদায় আর্থিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে বর্জন করে।

দ্বিতীয়ত, উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্তের হিন্দু সম্প্রদায় যারা এক সময় মুসলমানদের শাসক হিসেবে স্বাগত জানিয়েছিল তারাই ব্রিটিশদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে নিজেদের অবস্থান ঠিক রাখতে প্রয়াসী হয় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনটি শিক্ষাগত কারণে পার্থক্য তৈরি হয়–

১. স্কুলে অধ্যয়ন শুরু করার আগে একজন মুসলমান ছাত্রকে মক্তবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় বলে হিন্দু ছাত্রের তুলনায় তার স্কুল শিক্ষা বিলম্বে শুরু হয়।

২. আর্থিক দুরবস্থার কারণে উচ্চ শ্রেণিতে মুসলমান ছাত্রদের ঝড়ে পড়ার হার ছিল বেশি।

৩. কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম, ইসলামি আইন ও আরবি ফার্সি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে জ্ঞানী-গুণীদের মাঝে একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বেশি ছিল।

এসব কারণে হিন্দুরা বিভিন্ন চাকুরিতে একচেটিয়া ভাবে নিয়োগ পায় এবং মুসলমান সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসনাধীনে নিরক্ষর বেকার জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। ফলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভিত্তিতে সামাজিক মর্যাদায় পার্থক্য তৈরি হয়, সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িক ব্যবধান। এর পাশাপাশি ওয়াহেবী ও ফরায়েজী আন্দোলনের মত রক্ষণশীল মতবাদ মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রচারণা এবং উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের মত কিছু সামাজিক কারণ মুসলিম বিচ্ছিন্নতার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র মনোভাব জাগ্রত হওয়ার পেছনে ঔপনিবেশিক আমলে মুসলমানদের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানসিকতাকেও দায়ী করা যায়। এ সময় কিছু কিছু সভা সমিতি গড়ে ওঠে যার মাধ্যমে মুসলমান জনমতকে প্রতিফলিত করা সম্ভব হয়নি। যেমন – বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি (১৮৩৭), বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১) ইত্যাদি সংস্থা মূলত হিন্দু অভিজাত শ্রেণির স্বার্থ রক্ষায় গঠিত হয়। ফলে মুসলমানদের মধ্যে এ মনোভাব জাগ্রত হয় যে তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত হতে হবে। এ মনোভাব দি মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন বা আঞ্জুমান-ই-ইসলামি'র মত সংস্থা গড়ে তুলতে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করে।[১১] বিভিন্ন সভা সমিতির পাশাপাশি উনিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে বাঙালি হিন্দু সমাজে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রমুখের মাধ্যমে হিন্দু জাতীয়তার পুনরুজ্জীবন ঘটে। এর প্রতিক্রিয়ায় বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্য গৌরব ইত্যাদির ভিত্তিতে স্বতন্ত্র চিন্তাধারার বিস্তার ঘটে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি যখন জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কংগ্রেস নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত হতে শুরু করেছে সে সময় সৈয়দ আহমেদ খান, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলীর মত মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি ইংরেজদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। আবদুল লতিফের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি (১৮৬৩) এবং সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৭)। কিন্তু সৈয়দ আহমেদই প্রথম মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে দুটো আলাদা জাতি হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি এর স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন:

> Is it possible that under these circumstances two nations – the Mohamedan and the Hindus – could sit on the same throne and remain eqally in power? Most certainly not. It is necessary that one of them should conquer the other and thrust it down. To hope that both could remain equal is to desire the impossible and inconceivable.[১২]

এ সময় কিছু কিছু পরিবর্তন নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ তৈরি করে –

প্রথমত, ১৮৭১ সাল থেকে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের একটি পৃথক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে সংগঠিত করার লক্ষ্যে চাকুরি, শিক্ষা ও বিভিন্ন সংস্থায় প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার নীতি নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত, আবাদি জমির অনবরত বিভাজনের ফলে হিন্দু ভূস্বামী শ্রেণির ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং বিপরীতে পূর্ব বাংলার বর্ধিষ্ণু মুসলমান মধ্যস্বত্বাধিকারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে বিশ শতকের প্রথম পাদের মধ্যে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল মুসলমান ভূস্বামী শ্রেণি বিপুল সংখ্যক ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু জমিদারদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারা তাদের সন্তানদের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে এবং ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে সক্ষম হয়।[১৩]

এভাবে বিভিন্ন কারণে ঔপনিবেশিক আমলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এবং সার্বিকভাবে যে মানসিক দ্বন্দ্ব তৈরি হয় সেটিকে ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন বাধাগ্রস্ত করে নিজেদের শাসন দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে ব্রিটিশরা 'হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি' এই চেতনার বীজ বপন করে। উনিশ শতকের এসব পরিবর্তনের ফলে এ অঞ্চলে যে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে সেটি ছিল খণ্ডিত। হিন্দুদের থেকে নিজেদের পৃথক বিবেচনায় মুসলমানরা এ সময় ধর্ম, প্রথা ও আচারভিত্তিক সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদে সম্পৃক্ত হয়। মুসলমানরা নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তাকে আঁকড়ে ধরে অস্তিত্ব রক্ষার মানসে। এ পর্যায়ে দুটো ঘটনা মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র চেতনাকে সম্প্রসারিত করে – বঙ্গভঙ্গ ও ভারতীয় বিধানসভার নির্বাচন।

মুসলমানদের স্বতন্ত্র চিন্তাধারার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে বঙ্গভঙ্গের সময় (১৯০৫)।[১৪] উনিশ শতকের শেষের দিকে উচ্চশ্রেণির হিন্দু বা হিন্দু ভদ্রলোক এবং আশরাফ শ্রেণির মুসলমানরা ধরেই নিয়েছিলেন যে বাঙালি বলতে হিন্দু এবং বাংলা ভাষা বলতে হিন্দুর ভাষাকেই বোঝায়। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির এই সংকীর্ণ বিস্তারের কারণে হিন্দু মধ্যবিত্ত বা ভদ্রলোক শ্রেণি অখণ্ড বাংলার নামে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে আর মুসলমান অভিজাত বা আশরাফ শ্রেণি মুসলমানদের কল্যাণের কথা বলে বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠনের মাধ্যমে মুসলমানদের স্বতন্ত্র চিন্তাধারা একটি রাজনৈতিক কাঠামো পায়। এই বিভেদ আরও বৃদ্ধি পায় বঙ্গভঙ্গ রদ করার পর (১৯১১)। বঙ্গভঙ্গ রদ করার পর মুসলমান সম্প্রদায় রাজনৈতিক ভাবে আরও সংগঠিত হওয়ার শক্তি অর্জন করে। এভাবে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় সেটি আর কখনই প্রশমিত হয়নি।

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে সৃষ্ট অসন্তোষ দূর করতে ব্রিটিশ সরকার ১৯১০ এবং ১৯২০ এর দশকে মুসলমানদের জন্য আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯১৮ সালে সরকার ইসলামি শিক্ষায় উচ্চতর শ্রেণি গঠনের জন্য অনুমোদন দেয়। ১৯২০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনেও ইসলামি শিক্ষার সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৫] এভাবে ১৯২০ এবং

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩০ এর দশকে মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি অর্জন করে। অন্যভাবে বলা যায় এসব কর্মসূচির মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাকে শক্তিশালী করে। কারণ ১৯২০ এবং ১৯৩০ এর দশকে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রতি নতুন উদ্দীপনা দেখা গেলেও ধর্মশিক্ষার প্রতি তারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে যা তাদের ধর্মসম্প্রদায়গত সংহতিকে আরও সুদৃঢ় করে।

১৯১৮-৩৭ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন স্থানীয় সরকার ও জেলাসংস্থার নির্বাচনে মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও শক্তিবৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৯৩৫ সালের নির্বাচনে মুসলমানরা মুসলিম জাতীয়তাবাদের পক্ষে ভোট দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪০ সালে জিন্নাহ উত্থাপন করেন দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং মুসলমানরা লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি দাবি করে। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই রাজনৈতিক সচেতনতার সাথে কিছু অর্থনৈতিক কারণ যুক্ত ছিল। ভারতে যে সব মুসলমান কর্মকর্তা জ্যেষ্ঠতর ও অধিকতর দক্ষ হিন্দু কর্মকর্তার কারণে পদোন্নতি আশা করতে পারতেন না তারা পৃথক রাষ্ট্রে দ্রুত পদোন্নতি পাবেন বলে আশা করেন। একইভাবে মুসলমান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি যারা ভারতে হিন্দু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সাথে প্রতিযোগিতা করে সমৃদ্ধি করতে পারতেন না তারা মুসলমানদের জন্য পৃথক কোনো রাষ্ট্রে অধিক সমৃদ্ধির আশা করেন।[১৬] ১৯২০, ১৯৩০ এবং ১৯৪০ এর দশকের প্রথম পাদে মুসলমান নেতারা ব্যর্থ হয়েছিলেন সরকারি চাকুরিতে মুসলমান নিয়োগে তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করে স্বীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের উন্নতি ঘটাতে। মিশ্র নির্বাচনে হিন্দু নেতাদের সাথে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে তারা নিজেরাও ব্যর্থ হয়েছেন। যেমন - অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী ফজলুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মিশ্র নির্বাচনে হিন্দু প্রার্থির কাছে পরাজিত হন। এমনকি এ. কে. ফজলুল হকের মত নেতাও কলকাতার পৌরসভার মিশ্র নির্বাচনে পরাজিত হন। এসব ব্যক্তিগত ব্যর্থতাও তাদের স্বীয় স্বার্থকে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট করার জন্য প্রযুক্ত হয়। অভিজাত মুসলমান নেতৃত্ব, অধিকার বঞ্চিত মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করার কৌশল হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করার ফলে এ সময় মুসলিম মানস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল ধর্মের সাথে।[১৭] ফলে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনেও মুসলিম জাতীয়তাবাদের পক্ষে মুসলমানদের অবস্থান স্পষ্ট হয়। কিন্তু এই অবস্থান ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য নয় বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যা হিন্দু প্রভাবাধীন ভারতে সম্ভব ছিল না।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, যে চেতনাকে ঘিরে এই বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয় তা হলো – বাঙালিদের মধ্যে মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে আলাদা এবং একটি পৃথক গোষ্ঠী। বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী সময়

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ করে ১৯২০, ১৯৩০ এবং ১৯৪০ এর দশকে বাংলায় রাজনৈতিক ঘটনাবলি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে। ফলে বাংলায় একটি ধর্মসম্প্রদায় ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক আত্মপরিচয় এবং পৃথক রাষ্ট্রে বিভাজিত হওয়ার দাবি তোলে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি এবং বাংলা বিভাগের ফলে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আদর্শ বাস্তব রূপ লাভ করে এবং অন্তত আঞ্চলিক অর্থে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা তিরোহিত হয়।

গ. ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের অসারতা : অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিস্তার

১৯৪৭ সালে যে জাতীয়তাবাদী চিন্তার ফলে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল পশ্চাৎপদ মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয় চেতনা। কিন্তু অচিরেই পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের অসারতা বুঝতে পারে। ১৯৪৭-৭১ সময়কালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ঘটনাবলির ওপর নির্ভরশীল। এর পাশাপাশি যুক্ত হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি। সার্বিকভাবে ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে বাঙালি জতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের মাইলফলক হিসেবে কিছু কিছু ঘটনা চিহ্নিত করা যায়। যেমন– ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮ ও ১৯৫২), ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের সংবিধান, ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন, ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালের ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ইত্যাদি।

একটি জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদ আত্মপরিচয়ের চেতনা থেকে অনুপ্রেরণা ও সংসক্তি আহরণ করে যা ইতিহাস, ভূগোল, জাতিসত্তা, ধর্ম, ভাষা ও কৃষ্টির অভিজ্ঞতার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। কিন্তু ধর্ম ছাড়া পাকিস্তানের উভয় অংশে কোনো অংশীদারিত্ব ছিল না। অন্যান্য সমন্বয়কারী উপাদানের অভাবে কৃত্রিমভাবে তৈরি পাকিস্তান নামক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে, ধর্ম জাতিগঠনে প্রথম থেকেই ব্যর্থ হয়। পাশাপাশি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসককবর্গ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্যোগে জাতীয় সংহতি ও জাতীয়তাবাদের উপাদান তৈরি করতেও ব্যর্থ হয়। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বিভিন্ন বৈষম্যমূলক নীতির কারণে বাঙালিরা নিজেদের ঔপনিবেশিক আমলের মতই শোষণ ও বঞ্চনার শিকার বলে উপলব্ধি করে। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পরপরই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি জনগণের মধ্যে এই বোধের জন্ম হয়।

ইতালির রেনেসাঁ যুগের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ম্যাকিয়েভেলির মতে কোনো জাতিকে পদানত করতে সে জাতির মাতৃভাষাকে ধ্বংস করে শাসকগোষ্ঠীর ভাষার ব্যাপক প্রচলন করা প্রয়োজন। পাকিস্তানি শাসকরাও এর বাইরে ছিলেন না। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ নেন।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার বাঙালিদের ভেতর জাতীয়তাবাদের যে বোধ তৈরি হয় সেটি ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে পাকিস্তানি অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর ভেতর। এ সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণি স্বার্থ বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের মত সংগঠন। এসব রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে যে চেতনা তৈরি হয় তা ক্রমশ বাঙালি জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার উৎস হিসেবে কাজ করে।[১৮] এর প্রত্যক্ষ ফলাফল লক্ষ্য করা যায় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে। এই নির্বাচনে ২১ দফার মাধ্যমে মুসলিম লীগের প্রতি অনাস্থা এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতি পূর্ব বাংলার বাঙালিদের সমর্থন প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি এটিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে মুসলিম লীগ পশ্চিম পাকিস্তানের যেসব মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করছিল তাদের বিরুদ্ধে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুখপাত্র হিসেবে আবির্ভাব ঘটেছে যুক্তফ্রন্টের।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নতুন রাষ্ট্রে একটি পরিপূর্ণ সংবিধান রচনায় ব্যর্থতা বাঙালি জনগণকে সাংবিধানিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছিল। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হলেও বাংলা বানান সংস্কার, রবীন্দ্র সংগীত বর্জন ইত্যাদি উদ্যোগের মাধ্যমে এই অঞ্চলের সংস্কৃতিকে হেয় করা হয়। এই সংবিধানের মাধ্যমে পাকিস্তান সাংবিধানিক ভাবে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পাশাপাশি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বাঙালি জনগণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে রায় দিলেও ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনকে উপেক্ষা করা হয়। ১৯৫৮ সাল থেকে সামরিক শাসন কিংবা মৌলিক গণতন্ত্রের নামে কর্তৃত্ববাদী শাসন অর্থাৎ প্রকৃত গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি পূর্ব বাংলার জনগণের বঞ্চনাবোধকে আরও তীব্র করে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরির পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যও তীব্র হতে থাকে। দুই অংশের মধ্যে কেন্দ্রীয় সম্পদ ও চাকুরির সুযোগ বণ্টনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে পূর্ব বাংলার সরকারের তীব্র মতানৈক্য দেখা দেয়। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই বৈষম্য প্রকট হতে থাকে। পাকিস্তান সৃষ্টির সময় বাংলার নেতৃস্থানীয় মুসলমান রাজনীতিবিদরা ইসলামের সাম্যবাদী নীতি অনুসরণ করে এমন একটি রাষ্ট্রের কাঠামো কল্পনা করেন যেখানে ইস্পাহানী, সিদ্দিকী বা অন্যান্য অবাঙালি মুসলমান ও বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। আদমজী, বাওয়ানী, আমিন, দাউদ প্রভৃতি ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর আয়ের একটি বড় অংশ আসতো পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে। কিন্তু তারা ট্যাক্স দিত পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের হেড অফিস থেকে। প্রতিরক্ষা ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বৃহত্তর অংশ

Dhaka University Institutional Repository

অবাঙালি হলেও এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানের উভয় অংশের লোকদের সমান অধিকার রয়েছে বলে গণ্য করা হতো। ফলে বাঙালি জনগণ উপলব্ধি করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের মূলে আছে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট নীতি।[১৯] ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগণের আপেক্ষিক বঞ্চনার অনুভূতি দূর করতে পাকিস্তান সরকার ব্যর্থ হয় এবং এই ব্যর্থতা ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের শক্তিগুলোকে জোরদার করে তোলে।

বাঙালি জনগণের মধ্যে বঞ্চনা ও অবদমনের বোধ থেকে সৃষ্ট সচেতনতাকে উপজীব্য করে ১৯৬৬ সালে ছয় দফার মাধ্যমে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে আওয়ামী লীগ। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম দফায় যথাক্রমে মুদ্রা, কর ও বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দাবি উত্থাপিত হয়। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলন এবং উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে বিবর্তন তাতে ছাত্র সমাজের চিন্তা ভাবনা এবং কর্মতৎপতা মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। এই গণ-অভ্যুত্থানে আইয়ুব খানের পতন বাঙালি জনগণের আত্মবিশ্বাস আরও সুদৃঢ় করে। এ সময় বাঙালি জনগণের কণ্ঠে ধ্বনিত – 'জয় বাংলা', 'আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর' ইত্যাদি স্লোগান সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত বহন করে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।[২০] বাঙালি জাতীয়তাবাদের এই চেতনাকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের সাম্প্রদায়িক ও শোষণমূলক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভব ছিল না।

১৯৫৪ সালের ২১ দফা থেকে শুরু করে ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান সব আন্দোলনেই উত্থাপিত হয়েছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা। একমাত্র স্বায়ত্তশাসনের দাবির মধ্যেই বাঙালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি নিহিত থাকলেও পাকিস্তানের অবাঙালি নেতৃত্ব সবসময় এই দাবিকে অগ্রাহ্য করেছে। এর বিরুদ্ধে বাঙালি জনগণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তাদের নতুন চেতনা ও সংহতির পরিচয় ব্যক্ত করে। আওয়ামী লীগের কাছে এই নির্বাচন ছিল স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে গণভোট। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ে স্পষ্ট হয় যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষের ধারাই প্রাধান্য বিস্তার করছে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদের মুখ্য প্রবক্তা হয়ে ওঠে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃত্ব নির্বাচনের রায় অনুযায়ী বাঙালি জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানায়। এমনকি ছয় দফা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনায় বসা এবং সুস্পষ্ট আপত্তিগুলো তুলে ধরার কাজ পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা করেননি। আলোচনার পরিবর্তে বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রশ্নটির মীমাংসা হয় অস্ত্রের মাধ্যমে। নিজেদের সাম্প্রদায়িক ও

Dhaka University Institutional Repository

সংকীর্ণ চেতনা চাপিয়ে দিতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালি জনগণের ওপর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

২৫ মার্চ রাতের আঁধারে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আক্রমণ ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সৃষ্টিকারী ঘটনা। বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

মূল্যায়ন

১৯৪৭-৭১ কালপর্বে বাঙালি জনগণ যে চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে বিজয় অর্জন করেছে সেটি নিঃসন্দেহে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চৈতন্যের উন্মেষের ফলস্বরূপ। এ সময়কালে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে দুটো পরস্পর বিরোধী ধারা কাজ করে। এর প্রথমটি সাম্প্রদায়িক এবং পরেরটি অসাম্প্রদায়িক যা মূল জাতীয়তাবাদী ধারা হিসেবে বিবেচিত। ১৯৪৭ সালে জাতীয়তাবাদের যে খণ্ডিত ধারা পাকিস্তান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে সেটির মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম। কিন্তু শুধু ধর্মকে আশ্রয় করে জাতীয়তাবাদ বিকশিত হতে পারে না বলে নবসৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রে চাপিয়ে দেওয়া সংকীর্ণ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী অসাম্প্রদায়িক বাঙালি চেতনার মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হয়। প্রাচীন কাল থেকেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একটি জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার যে প্রবণতা বাঙালি জনগণের মধ্যে ছিল সেটি কখনই থেমে থাকেনি। ধর্মের নামে পাকিস্তানি শোষণ ও বঞ্চনার ফলে 'বাঙালি' আত্মপরিচয় 'মুসলমান' পরিচয়ের চেয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে। ফলে এই বাংলার জনগণ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়। এই চেতনায় বাংলার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমান সবাই ছিল বাঙালি। ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম এই সত্যটিকেই তুলে ধরে।

তথ্যসূত্র

১. Ernest Renan, 'What is a Nation?', Geoff Eley and Ronald Grigor Sunny (ed), *Becoming National : A Reader*, New York and Oxford : Oxford University Press, 1996, pp. 41-55.

২. James Edgar Swain, *A History of World Civilization*, New York: McGraw-Hill Book Co., 1947, p. 518.

Dhaka University Institutional Repository

৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস : আদি পর্ব*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃ. ৫১।

৪. Muhammad Enamul Huq, *A History of Sufism in Bengal*, Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1975, p. 260-316.

৫. আশা ইসলাম, 'জাতীয়তাবাদ', *বাংলাপিডিয়া*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭ (সিডি সংস্করণ)।

৬. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ঢাকা : অবসর, ২০০৬, পৃ. ২৩।

৭. C. H. Philips (ed.), *The Evolution of India and Pakistan, 1858-1947, Select Document*, London : Oxford University Press, 1962, p. 354.

৮. রেহমান সোবহান, 'বাঙালী জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, দ্বিতীয় খন্ড, অর্থনৈতিক ইতিহাস, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ৬১২।

৯. A. K. Nazmul Karim, *The Dynamics of Bangladesh Society*, Delhi : Vikas, 1988, p. 117.

১০. মোহাম্মদ শাহ, 'বাঙালী জাতীয়তাবাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, তৃতীয় খণ্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ৭৩০।

১১. Jayanti Mitra, *Muslim Politics in Bengal 1855-1906 : Collaboration and Confrontation*, Calcutta : K.P. Bagchi Co.,1948, p. 93.

১২. Penderal Moon, *Divide and Quit*, London : Chatto and Windus, 1967, p.11.

১৩. আজিজুর রহমান মল্লিক, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ভিত্তি', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খণ্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ৫৪১।

১৪. ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়া বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, আসাম বিভাগের সাথে মালদহ ও পার্বত্য ত্রিপুরাকে অন্তর্ভুক্ত করে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ এবং এর রাজধানী হয় ঢাকা। অন্যদিকে কলকাতাকে রাজধানী করে পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পুরাতন বঙ্গ প্রদেশ।

১৫. মোহাম্মদ শাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. Kamruddin Ahmed, *A Socio Political History of Bengal*, Dhaka : Progoti Publishers, 1967, p. 58.

১৭. Harun-or-Rashid, *The Freshadowing of Bangladesh : Bengal Muslim League and Muslim Politics*, *1936-47*, Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1987, p. 344-346

১৮. Talukdar Maniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence Of Bangladesh*, Dhaka : Mowla Bros, 2003, p. 6.

১৯. রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২২।

২০. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ', সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৬, পৃ. ৪২০।

তৃতীয় অধ্যায়

ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ক্রমবিকাশ (১৯৪৭-৭১)

Dhaka University Institutional Repository

কৌটিল্যের তথ্য অনুযায়ী ভারতবর্ষে মৌর্য শাসনামলে রাজ্যের যাবতীয় খবর সংগ্রহ করার জন্য একশ্রেণির কর্মচারী ছিলেন এবং তাদের এই দায়িত্ব ছিল এক ধরনের সাংবাদিকতা। তবে এই অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক সাংবাদিকতার জন্ম ঔপনিবেশিক শাসনামলে। ভারতবর্ষে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন ওলন্দাজ নাগরিক উইলিয়াম বোল্টস।[১] দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত বোল্টস সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি চাইলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাকে ইংল্যন্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[২] এর প্রায় ১২ বছর পর জেমস অগাস্টাস হিকির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র *বেঙ্গল গেজেট* (*The Bengal Gegette*)। পত্রিকাটির প্রথম পৃষ্ঠার ওপরে লেখা থাকতো – 'Hickr's Bengal Gegette'।[৩] ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের খ্রিষ্টান মিশনারিদের উদ্যোগে এবং জন মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক *দিগদর্শন*। এর পরের মাসেই একই জায়গা ও সম্পাদকের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক *সমাচার দর্পন*।[৪] তবে অন্য আরেকদল ঐতিহাসিকের মতে ১৮১৮ সালের ১৪ মে থেকে ৯ জুলাই এর মধ্যে প্রকাশিত *বাঙ্গাল গেজেট* প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। বাঙালি মালিকানাধীন প্রথম এই সংবাদপত্রটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।[৫]

আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে বাঙালি হিন্দু সমাজের মত একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ মুসলামানদের ক্ষেত্রে হয়নি। তবে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। এ সময় ঢাকায় কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে, ফলে শিক্ষিত সমাজে সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হতে থাকে। ঢাকার এই সময়ের সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে *Calcutta Monthly Journal*-এ মন্তব্য করা হয়:

> The English School at Dacca is getting on very well; the number of the students now amounts to one hundred and fifty. A society has lately been established for the cultivation of the Bengally language, which, contemplates the establishment of a newspaper in English and Bengally.[৬]

কিন্তু এই প্রয়োজনীয়তার পরও পূর্ব বাংলার প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় রংপুর থেকে। পত্রিকাটির নাম ছিল –*রঙ্গপুর বার্তাবহ*।[৭] ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় পত্রিকা ইংরেজি সাপ্তাহিক *ঢাকা নিউজ* (*The Dacca News*)। পাঁচজন মালিকের মাধ্যমে প্রকাশিত পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন আলেকজান্ডার

Dhaka University Institutional Repository

ফর্বস।[৮] এরপর দীর্ঘকাল ঢাকা থেকে কোনো নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয় ইংরেজি সাপ্তাহিক *বেঙ্গল টাইমস* (The Bengal Times)। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের মতে *ঢাকা নিউজ* পরবর্তীকালে *বেঙ্গল টাইমস* হিসেবে প্রকাশিত হয়। এটি ১৯০৫ সালে পুনরায় পরিবর্তিত *Eastern Bengal and Assam Era* নামে প্রকাশিত হয়।[৯]

১৮৭৩ সালে পূর্ব বাংলা থেকে মুসলমান সম্পাদিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। সৈয়দ আব্দুর রহিমের সম্পাদনায় পত্রিকাটির নাম ছিল *বালারঞ্জিকা*। তবে ১৮৬১ সালের ৩ অক্টোবর *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন থেকে *ফরিদপুর দর্পন* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগের কথা জানা যায়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে রাজনৈতিক বিরোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাশাপাশি পূর্ব বাংলায় ধীরে ধীরে সংবাদপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯১৬ সালের ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পূর্ব বাংলার প্রথম ইংরেজি দৈনিক *দি হেরাল্ড*।[১০]

পূর্ব বাংলার মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সমাজে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় ছিল না এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা সব দিক থেকেই তারা অনেক পিছিয়ে ছিল। পাশাপাশি পূর্ব বাংলার মফস্বল থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের পাঠক চাহিদাও তেমন ছিল না। পূর্ব বাংলার এই অপরিণত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপস্থিতির জন্য কলকাতায় সংবাদপত্র প্রকাশ করা যত সহজ ছিল ঢাকায় তত সহজ ছিল না। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর। বিভাগপূর্ব সময়ে এই অঞ্চলের অধিকাংশ পত্রিকার মালিক সম্পাদক ছিলেন উচ্চ বা মধ্যবিত্ত হিন্দু। এরা অধিকাংশই ১৯৪৭ সালের পর ঢাকা তথা পূর্ব বাংলা ত্যাগ করেন। ফলে এ সময় পূর্ব বাংলার সংবাদপত্র জগতে এক ধরনের শূন্যতা তৈরি হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত কোনো পত্রিকার সন্ধান এ সময় পাওয়া যায় না। এ পরিস্থিতিতে প্রাথমিক পর্যায়ে কলকাতা থেকেই কিছু কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে যা সময়ের সাথে সাথে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। পাশাপাশি ঢাকা থেকেও অনেক নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। পাকিস্তান আমলে অর্থাৎ ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে ঢাকার সংবাদপত্র প্রকাশনার সাথে জড়িত মালিক সম্পাদকরা ছিলেন কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক। ফলে পত্রিকার নীতিতেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ সময় আর্থিক সংকট ও অন্যান্য কারণে পত্রিকাগুলোর মালিকানা পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে তাদের চরিত্রও পরিবর্তিত হতে থাকে। ১৯৪৭-৭১ (মার্চ) সময়কালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রধান প্রধান দৈনিক পত্রিকার ক্রমবিকাশ এখানে বিশ্লেষণ করা হলো[১০(ক)] –

১. *আজাদ*

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর মওলানা আকরম খাঁর সার্বিক পরিচালনা ও সম্পাদনায় দৈনিক পত্রিকা হিসেবে *আজাদ* আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম থেকেই পত্রিকাটির লক্ষ্য ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা রাখা।[১১] পত্রিকাটি 'আজাদের আত্মনিবেদন' শীর্ষক প্রথম সম্পাদকীয়তেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করে, "... তিন কোটি মুছলমানের সত্যিকার সেবা ও নিরপেক্ষ প্রতিনিধিরূপে দৈনিক আজাদ হাতে করিয়া সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইতে পারিলাম"।[১২] *আজাদ* প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে পত্রিকাটিতে দীর্ঘসময় সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী আবুল কালাম শামসুদ্দীন মন্তব্য করেন, "বাংলার মুসলিম সাংবাদিকতার পরিচয় দিতে বসে এ কথা না বললে সম্ভবত বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যে, *আজাদ* থেকেই বাংলার মুসলিম দৈনিকের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে"।[১৩]

আজাদ ছাপা হতো ৮৬-এ লোয়ার সার্কুলার রোড কলকাতা থেকে এবং মুদ্রিত হতো মোহাম্মদী প্রেস থেকে। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পরও প্রাথমিক পর্যায়ে এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকাটির ফোন নম্বর ছিল ৪৬৬ কলকাতা। পত্রিকাটির ওপরে লেখা থাকতো 'মোছলেম-বঙ্গ ও আসামের একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র'। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলেও এতে পূর্ব বাংলার ঘটনাবলিই স্থান পেত। এটি পত্রিকার স্বাধীন মত প্রকাশের পথে ছিল একটি বড় বাধা। আবুল কালাম শামসুদ্দীন এই সমস্যা সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "এ সময় আজাদের মত পাকিস্তানী ভাবধারার কাগজ সেখান থেকে বের করা যে কি দুরূহ ব্যাপার ছিল, তা বর্তমানে অনেকের পক্ষে অনুমান করাও কঠিন না হয়ে পারে না"।[১৪] উদাহরণ হিসেবে বলা যায়,দেশ ভাগের পর কলকাতায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় তার প্রভাবে ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর *আজাদ* বের হতে পারেনি।[১৫]

কলকাতা থেকে *আজাদ*-এর সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালের ১২ অক্টোবর। এতে উল্লেখ করা হয়, পত্রিকাটির পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ১৯ অক্টোবর ঢাকা থেকে। ইতোমধ্যে পূর্ব বাংলা সরকার ঢাকেশ্বরী রোডের পাশে একটি প্লট লীজ দেয় *আজাদ* অফিস তৈরি করার জন্য। ঢাকায় স্থানান্তরের পর এখান থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে *আজাদ*। এ সময় পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব অব্যাহত রাখেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। সহকারী সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন পূর্বতন ঢাকাস্থ প্রতিনিধি আবু জাফর শামসুদ্দীন। বার্তা সম্পাদক হলেন খাইরুল কবীর।[১৬]

মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। তিনি পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় *আজাদ*-এর প্রকাশিত সংবাদ ও সম্পাদকীয়তে এর একটি প্রভাব পাওয়া যায়। ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী পরাজিত হলে ১৮ জুন (১৯৪৯) কাউন্সিল

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশনের আগে মওলানা আকরম খাঁ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতির পদে পদত্যাগ করেন। তবে উক্ত কাউন্সিলেই তাঁকে পুনর্বহাল করা হয়। *আজাদ* আকরম খাঁর দলীয় আনুগত্য সম্পর্কে ১৯৪৯ সালের ১৮ জুন মন্তব্য করে যে, তাঁর সেবা থেকে মুসলিম লীগ কখনও বঞ্চিত হবে না। অনেক ক্ষেত্রেই *আজাদ* পত্রিকাটির নীতি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। তাছাড়া সমগ্র পাকিস্তান আমলেই পত্রিকাটির নীতি ছিল বৈপরীত্যমূলক। *আজাদ*-এর অনেক বক্তব্যই ছিল সাম্প্রদায়িক। পত্রিকাটি রবীন্দ্র সংগীত, মেয়েদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ের বিরোধিতা যেমন করেছে তেমনি ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও আগরতলা মামলায় বলিষ্ঠ ও সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। এক সময় ছয় দফার বিরোধিতা করলেও ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর পত্রিকাটি হয়ে ওঠে বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ সমর্থক। মূলত মওলানা আকরম খাঁর ছেলে কামরুল আনাম খাঁ *আজাদ*-এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেয়ার পর এই চরিত্রগত পরিবর্তন হয়। এ সময় প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের মুখপত্র থেকে গণ-আন্দোলনের বাণী বাহকের ভূমিকায় *আজাদ*-এর রূপান্তর হয় এবং গভর্নর মোনায়েম খাঁর ছবি *আজাদ*-এ ছাপানো নিষিদ্ধ করা হয়।[১৭]

২. *ইত্তেহাদ*

যদিও *ইত্তেহাদ* কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় এবং কখনো ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়নি কিন্তু তারপরও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনাতেই রাজনৈতিক বিরোধ কিভাবে পত্রিকার নীতিকে প্রভাবিত করেছে সেটি বুঝতে *ইত্তেহাদ* সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৯৪৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর *ইত্তেহাদ* প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন নবাবজাদা হাসান আলী চৌধুরী (টাঙ্গাইলের ধনবাড়ির জমিদার ও ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রী সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর ছোট ছেলে)। আবুল মনসুর আহমদ-এর সম্পাদনায় পত্রিকাটিতে প্রথম থেকেই কে. জি. মুস্তাফা, সিরাজুদ্দীন হোসেন, তফাজ্জল হোসেন প্রমুখ অনেক প্রতিভাবান সাংবাদিকের সমাবেশ ঘটে। কবি আহসান হাবীব সাহিত্য এবং রোকনুজ্জামান খান শিশু পাতা পরিচালনা করতেন। দেশ ভাগের পর পূর্ব বাংলায় *ইত্তেহাদ*-এর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ওরিয়েন্টাল এয়ার ওয়েজের ভোরের ফ্লাইটে *ইত্তেহাদ* পাঠানো হতো। এ সময় ঢাকায় *আজাদ*-এর তুলনায় *ইত্তেহাদ*-এর জনপ্রিয়তা বেশি ছিল।[১৮] পত্রিকাটিকে ঢাকায় স্থানান্তরের উদ্যোগ নিলেও বিভিন্ন কারণে সেটি সম্ভব হচ্ছিলো না। দেশভাগের আগে *ইত্তেহাদ* ছিল প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী – আবুল হাশিম উপদলের সমর্থক। কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল প্রদেশিক মুসলিম লীগের তখনকার সভাপতি আকরম খাঁ এবং নাজিমুদ্দীন সমর্থক উপদল।[১৯] এই উপদলের সমর্থক পত্রিকা ছিল *আজাদ*।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বাঙালি ও স্থানীয় উর্দুভাষী অবাঙালিদের মধ্যে সংঘর্ষ হলে সরকারি প্রেসনোটে শান্তিভঙ্গ ও উসকানি দেওয়ার জন্য কলকাতা থেকে প্রকাশিত *ইত্তেহাদ, আনন্দবাজার* ও *স্বাধীনতা* পত্রিকা তিনটিকে দায়ী করা হয়। *ইত্তেহাদ* পূর্ব বাংলার সংবাদকে গুরুত্ব দিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা করত। ফলে মুসলিম লীগ সরকার তার বিরোধী এসব পত্রিকার বিরুদ্ধে দমনমূলক নীতি নেয়। ১৯৪৮ সালের মে মাসে *হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড, আনন্দবাজার পত্রিকা, ইত্তেহাদ* ও *নিউ নেশন* এই চারটি পত্রিকাকে ভারতীয় আখ্যায়িত করে পূর্ব বাংলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।[২০] ১৯৪৮ সালের ৯ জুন এক আদেশে *ইত্তেহাদ*-সহ অন্য কয়েকটি (*আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃতবাজার পত্রিকা, স্বাধীনতা, যুগান্তর*) পত্রিকার ওপর জরিমানা ও প্রি-সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়। পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণার অভিযোগ এনে এসব পত্রিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।[২১]

ইত্তেহাদ-এর বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ মোদাব্বের বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেন। এ সময় খাদ্য চোরাচালানের ওপর সরকারের সমালোচনা করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে পুনরায় পত্রিকাটি নিষিদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলেও ১৯৪৯ সালের জুন মাসে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সমালোচনামূলক সম্পাদকীয় প্রকাশ করায় পূর্ব বাংলায় *ইত্তেহাদ*-এর প্রবেশ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।[২২]

এভাবে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিবেচনায় অন্য একটি পত্রিকাকে সরাসরি আক্রমণ করে সংবাদ পরিবেশন সমগ্র পাকিস্তান আমল জুড়েই লক্ষ্য করা যায়।

৩. *মর্নিং নিউজ*

ঢাকার নওয়াব পরিবারের খাজা নূরুদ্দীনের প্রচেষ্টায় ১৯৪২ সালের কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় *মর্নিং নিউজ*। তিনি ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দীনের আত্মীয়। পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন আব্দুর রহমান সিদ্দিকী। *মর্নিং নিউজ* মুসলমানদের পাকিস্তান দাবির সমর্থনে জোরালো ভূমিকা রাখে। ১৯৪৯ সালের ২০ মার্চ পত্রিকাটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। কলকাতায় দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হলেও ঢাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে পত্রিকাটি সাপ্তাহিক হিসেবে বের হয়। তবে ঐ বছরের ২৫ ডিসেম্বর থেকে দৈনিক হিসেবে বের হতে শুরু করে।[২৩]

মর্নিং নিউজ একমাত্র পত্রিকা যেটি পাকিস্তান আমল জুড়েই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। পত্রিকাটি প্রথম থেকেই বাংলা ভাষা, বাঙালি কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিরোধী অবস্থান নিয়ে সবকিছুকেই হিন্দুয়ানি

Dhaka University Institutional Repository

আখ্যায়িত করে বিষোদ্গার অব্যাহত রাখে। ফলে *মর্নিং নিউজ* বিভিন্ন সময় জনতার রুদ্ররোষের শিকারে পরিণত হয়। ভাষা আন্দোলন বিরোধী ভূমিকার কারণে জনগণ *মর্নিং মিউজ* প্রেস পুড়িয়ে দিয়েছিল।

আইয়ুব খান তার সমর্থক পত্রিকা সৃষ্টির উদ্দেশে ১৯৬৪ সালে গঠন করেন 'ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট'। আজন্ম বাঙালি বিরোধী পত্রিকা *মর্নিং নিউজ*-এর সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করে ট্রাস্ট। এ সময় যুগপৎ ঢাকা ও করাচি থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান বিরোধী ভূমিকার জন্য পত্রিকাটি পুনরায় বাঙালি জনগণের ক্ষোভের শিকারে পরিণত হয়। ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি বিক্ষুব্ধ জনতা ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট ভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পরও পত্রিকাটি বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে কোনো সম্পাদকীয় প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে।

৪. *জিন্দেগী*

জিন্দেগী দেশ বিভাগের পর ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম দিকের একটি দৈনিক। প্রাথমিক পর্যায়ে অর্ধসাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হলেও ১৯৪৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর থেকে পত্রিকাটি দৈনিক হিসেবে বের হতে থাকে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন এস. এম. বজলুল হক। চার পৃষ্ঠার পত্রিকাটি বের হতো ২৬৩, বংশাল রোড ঢাকা থেকে এবং এর মূল্য ছিল এক আনা। পত্রিকাটির ওপরে লেখা থাকতো 'কাশ্মীর ও হায়দারাবাদের একমাত্র সংবাদ পরিবেশক'। এই দুই জায়গাতেই তখন যুদ্ধ চলছিল।[২৪] পত্রিকাটি কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে গেলেও এর গুরুত্ব এটাই যে এখান থেকেই পরবর্তী সময়ে বের হয় *সংবাদ*। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে *সংবাদ* পত্রিকার ভূমিকা ছিল বৈচিত্র্যময়।

৫. *পাকিস্তান অবজারভার*

১৯৪৭ সালের পর বিভিন্ন কারণে পূর্ববাংলায় ইংরেজি দৈনিক প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয় যা নিম্নরূপ –

ক. ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলায় কোনো ইংরেজি দৈনিক ছিল না।

খ. ভাষার ভিন্নতার কারণে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষায় ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

গ. পূর্ববাংলায় ইংরেজি দৈনিক প্রকাশিত হলে তার ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এ পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগ দলীয় রাজনীতিক, আইনজীবী ও প্রাদেশিক মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী রাজনীতিতে নিজের প্রভাব বৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক সাফল্যের কথা বিবেচনা করে একটি ইংরেজি দৈনিক প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। অবশ্য প্রথমে তিনি একটি বাংলা দৈনিক প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিন্তু বাংলা টাইপের সংকটের কারণে তিনি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন। ইংরেজি টাইপ আনা হয় লাহোর থেকে বিমান যোগে।[২৫] টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচনের আগে ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ *পাকিস্তান অবজারভার* প্রকাশিত হয়। হামিদুল হক চৌধুরী মুসলিম লীগের সমর্থক হওয়ায় পত্রিকাটির নীতিতেও এর প্রভাব পড়ে। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় বিভাগে প্রথম দিকে কাজ করতেন জহুর হোসেন চৌধুরী ও মোহাম্মদ আবদুল হাই। *পাকিস্তান অবজারভার*-এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ শেহাবউল্লাহ। তিনি সাংবাদিকতা ছেড়ে আইন পেশায় যোগদান করলে ১৯৫০ সালের ৩ জুন পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব নেন আবদুস সালাম। সমগ্র পাকিস্তান আমলে তিনিই *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র আবদুস সালাম অডিট এন্ড একাউন্টস সার্ভিসের কর্মকর্তা ছিলেন। কিন্তু বাঙালিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের প্রতিবাদে তিনি সরকারি চাকুরিতে ইস্তফা দেন।[২৬]

প্রাথমিক পর্যায়ে *পাকিস্তান অবজারভার* ছিল মুসলিম লীগের সমর্থক। কিন্তু বিভিন্ন কারণে পত্রিকাটি সরকারের বিরাগভাজন হয়। টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচনের কিছুদিন পর হামিদুল হক চৌধুরী মুসলিম লীগের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসেন। এ সময় পূর্ব বাংলার প্রধান পত্রিকাগুলো মুসলিম লীগের সমর্থক হওয়ায় *পাকিস্তান অবজারভার* মুসলিম লীগ বিরোধী সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে এবং এর জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়। ১৯৫০ এর দশকের শুরুতে পত্রিকাটি লিয়াকত আলী খান ঘোষিত খসড়া মূলনীতির সমালোচনা করে। তাছাড়া পত্রিকাটি ভাষা আন্দোলনের প্রতিও সহানুভূতিশীল ছিল। কিন্তু ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে ১৯৫২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি *পাকিস্তান অবজারভার* প্রথমবারের মত নিষিদ্ধ হয়।[২৭]

আবদুস সালাম এবং হামিদুল হক চৌধুরী যুক্তফ্রন্টের হয়ে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হন। ফলে ১৯৫৪ সালের ৯ মে থেকে *পাকিস্তান অবজারভার*-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। এ সময় *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার অফিস রাজনীতিবিদদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার পর পত্রিকাটির মালিক হামিদুল হক চৌধুরী, এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টির রাজনীতির সাথে জড়িত হন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ফলে এ পর্যায়ে পত্রিকাটি হয়ে ওঠে কৃষক

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিক পার্টির সমর্থক। *পাকিস্তান অবজারভার* এ সময় আওয়ামী লীগ বিরোধী ভূমিকা নেয় যা সমগ্র ১৯৬০ এর দশক জুড়েই অব্যাহত থাকে।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন জারি করার পর হামিদুল হক চৌধুরী দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হন। আইয়ুব খান প্রণীত রাজনৈতিক দল আইনের আওতায় তিনি রাজনীতি করার অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হন। ফলে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের একটি আন্দোলন হিসেবে ১৯৬২ সালের ৪ অক্টোবর গঠিত ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) – এ হামিদুল হক যোগদান করেন এবং ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এর কোষাধক্ষ্য ছিলেন।[২৮]

১৯৬০ এর দশকে পত্রিকাটি পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যকার বৈষম্যের কথা জোরালো ভাষায় তুলে ধরলেও ছয় দফা বিরোধী অবস্থান নেয়। এমনকি উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানেও পত্রিকাটি ছাত্রদের আন্দোলনে যোগদানের বিরোধী ছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর পত্রিকাটি আপোশমূলক নীতি নেয়। হামিদুল হক চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং *পাকিস্তান অবজারভার* অফিস হয়ে ওঠে রাজাকার-আলবদরদের অন্যতম ঘাঁটি।[২৯]

৬. *ইনসাফ*

ঢাকার বলিয়াদীর জমিদার আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর মালিকানায় এবং মহীউদ্দীন আহমেদ এর সম্পাদনায় ১৯৫০ সালের জুনের মাঝামাঝি ১৩৭ বংশাল রোডের বলিয়াদী প্রিন্টিং প্রেস থেকে বের হয় *ইনসাফ*। পাকিস্তান আমলে প্রগতিশীল সাংবাদিকতার সাথে জড়িত অনেকেই *ইনসাফ* পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কে. জি. মোস্তফা, এ. বি. এম. মুসা, মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ। তবে পত্রিকাটির আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়ায় অনেকেই *ইনসাফ* ছেড়ে চলে যায় এবং পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।[৩০]

৭. *সংবাদ*

মালিকানা পরিবর্তনজনিত কারণে সবচেয়ে বেশি নীতি পরিবর্তিত হয়েছে *সংবাদ*-এর। ১৯৫১ সালের ১৭ মে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় *সংবাদ*। তখন এর সম্পাদক ছিলেন খায়রুল কবীর যিনি নির্দলীয় স্বাধীন মতের কাগজ বের করার লক্ষ্যে *সংবাদ*-এর সাথে যুক্ত হন। পত্রিকাটির মালিক ছিলেন কুমিল্লার ব্যবসায়ী গিয়াসউদ্দীন আহমদ। তিনি *জিন্দেগী* পত্রিকার স্বত্ব কিনে নতুন আঙ্গিকে পত্রিকাটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তার ছোট ভাই

Dhaka University Institutional Repository

নাসিরউদ্দীন আহমদ ছিলেন পত্রিকার প্রকাশক ও সাধারণ সম্পাদক। *সংবাদ* ইস্ট পাকিস্তান প্রেস ২৬৩ বংশাল রোড থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে মওলানা ভাসানী দল নিরপেক্ষ সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বলেন যে *সংবাদ* হবে সেই পত্রিকা। ১৯৪৭ সালের পর ঢাকা থেকে প্রকাশিত কোনো দৈনিকের বাংলা নাম ছিল এই প্রথম। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সমর্থিত *আজাদ* ও *মর্নিং নিউজ* পত্রিকা *সংবাদ* এর সমালোচনা করে এবং এর নামকরণকে হিন্দুয়ানি হিসেবে উল্লেখ করে। পাকিস্তান আমলে এভাবে ব্যক্তিগত ভাবে অন্য পত্রিকাকে আক্রমণ করা ছিল সাধারণ ঘটনা। *সংবাদ* এর সহযোগী সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী এর জবাবে লিখলেন, "ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানে মর্নিং নিউজ মালিকের (খাজা নুরুদ্দীন) নিয়মিত কুত্তার রেস খেলা যদি ইসলাম বিরোধী কাজ না হয়, তাহলে 'সংবাদ' এর মত একটি খাঁটি বাংলা নাম বাংলা কাগজের জন্য রাখায় কি ইসলাম খারিজ হয়ে গেল? আর মওলানা আকরম খাঁ প্রথম দৈনিক পত্রিকা বের করেছিলেন 'সেবক' এই বাংলা নামে। তিনি কি হিন্দুয়ানি বাংলা ভাষার সেবাদাস ছিলেন?"[৩১] পত্রিকাটি 'মহিলা পাতা' নামে ঢাকার পত্রিকাগুলোর মধ্যে প্রথম মহিলাদের জন্য আলাদা একটি পাতা বের করে। প্রথম দিকে মহিলা পাতা'র সম্পাদক ছিলেন লায়লা সামাদ।

ঢাকার প্রায় সব প্রতিশ্রুতিশীল সাংবাদিক প্রথমিক পর্যায়ে *সংবাদ*-এ যোগদান করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সানাউল্লাহ নূরী, আবদুল গাফফার চৌধুরী, কে. জি. মোস্তাফা, জহুর হোসেন চৌধুরী এবং আরও অনেকে।[৩২] জনবল আর লেখনীর বিচারে *সংবাদ* ছিল তৎকালীন সময়ে ঢাকার সবচেয়ে সমৃদ্ধ পত্রিকা। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই পত্রিকাটি আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সম্পাদক খায়রুল কবীরের মধ্যস্থতায় কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ পত্রিকাটি কিনে নেয়। ঠিক হয় একটি ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে পত্রিকাটি পরিচালিত হবে যার সদস্য থাকবেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন এবং দিনাজপুরের মুসলিম লীগ নেতা আব্দুল্লাহ হেল বাকী।[৩৩] কিন্তু লিয়াকত আলী খান ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর নিহত হওয়ার পর ট্রাস্ট গঠন করা সম্ভব হয়নি। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন পত্রিকাটির পরিচালনার দায়িত্ব নেন। পত্রিকাটি হয়ে ওঠে মুসলিম লীগের সমর্থক এবং ভাষা আন্দোলন বিরোধী ভূমিকা পালন করে। এই অবস্থা অব্যাহত থাকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পর্যন্ত। এ পর্যায়ে পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা পাঁচশর নিচে নেমে আসে। নির্বাচনের পর পত্রিকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আসেন আহমেদুল কবীর। খায়রুল কবীর সম্পাদকের চাকুরি ছেড়ে ব্যাংকার হিসেবে কাজ শুরু করলে সম্পাদক হয়ে আসেন জহুর হোসেন চৌধুরী। নির্বাচন পরবর্তী মুক্তিপ্রাপ্ত কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা কর্মী যাদের ঢাকায় আশ্রয় ছিল না, তারা *সংবাদ* এর কক্ষে বা ছাদে

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘদিন বসবাস করেছেন। কমিউনিস্ট নেতা সত্যেন সেন, রনেশ দাশগুপ্ত, সন্তোষ গুপ্ত ক্রমে *সংবাদ* এর সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন।

এ পর্যায়ে পত্রিকাটির মালিকানা আবারও পরিবর্তিত হয়। ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় কোম্পানি – 'দি *সংবাদ* লিমিটেড'। নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হন আহমেদুল কবীর ও নাসিরউদ্দীন আহমদ। জহুর হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দ নুরুদ্দীন পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পত্রিকাটি হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগের সমর্থক। সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী ছিলেন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য। এ সময় *সংবাদ* পুনরায় তার নীতি পরিবর্তন করে। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্র ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে *সংবাদ* ভাসানী তথা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে অবস্থান নেয়। ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হওয়ার পর সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদুল কবীর ন্যাপে যোগদান করেন।[৩৩]

অবিভক্ত ন্যাপে *সংবাদ* ধীরে ধীরে অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ ও মহীউদ্দিন আহমদ উপদলের সমর্থক হয়ে ওঠে। তারা স্বায়ত্তশাসনের দাবি হিসেবে ছয় দফার পক্ষে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেন। ফলে *সংবাদ* ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলনের পক্ষে ভূমিকা রাখে। ১৯৬৭ সালে ন্যাপের আনুষ্ঠানিক বিভক্তির পর অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের নেতৃত্বাধীন মস্কোপন্থি অংশের মুখপত্রে পরিণত হয় *সংবাদ*।[৩৪]

৮. *মিল্লাত*

১৯৫২ সালের জুন মাসে *মিল্লাত* ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুসলিম লীগের তৎকালীন প্রভাবশালী নেতা ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) এবং সম্পাদক ছিলেন কলকাতাস্থ *ইত্তেফাক*-এর সাবেক বার্তা সম্পাদক মোহাম্মাদ মোদাব্বের। *মিল্লাত* ১৭ কোর্ট হাউজ স্ট্রিটের কামাল ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কার্স ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। মুস্তাফা নূর উল ইসলাম, সিকান্দার আবু জাফর, আহমেদুর রহমান, সিরাজুদ্দীন হোসেন, সানাউল্লাহ নূরী, কামাল লোহানী, আবদুল গাফফার চৌধুরী প্রমুখ অনেক বিখ্যাত সাংবাদিক *মিল্লাত*-এ কাজ করেছেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনের সাথে মোহন মিয়ার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং তিনি মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার হন। এ সময় তিনি মুসলিম লীগ বিরোধী শিবিরের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ফলে পত্রিকাটির নীতিতেও এর প্রভাব পড়ে।[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

নুরুল আমীনের বিরোধী হওয়ায় *মিল্লাত* ভাষা আন্দোলনে জোরালো ভূমিকা রাখে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পত্রিকাটি যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন করে। এ পর্যায়ে মোহন মিয়া কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগদান করায় পত্রিকাটি ১৯৫৬ সালের সংবিধানের সমর্থক হয়ে ওঠে। পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে পত্রিকাটি বামপন্থি আদর্শকে সমর্থন করে। তবে ১৯৫৮ সালের আগেই পত্রিকাটির মালিকানা হস্তান্তরিত হয় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার কাছে ফলে পত্রিকাটি হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগের সমর্থক। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির পর *মিল্লাত*-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[৩৬]

৯. *ইত্তেফাক*

বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি একনিষ্ঠভাবে ভূমিকা পালনকারী পত্রিকাটি হলো *ইত্তেফাক*। প্রথমে এটি সাপ্তাহিক হিসেবে ১৯৪৯ সালের ১৫ আগস্ট প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালের পর ঢাকার পত্রিকাগুলো কোনো না কোনো ভাবে মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল। ফলে মওলানা ভাসানী আওয়ামী মুসলিম লীগের মুখপাত্র হিসেবে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* বের করেন। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকার বার লাইব্রেরিতে এক ঘরোয়া সভায় ভাসানী তার এই উদ্যোগের কথা জানান এবং উপস্থিত সদস্যদের কাছ থেকে চারশত টাকা চাঁদা আদায় করা হয়। *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*-এর সরকারি নিবন্ধন নং ছিল ১৭৯। প্রথমে ৭৭ মালিটোলা এবং পড়ে ৯৪ নবাবপুর রোডের আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিস থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো।[৩৭]

সাপ্তাহিক ইত্তেফাক-এর ওপরে তার পরিচয় লেখা থাকতো –‘প্রতিষ্ঠাতা : আবদুল হামিদ খান ভাসানী’। পত্রিকাটির প্রতি কপির মুল্য ছিল দুই আনা। বার্ষিক চাঁদার হার ছিল আট টাকা, ষাণ্মাসিক চার টাকা এবং ত্রৈমাসিক দুই টাকা। চাঁদার হার পত্রিকাটির নিচে মুদ্রিত থাকতো। মওলানা ভাসানীর পর ইয়ার মোহাম্মদ খান, আবু জাফর শামসুদ্দীন ও মুজাফ্‌ফর আহমদ পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পত্রিকাটির নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আওয়ামী মুসলিম লীগের দফতর সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)। ১৯৫১ সালের ১৪ আগস্ট থেকে তিনি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৩৮]

১৯৪৯-৫১ সালের মধ্যে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* তিনবার বন্ধ হয়। চতুর্থ পর্যায়ে ১৯৫১ সালের ১৪ আগস্ট প্রকাশিত হয় পত্রিকাটি। এ সময় এর সার্কুলেশন ছিল প্রায় ৪০ হাজার।[৩৯] অবশেষে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর *ইত্তেফাক* দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং পত্রিকাটির মালিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)। ফলে ভাসানীর সাথে পত্রিকাটির আর

Dhaka University Institutional Repository

কোনো সম্পর্ক থাকেনি। সোহরাওয়ার্দীর অনুসারি মানিক মিয়া *ইত্তেফাক*-কে সোহরাওয়ার্দীপন্থি করে তোলেন।[৪০]

প্রথমদিকে দৈনিক *ইত্তেফাক* ৯ নম্বর হাটখোলা প্যারামাউন্ট প্রেস থেকে প্রকাশিত হতো। ১৯৫৮ সালে মানিক মিয়া ১ নং রামকৃষ্ণ মিশন রোডের বাড়ি ক্রয় করে নিজেই প্রেস স্থাপন করেন। ঐ বছর ১৫ জুন থেকে *ইত্তেফাক* এখানেই মুদ্রিত হতে থাকে। এটিই ছিল পত্রিকার অফিস।[৪১] ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের সংবিধান, সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ, ছয় দফা এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচন প্রতিটি ক্ষেত্রেই *ইত্তেফাক* অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। ফলে *ইত্তেফাক*-এর প্রকাশনা বিভিন্ন সময় নিষিদ্ধ করা হয় এবং মানিক মিয়াও বহুবার কারাবরণ করেন। কিন্তু এরপরও *ইত্তেফাক* বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে অবস্থা ধরে রাখে। তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) প্রায় ১৫ বছর *ইত্তেফাক*-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় সোহরাওয়ার্দীর ১৩ মাসের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় ছাড়া অবশিষ্ট প্রায় ১৪ বছর ক্ষমতাসীনদের বিরোধিতা মোকাবিলা করেছেন। সংসদীয় গণতন্ত্র ও পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরির উদ্দেশ্যে *ইত্তেফাক*-এর 'রাজনৈতিক হালচাল' ও পরবর্তী সময়ে 'মঞ্চে নেপথ্যে' উপ-সম্পাদকীয় কলামে 'মোসাফির' ছদ্মনামে নিয়মিত লিখতে থাকেন মানিক মিয়া। 'রাজনৈতিক মঞ্চ' বা 'মিঠেকড়া' উপ-সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে রাজনীতির কঠিন বিষয়গুলোকে সহজ ও বোধগম্য ভাষায় পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হতো। মানিক মিয়া ১৯৬৯ সালের ১ জুন মৃত্যুবরণ করলে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে সিরাজুদ্দীন হোসেন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীর হাতে অপহৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন।[৪২]

১০. *ইত্তেহাদ* (ভাসানী)

১৯৫৫ সালের ২ মার্চ মওলানা ভাসানীর পরিচালনায় এবং কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিসের সম্পাদনায় *ইত্তেহাদ* প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল ভাসানীর সমর্থক এবং এর সংবাদ প্রকাশের ধরন ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। প্রতিষ্ঠার সাত বছর পর পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

১১. *দৈনিক পাকিস্তান*

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে আইয়ুব খানের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা চালানো এবং তার কর্মকাণ্ডের সমর্থক কিছু পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ সালে গঠন করা হয় ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট। এর মাধ্যমে সরকারি পর্যায় থেকেই ঢাকার সংবাদপত্রগুলোর মাঝে একটি বিভাজন রেখা তৈরি করা হয়। পাকিস্তানের ধনাঢ্য বাইশ পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে এই ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ট্রাস্ট গঠনে যে সব শিল্পপতি সহায়তা করেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দাউদ, ফেন্সী, আদমজী ও সুমার। ট্রাস্ট গঠনকারী শিল্পপতিরা বিভিন্ন পত্রিকার মালিকানা স্বত্ব ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন। এই উদ্দেশ্যে দেড় কোটি টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত রেখে তারা আটটি পত্রিকার শেয়ার ক্রয় করেন। ব্রিটিশ আমলের সিভিলিয়ান আখতার হোসেন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এবং জামিলুদ্দীন আলী সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরোধী ইংরেজী দৈনিক *মর্নিং নিউজ*-এর সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করার পাশাপাশি ১৯৬৪ সালের ৬ নভেম্বর প্রকাশ করা হয় বাংলা পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান*। পাক আর্টস মুদ্রণালয়, ৫০ টিপু সুলতান রোড থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। উর্দু কবি আহসান আহমদ আশককে ট্রাস্টের সদস্য করে *দৈনিক পাকিস্তান*-এর মহাব্যবস্থাপক করা হয়। প্রকাশের প্রথম থেকেই ট্রাস্ট অলিখিত শর্ত স্বীকার করে নেয় যে, পত্রিকায় সরকারি হস্তক্ষেপ থাকবে না। *আজাদ* এর পূর্বতন সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এর আগে দীর্ঘ ২৩ বছর (১৯৪০-৬২) *আজাদ*-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর কর্তৃপক্ষের সাথে মতানৈক্যের কারণে তিনি *আজাদ* ত্যাগ করেন।[৪৩] ট্রাস্ট মালিকানাধীন হলেও প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িত অনেকেই *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকায় যোগ দেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এক সময়ের বামপন্থি নেতা মোজাম্মেল হক, কবি শামসুর রাহমান, সানাউল্লাহ নুরী, কবি হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ। পত্রিকাটি প্রথম থেকেই চলিত ভাষা ব্যবহার করে যেখানে ঢাকার অন্যসব দৈনিক পত্রিকা সাধু ভাষা ব্যবহার করত।[৪৪] প্রগতিশীল সাংবাদিকরা পত্রিকাটির সাথে জড়িত হওয়ার কারণেই উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও পরবর্তী সময় পত্রিকাটিতে বাঙালি জনমতের প্রতিফলন পাওয়া যায়।

১২. *পূর্বদেশ*

১৯৬৯ সালের ১৪ আগস্ট মাহবুবুল হকের সম্পাদনায় দৈনিক *পূর্বদেশ* প্রকাশিত হয়। মাহবুবুল হক ফেনী থেকে প্রকাশিত *সাপ্তাহিক পল্লীবার্তা* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬২ সালের দিকে হামিদুল হক চৌধুরী পত্রিকাটিকে তার অবজারভার গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯৬২ সালের ১৪ আগস্ট *পল্লীবার্তা* নাম পরিবর্তন করে *পূর্বদেশ* রাখা হয়। ১৯৬৯ সালের ১৪ আগস্ট থেকে পত্রিকাটি দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। তবে

Dhaka University Institutional Repository

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় থেকে মাহবুবুল হক এবং *পূর্বদেশ* বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত থাকেননি। এতে হামিদুল হক চৌধুরীর প্রভাব ছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে *পূর্বদেশ*-এর তৃতীয়মত কলামে বিভিন্ন ভাবে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর *পূর্বদেশ* সম্পাদক মাহবুবুল হক দালাল আইনে গ্রেফতার হন।[৪৫]

১৩. *অন্যান্য*

১৯৬৬ সালের ১ ডিসেম্বর মোনায়েম খানের মালিকানায় এবং মুজিবর রহমান খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় *পয়গাম*। পত্রিকাটির নীতি ছিল সাম্প্রদায়িক।[৪৬]

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের কাছাকাছি সময়ে দুটো গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিপরীত ধারার পত্রিকা হলো আবিদুর রহমান সম্পাদিত *দি* পিপল ও জামায়াত-ই-ইসলামি সমর্থক *সংগ্রাম*। *দি পিপল* তার প্রকাশিত সংবাদ ও সম্পাদকীয়তে পাকিস্তান বিরোধী ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে। অপরদিকে ধর্মীয় উগ্রপন্থার সমর্থক *সংগ্রাম* মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থানের জন্য কুখ্যাত হয়ে আছে।

মূল্যায়ন

পাকিস্তান সৃষ্টির পর নবীন রাষ্ট্রটিতে পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করা যায়। এ সময় সর্বমোট ২৭ টি দৈনিক পত্রিকা পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়।[৪৭] ১৯৪৭ সালের পর থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঢাকা থেকে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হলেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সব পত্রিকা সমান গুরুত্ব বহন করে না। মূলত ওপরে বিশ্লেষিত পত্রিকাগুলোই ১৯৪৭-৭১(মার্চ) কালপর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত ঘটনাবলির সাথে জড়িয়ে আছে।

এ সময় অধিকাংশ পত্রিকার মালিকানা একাধিকবার পরিবর্তিত হয়েছে। আর্থিক ও রাজনৈতিক কারণেও অনেক পত্রিকা বন্ধ বা নিষিদ্ধ হয়েছে। আর্থিক কারণে সবচেয়ে বেশি মালিকানা পরিবর্তন হয়েছে *সংবাদ*-এর। অপরদিকে রাজনৈতিক কারণে সবচেয়ে বেশি নিষিদ্ধ হয়েছে *ইত্তেফাক*। পত্রিকাটির সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) একাধিকবার কারাবরণ করেন। আইয়ুব খানের শেষের দিকে ১৯৬৬ সালের ১৬ জুন থেকে ১৯৬৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় দুই বছর সাত মাস পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ থাকে। রাজনৈতিক কারণে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের ধারাটি শুরু হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই। দেশভাগের পর *ইত্তেহাদ* পত্রিকার ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায়। মুসলিম লীগ সরকার এই নেতিবাচক উদাহরণ সৃষ্টি করে।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান অবজারভার এবং *ইত্তেফাক* পত্রিকা দুটিও মুসলিম লীগ সরকারের সাথে বিরোধিতার কারণে নিষিদ্ধ হয়। মুসলিম লীগ সরকার সংবাদপত্রের ওপর দমনপীড়নের যে প্রক্রিয়া শুরু করে আইয়ুব খানের আমলে সেটি আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। এ সময় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারি করার পাশাপাশি ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট গঠন করে *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। ইংরেজি দৈনিক *মর্নিং নিউজ*-এর দায়িত্ব নেয় ট্রাস্ট। তবে ১৯৪৭-৭১(মার্চ) কালপর্বে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত দুটো পত্রিকা হলো *আজাদ* ও *মর্নিং নিউজ*।

১৯৪৭ সালের পর ঢাকার সংবাদপত্র জগতে যে শূন্যতা তৈরি হয় সেই শূন্যতা পূরণে এসব পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতার একটি কাঠামো ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। আর এক্ষেত্রে মূল উপাদান হিসেবে কাজ করেছে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে ১৯৪৭-৭১(মার্চ) সময়কালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রের ভূমিকা অভিসন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. সীমা মোসলেম, কাজী শফিকুর রহমান, সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস (১৭৮০-১৯৪৭)*, ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ২০১৫, পৃ. ৭।

২. Hemendra Prasad Ghose, *The Newspaper in India*, Calcutta : Calcutta University, 1952, p.1; এই বিষয়ে বোল্ট -W. Bolts, *Consideration on India affairs*, London : 1772 গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৩. Mrinal Knati Chandra, *History of the English Press in Bengal, 1780-1857*, Calcutta : South Asia Books, pp. 1-5.

৪. দেবেশ ভট্টাচার্য, *উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিকতা গদ্য*, কলকাতা: ১৯৯০, পৃ. ৭৭।

৫. সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫, পৃ. ১৩।

৬. *ঐ*, পৃ. ১৫।

৭. মোঃ এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮, পৃ.৩০।

৮. এই পাঁচজন মালিক ছিলেন – এ. এম. ক্যামারন, এল. পি. পোগজ, জে. এ. গ্রেগ, জে. পি. ওয়াইজ, কে. এ. গনি; বিস্তারিত -সুব্রত শংকর ধর,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬।

৯. মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

১০. *ঐ*, পৃ. ৩৬-৩৭।

১০(ক). পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য।

১১. আবুল কালাম মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ,*বাঙালি মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৯, পৃ.৩৫।

১২. *আজাদ*, ৩১ অক্টোবর ১৯৩৬।

১৩. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, *মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন*, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২৮-২৯।

১৪. সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

১৫. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০১৫, পৃ. ২০৮।

১৬. সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

১৭. জুলফিকার হায়দার, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা*, ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ১৭২।

১৮. *ঐ*, পৃ. ১০৬।

১৯. সুব্রত শংকর ধর,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

২০. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮।

২১. মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২।

২২. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।

২৩. সুব্রত শংকর ধর,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০।

২৪. এম. আর. আখতার মুকুল, *ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা: শিখা প্রকাশনী, পৃ.১৬০।

২৫. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯।

২৬. *ঐ*, পৃ. ১১৯।

২৭. বশীর আলহেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ৩৩৪।

২৮. আজম বেগ, 'চৌধুরী হামিদুল হক', *বাংলাপিডিয়া*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭ (সিডি সংস্করণ)।

২৯. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯।

৩০. সুব্রত শংকর ধর,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১।

৩১. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫।

৩২. সুব্রত শংকর ধর,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।

৩৩. মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০।

৩৪. মোরশেদ শফিউল হাসান, *স্বাধীনতার পটভূমি ১৯৬০ দশক*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১৪, পৃ. ১১২।

৩৫. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১।

৩৬. সুব্রত শংকর ধর,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০।

৩৭. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪, পৃ. ৭৩।

৩৮. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. এম. আর. আখতার মুকুল, 'চার দশকের স্মৃতি', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ জানুয়ারি ১৯৯৩।

৪০. মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯।

৪১. এম. আর. আখতার মুকুল, *পাকিস্তানের চব্বিশ বছর ভাসানী মুজিবরের রাজনীতি*, ঢাকা : সাগর পাবলিসার্স, ১৯৬৯, পৃ. ৯৬।

৪২. মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮।

৪৩. *ঐ*, পৃ. ১৭০।

৪৪. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪।

৪৫. সুব্রত শংকর ধর,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।

৪৬. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২।

৪৭. *ঐ*, পৃ. ১৯২।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাক সামরিক আমল (১৯৪৭-৫৮) ও সংবাদপত্রের ভূমিকা

ভৌগোলিক অসামঞ্জস্যপূর্ণ অঞ্চল নিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামে যে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে বর্তমান বাংলাদেশ ছিল এর একটি অংশ (তৎকালীন পূর্ব বাংলা -১৯৫৫ সাল পর্যন্ত)।[১] ১৯৫৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কার্যকর হয়। নতুন সংবিধানে পশ্চিম পাকিস্তানের সবগুলো প্রদেশ এক ইউনিট হিসেবে এবং পূর্ব বাংলা প্রদেশ 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে দ্বিতীয় ইউনিট হিসেবে অভিহিত হয়।[২] ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট করাচিতে পাকিস্তানের সংবিধান সভার ভাষণে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ রাষ্ট্রের চরিত্র ও কাঠামো সম্পর্কে বলেন:

> ...যে কোনো ধর্ম, বর্ণ, গোত্র বা বিশ্বাসের লোক হতে পারেন আপনি – রাষ্ট্রের সঙ্গে কাজের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ... কালক্রমে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না এবং মুসলমান আর মুসলমান থাকবে না; অবশ্যই ধর্মীয় অর্থে নয়, কেননা ধর্ম হচ্ছে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস; কথাটা রাজনৈতিক অর্থে নয়, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে।[৩]

কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানকে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে যেসব আলেম ও রাজনীতিবিদ সক্রিয় ছিলেন, তাদের প্রচেষ্টাকে জিন্নাহ নিজেই রোধ করতে পারেননি। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে দুই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে তিনি কোনো সুষম পদক্ষেপ নেননি। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানদের সমর্থনের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে তিনি পাকিস্তানের একমাত্র

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম লীগের অবাঙালি নেতৃত্ব পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ হিসেবে গণ্য করতে থাকে। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে জিন্নাহর মৃত্যুর পর প্রাদেশিক মুসলিম লীগের দুর্বলতার সুযোগে রক্ষণশীল নেতারা তাদের প্রভাব ও ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি করতে থাকেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রে আত্মপরিচয়ের মুখোমুখি হয়ে এবং স্ববিরোধিতা আবিষ্কার করে বাঙালি জাতি সচেতন হয়। এ সময় পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নানা মেরুকরণ ঘটে। মুসলিম লীগ ও এর ছাত্র সংগঠনের পরিবর্তে নতুন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। এটি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠনে ভূমিকা রাখে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হলেও নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের ষড়যন্ত্রে যুক্তফ্রন্ট তাদের ঐক্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির নয় বছর পর যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয় তাতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিলেও পূর্ব বাংলার অধিক স্বায়ত্তশাসনসহ পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে সমতা বিধানকে অস্বীকার করা হয়। ১৯৫৪-৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা বিরাজ করছিল। একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিকদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা, অন্যদিকে পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার মোহ ইতিহাসের গতিধারাকে আরও অস্বাভাবিক দিকে প্রবাহিত করে। এই কলুষিত রাজনীতি সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। ১৯৫৮ সালে জারি হয় পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন। সুতরাং সামগ্রিকভাবে প্রাক সামরিক আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের মাইলফলক হিসেবে তিনটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য - ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮ ও ১৯৫২), ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধান।

১. ভাষা আন্দোলন

১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রথম আদমশুমারিতে দেখা যায় মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪০% বাংলা এবং ৩.৩৭% উর্দু ভাষার নাগরিক।[৪] পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে, বাংলা না উর্দু – দেশ বিভাগের পর এটি ছিল সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের অবাঙালি নেতৃত্ব প্রথম থেকেই এই অঞ্চলকে পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।ধর্ম ছাড়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের ১২'শ মাইল দূরে অবস্থিত দুটো ভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অন্য কোনো মিল নেই - এ সত্য উপলব্ধি করে তারা অর্থনৈতিক শোষণ দ্বারা একে টিকিয়ে রাখতে এবং বাঙালি সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ইসলামি রূপ দিতে সচেষ্ট হয়। পূর্ব বাংলার আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে বিষয়টি জড়িয়ে ছিল। ফলে ঐতিহাসিক ভাবে উদার কিন্তু রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের অংশ হয়ে পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগণ

Dhaka University Institutional Repository

আত্মপরিচয় খুঁজতে গিয়ে যে রাজনৈতিক সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে সেটির সূচনা ঘটে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ভাষা আন্দোলনই ছিল এ অঞ্চলের প্রথম গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং এ আন্দোলনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী অনুভব, যেটি ছিল সুপ্ত কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সামনে চলে আসে।[৫] যেহেতু ভাষা জাতীয়তাবাদের অন্যতম উপাদান তাই ভাষা আন্দোলনকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রথম বহিঃপ্রকাশ বলা যায় কারণ এর সাথে কেবল ভাষা বিষয়টি জড়িত ছিল না, পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাকিস্তানের মুদ্রা, ডাকটিকেট ইত্যাদিতে বাংলা ভাষার স্থান ছিল না। এমনকি ১৯৪৮ সালে পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষা থেকেও বাংলা বাদ দেওয়া হয়। পাশাপাশি বাক্ স্বাধীনতা হরণ করার জন্য ১৯৪৮ সালের ৯ জুন 'বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স' নামে একটি ধারা সংযোজন করে সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা, পুস্তিকা ও অন্যান্য কাগজপত্রাদির নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়।[৬] ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে আরবি হরফে বাংলা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করে মুসলিম লীগ সরকার। ১৯৪৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় আরবি হরফকে পাকিস্তানের ভাষার একমাত্র হরফ করার জোর সুপারিশ করেন। সুতরাং বাঙালির সাহিত্য, সংস্কৃতি, চাকুরি তথা অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ, ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তানে বাঙালির মর্যাদা – অর্থাৎ একটি মানবগোষ্ঠী হিসেবে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা চিন্তার অন্তর্গত ছিল। ফলে ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, পেশা নির্বিশেষ সকল বাঙালি ভাষা আন্দোলনে অংশ নেয়।

সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকরাও ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ফলে পত্রপত্রিকায় বাংলা ভাষার পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনার ওপর ভিত্তি করে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ভাষা আন্দোলনের দুটো পর্যায় ছিল- ১৯৪৮ ও ১৯৫২। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা আবুল কাসেমের মতে, দেশভাগের পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে সেটি নিয়ে চিন্তা করার লোক একদিকে যেমন কম ছিল তেমনি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে উর্দুরও অনেক সমর্থক ছিল। পূর্ব বাংলার বৃহত্তম জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে ছিল অসচেতন ও উদাসীন। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যেই সন্দেহ ছিল। এত বড় আশা করতে তারা ভয় পেতেন, তাই বাংলা যদি পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা হয় সেটিকেই তারা অনেক বড় পাওয়া বলে মনে করতেন।[৭]

এ পরিস্থিতিতে বাংলাভাষার পক্ষে জনমত তৈরিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা অপরিসীম। তবে ১৯৪৭ সাল ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব এবং এটি শুরু হয়েছিল ১৪ আগস্টের অন্তত দু'মাস আগে। লেখক ও

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধিজীবীরা সংবাদপত্রের পাতায় সেটি শুরু করেছিলেন। ১৯৪৭ সালের আগস্টের আগেই লেখক বুদ্ধিজীবীরা পত্র পত্রিকায় রাষ্ট্রভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার দাবিকে বেশ জোরালোভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সংবাদপত্রে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন আলোচনা ভাষা সংগ্রামীদের উদ্‌বুদ্ধ করার পাশাপাশি আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। ভাষা আন্দোলনের সময় যেসব যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে তার প্রায় সবই ঢাকার প্রধান প্রধান পত্রিকার লেখাগুলোতে ছিল।

ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য দৈনিক পত্রিকা ছিলঃ *আজাদ*, *ইনসাফ*, *সংবাদ*, *মর্নিং নিউজ* ও *পাকিস্তান অবজারভার*। গবেষণার ক্ষেত্রে এই পত্রিকাগুলোকেই বিবেচনায় আনা হয়েছে।

১.১ *আজাদ*

ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে *আজাদ* কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হতো। দেশ ভাগের পর পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালের ১৯ অক্টোবর। আলোচ্য গবেষণায় যদিও ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু গবেষণার ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হওয়ার আগে পত্রিকাটির ভূমিকা কিছুটা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগেই পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার মনোভাব প্রকাশ করেন। *আজাদ* ভাষা বিতর্কে অংশ নেয়া শুরু করে পাকিস্তান সৃষ্টিরও আগে থেকে – যেখানে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল প্রধানত রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণ প্রসঙ্গে। ১৯৪৭ সালের ১৯ মে *আজাদ* এ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করে। সংবাদে বলা হয় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য চৌধুরী খালেকুজ্জামান মজলিশ-এ-ইত্তেহাদুল মছলেমিনের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উর্দু সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, কংগ্রেস উর্দু ভাষাকে পঙ্গু করে মুসলমানদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করতে চায়। তিনি আরও বলেন উর্দু মুসলমানের পাশাপাশি হিন্দুরও ভাষা, সুতরাং এ ভাষার মৃত্যু সহজে হতে পারে না।[৮] সংবাদটি ভারত বিভাগের আগের, পাকিস্তানের ভৌগোলিক চেহারা কি হবে তা তখনও স্পষ্ট নয়। এখানে স্বার্থের সংঘাত বেঁধেছে উর্দুর সাথে হিন্দির। পরে পাকিস্তানে একই সংঘাত তৈরি হয় উর্দু আর বাংলার। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে খালেকুজ্জামান ও অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতারা ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের দুঃখ বুঝতে পারলেও পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু বাঙালি ও বাংলাভাষীদের ভাষার স্বার্থ বুঝতে পারেননি।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

আজাদ পত্রিকার সাংবাদিক আবদুল হক ১৯৪৭ সালের মধ্যভাগে ভাষা সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় চারটি প্রবন্ধ লেখেন। এসব প্রবন্ধে তিনি যুক্তি দিয়ে বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয় মানস গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উল্লেখ করেন। প্রবন্ধগুলো হলো- ক. 'বাংলা ভাষাবিষয়ক প্রস্তাব' (*ইত্তেহাদ*, ২২ ও ২৯ জুন ১৯৪৭), খ. 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' (*আজাদ*, ৩০ জুন ১৯৪৭), গ. 'উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে' (*ইত্তেহাদ*, ২৭ জুলাই, ১৯৪৭), ঘ. 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' (*বেগম*, ৩ আগস্ট ১৯৪৭, মিসেস এম এ ছদ্ম নামে)।[১০]

আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উর্দুর চেয়েও উন্নত এবং ভবিষ্যৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিরা উর্দুভাষীদের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে - এটি ছিল প্রধান যুক্তি।[১১] আবদুল হক প্রবন্ধ রচনা ছাড়াও বাংলা ভাষার পক্ষে লেখক ও সাংবাদিকদের মধ্যে প্রচারণা ও পারস্পরিক আলোচনার বিষয়টিকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি মন্তব্য করেন, "সাংবাদিকতা বা সাহিত্যচর্চা যারা করতেন তাঁদের কেউ উর্দু রাষ্ট্রভাষা সমর্থন করতেন এমনটি দেখিনি – অবশ্য আমার জানামতে কবি গোলাম মোস্তাফা এবং সাংবাদিক লেখক মুজিবর রহমান খাঁ উর্দুর সমর্থক ছিলেন"।[১২]

আজাদ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে জনমত প্রকাশ করতে থাকে 'পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (বিতর্ক)' শিরোনামে যা দুই দফায় প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালের ৩০ জুন এবং ২০ জুলাই। এসব আলোচনায় অধিকাংশ লেখক পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার পক্ষে অভিমত দিয়েছেন।[১৩] এছাড়া *আজাদ* ২১ জুলাই আবদুল মতীনের 'পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করে যেখানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য আলাদা রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাব করা হয়।[১৪] ২৭ জুলাই এ. কে. নুরুল হক 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে একমাত্র বাংলাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন।[১৫] এ পর্যায়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার পক্ষে তার অভিমত দিয়ে নিবন্ধ প্রকাশ করেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. জিয়াউদ্দিন ভারতে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার অনুকরণে পাকিস্তানে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে যুক্তি দিয়ে ১৯৪৭ এর জুলাই মাসে বিবৃতি দেন।[১৬] এর প্রতিবাদ করে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন যা *আজাদ* পত্রিকার ১৯৪৭ সালের ২৯ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন যে, বিশ্বের ভাষা সমূহের মধ্যে বাংলা ভাষার অবস্থান সপ্তম কারণ অনেক বেশি লোক এ ভাষায় কথা বলে। তাই বিদেশি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হলেও বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষে কোনো যুক্তি দেওয়া যায় না। তিনি ড. জিয়াউদ্দিনের সমালোচনা করে বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার স্বপক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন আমি একজন শিক্ষাবিদরূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। উহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নীতি বিরোধীই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি বিগর্হিতও বটে।[১৭]

তিনি বাংলাকে পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এবং উর্দুকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি আরবি ও ইংরেজিকেও অনুরূপ মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। ফলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অভিমত রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে কতটা যুক্তিসঙ্গত সেটি নিয়ে বিতর্ক আছে।[১৮] তবে এই জটিলতা ও পরস্পর বিরোধী চিন্তাভাবনা সমসাময়িক রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তাই বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্রতিবাদী চিন্তা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। উর্দুর পক্ষে ড. জিয়াউদ্দিনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কেউ প্রতিবাদ করেনি, এমনকি মুসলিম লীগ মহলেও এটি নিয়ে বিতর্কের সূচনা হয়নি। তার এই সুপারিশের অসারতা সম্পর্কে পূর্ব বাংলার জনগণ ও শিক্ষিত সমাজকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ *আজাদ* পত্রিকাতে এই প্রবন্ধ লেখেন।[১৯] তবে বাংলা ভাষা বিরোধী বক্তব্যও *আজাদ* নিয়মিত প্রকাশ করে। এর প্রতিবাদ করে ১৯৪৭ সালের ১০ জুলাই কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *স্বাধীনতা*য়, ‘পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ শীর্ষক একটি পত্রে জনৈকা হামিদা সেলিম মন্তব্য করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় *আজাদ* পত্রিকায় বাংলা ভাষার বিপক্ষে যুক্তি দেখে দুঃখ হয়।[২০] *আজাদ* বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ও বিপক্ষের দাবি নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৭ সালের ৫ অক্টোবর *আজাদ*, ‘মহিলা মাহফিল’ এ ‘ভাষা সমস্যা’ শীর্ষক আলোচনা প্রকাশ করে। এ আলোচনা থেকে জানা যায় তৎকালীন সময়ে ভাষা সমস্যা নিয়ে বহু আলোচনা, সভাসমিতি, তর্কবিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় এবং অধিকাংশ সভাতে বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।[২১] একই সাথে *আজাদ* বাংলা ভাষার পক্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভা সমিতি এবং এতে প্রদত্ত মতামত গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে ফজলুল হক মুসলিম হলে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। *আজাদ* এসব সভা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এসব প্রতিবেদনে বাংলাকে সমগ্র পাকিস্তানের পরিবর্তে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষেই বেশি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া পূর্ব বাংলার জনগণকে বাঙালি বলার পরিবর্তে ‘মোসলেম বাঙালি’ বলার প্রবণতা ছিল লক্ষণীয়।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন ব্যক্তিগতভাবে ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৮ নভেম্বর পত্রিকাটি ৫ নভেম্বর শিল্পী জয়নুল আবেদিনকে দেওয়া অভ্যর্থনা বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে মন্তব্য করে, *আজাদ* সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন এম. এল. এ বাংলাভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার সমর্থন জানিয়ে বলেন যে ইসলামি প্রভাবের ফলে বাংলা ভাষা ক্রমন্নতি লাভ করে এবং এর প্রসার হয়।[২৩] ১৯৪৭ সালের ১৫ নভেম্বর তমুদ্দিন মজলিশের সাথে সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে নুরুল আমিনের বক্তৃতা উদ্ধৃত করে *আজাদ* সংবাদ প্রকাশ করে।[২৪]

ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাকে সমগ্র পাকিস্তানের পরিবর্তে কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষেই জনমত গঠিত হয়েছিল। এই তালিকায় ছিলেন সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, আইনজীবী, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা সহ আরও অনেকে। বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণি বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকপত্র দাখিল করেন। ১৯৪৭ সালের ১৮ নভেম্বর *আজাদ* বিষয়টি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তবে প্রতিবেদন থেকে স্মারকপত্রের তারিখ বা প্রধানমন্ত্রীকে এটি কবে দেওয়া হয়েছিল সেটি জানা যায় না। নভেম্বরের শেষ দিকে চট্টগ্রামের ছাত্ররা পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করার জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। ২৮ নভেম্বর সংবাদটি প্রকাশ করার মাধ্যমে ঢাকার বাইরেও ছাত্র শিক্ষক জনতা বাংলাভাষার দাবিতে যে ধীরে ধীরে সংগঠিত হচ্ছে *আজাদ* সেই বার্তাটি বাঙালি জনগণকে পৌঁছে দেয়। এরপর ১৯৪৭ সালের ৩০ নভেম্বর পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের সুপারিশকে উদ্ধৃত করে *আজাদ* প্রকাশ করে, "উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করার সম্ভাবনা"। এই শিক্ষা-সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় ভাষার প্রশ্নে বিতর্ক ও অসন্তোষ এবং ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বাংলার স্বার্থ ও অধিকারের প্রশ্নে সংশয় সৃষ্টি হয়।

রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আজাদের মালিক ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ বাংলা ভাষার পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন। ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলনকারী ছাত্র শিক্ষকদের সাথে বর্ধমান হাউজে (বর্তমান বাংলা একাডেমি) এক বৈঠকে তিনি বলেন যে, বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষাকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করা হলে পূর্ব বাংলা বিদ্রোহ করবে যেটির নেতৃত্ব তিনি দেবেন।[২৫] একই ভাবে ৭ ডিসেম্বর সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে একটি সভায় বাংলার পক্ষে আকরম খাঁ কঠোর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি তখন পর্যন্ত বক্তৃতায় 'বাংলাদেশ' কথাটি ব্যবহার করতেন। এছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

তিনি *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামের সমালোচনা করতে গিয়ে 'বাঙালি মুসলমান' শব্দটি ব্যবহার করেন।[২৬] ফলে *আজাদ*-এর নীতিতেও এর একটি প্রভাব পাওয়া যায়।

৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছাত্রদের সাধারণ সভার পর যে মিছিল বের হয় ৭ ডিসেম্বর *আজাদ* সেটির বিবরণ প্রকাশ করে। মিছিলে ব্যবহৃত 'উর্দু জুলুম চলবে না', 'পাঞ্জাবী রাজ বরবাদ' ইত্যাদি স্লোগান প্রকাশ করে *আজাদ* নিঃসন্দেহে আন্দোলনের ভিত্তিভূমি তৈরিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখে। এর বাইরে পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়েই *আজাদ* বাংলাভাষার পক্ষে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির অভিমত প্রকাশ করে জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে। এসবের মধ্যে অন্যতম ছিল চট্টগ্রাম থেকে প্রেরিত ড. কুদরতে খোদা ও পাকিস্তান গণ পরিষদের সদস্য তমিজুদ্দীন খানের অভিমত।[২৭] দুটি অভিমতই প্রকাশিত হয় ১৪ ডিসেম্বর। ড. কুদরতে খোদার অভিমতে বলা হয়, "... জনগণের উপর অস্বাভাবিক কোন কিছু চাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারেনা, পারা উচিতও নয়। বঙ্গভাষাই আমাদের মাতৃভাষা"।[২৮] ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে উর্দু ও বাংলা ভাষার সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে এবং *আজাদ* ১৩ ডিসেম্বরের সংখ্যায় এটি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে কোনো উসকানি প্রদান না করে ঘটনার একটি পরিপূর্ণ বিবরণ তুলে ধরা হয়। *আজাদ* ঘটনাটি সম্পর্কে ১৯ ডিসেম্বর দুটি ('অহেতুক উত্তেজনা' ও 'সংহতির আবেদন') এবং ২১ ডিসেম্বর 'কুচক্রীর হস্ত' শিরোনামে সম্পাদকীয় লেখে। উর্দুর পক্ষ সমর্থন করে শেষটিতে বলা হয়:

> আমরা কয়েকটি প্রবন্ধে এ সমন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, পাকিস্তানের সাধারণ জবান যে উর্দু হইবে এ সম্পর্কে মতবিরোধের কোন অবকাশ নাই। উর্দুপন্থী ও বাঙ্গালা-পন্থীদের প্রায় সকলেই এ ব্যাপারে একমত। তারা প্রায় সকলেই এ মত পোষণ করেন যে, পূর্ববাংলার শিক্ষার মাধ্যম ও অফিস আদালত ও কারবার দরবারের ভাষা বাংলা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।... পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করিয়া কয়েক মাস আগেই "স্বাধীন এবং সার্ব্বভৌম বাংলা"র ধ্বজা লইয়া একদল লীগপন্থীকেও... তাদের কথা ছিল ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন।... এরূপ কোনো মতলববাজ দলের কুচক্রী হস্তের খেলাকে পূর্ব্ব পাকিস্তানের সরকার ও জনগণ যে সহ্য করিবে না, তা বলাই বাহুল্য।[২৯]

মূলত ১৯৪৭ সালের মে মাসে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী - আবুল হাশিম গ্রুপের নেতৃত্বে ভাষার ভিত্তিতে অখণ্ড বাংলা গঠনের যে প্রয়াস নেয়া হয়েছিল তার জের ধরে *আজাদ* এই মন্তব্য করে।[৩০] ভাষার দাবি নিয়ে যখন ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করা প্রয়োজন সে সময়ে এই ব্যাক্তিগত দ্বন্দ্বের বিষয়টি *আজাদ* পত্রিকায় যেভাবে উঠে আসে সেটি ছিল দুর্ভাগ্যজনক। এ সম্পাদকীয় প্রকাশের মাধ্যমে *আজাদ* মালিক আকরম খাঁ, মুসলিম লীগে তাদের প্রতিপক্ষ আবুল হাশিমপন্থিদের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান জানানোর সুযোগ পেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও এটি ছিল ভাষা আন্দোলনের একেবারে প্রাথমিক পর্যায় কিন্তু সে সময় পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় ভাষার দাবি যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল সেটি বোঝার বোধ তখনও *আজাদ*-এ কর্মরত সাংবাদিক বা এর মালিক পক্ষের তৈরি হয়নি। সাধারণ ভাষা হিসেবে বাংলার দাবি যে ধীরে ধীরে একটি শক্ত ভিত্তি পেয়েছিল সেটি বোঝার ক্ষমতা *আজাদ* তখনও অর্জন করেনি। এ কারণে পত্রিকাটি এ সম্পাদকীয়তেই "অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে পরিস্থিতি শান্ত হইয়া গিয়াছে এবং উত্তেজনা প্রশমিত হইয়াছে" বলে যে দাবি করেছিল সেটি কিছুদিনের মধ্যেই ভুল প্রমাণিত হয়। ২১ ডিসেম্বর আজাদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর 'পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ছাপায়। এর আগে ১৯৪৭ এর ২১ জুলাই একই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে তিনি এবার কিছুটা সরে আসেন এবং সমগ্র পাকিস্তানের পরিবর্তে বলেন বাংলা হবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তাছাড়া এবার তিঁনি উর্দুর দিকে অনেক বেশি সমর্থন প্রকাশ করেন।[৩১]

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলা ভাষা সংক্রান্ত যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় সেখানে পূর্ব বাংলা কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১)[৩২] ভাষা প্রশ্নে সরকারি প্রস্তাবের ওপর একটি সংশোধনী পেশ করেন যেখানে তিনি উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও পরিষদের ভাষা করার প্রস্তাব করেন।[৩৩] কিন্তু ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ নেতাদের বিরোধিতায় প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। ঐ সময় বাংলা ভাষাকে কটাক্ষ করেও অনেক সদস্য বক্তব্য রাখেন। খাজা নাজিমুদ্দিন দাবি করেন পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীর মনোভাব ছিল রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষে।[৩৪] এর প্রতিবাদ করে ২৮ ফেব্রুয়ারি *আজাদ* 'বাংলাভাষা ও পাকিস্তান' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে বলা হয়:

> খাওয়াজা সাহেব কবে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের গণভোট গ্রহণ করিলেন, তাহা আমরা জানিনা, আমাদের মতে তার উপরোক্ত মন্তব্য মোটেই সত্য নয়।... তিনি এইরূপ একটি দায়িত্বহীন উক্তি করিয়া শুধু পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক স্বার্থের ক্ষতি করেন নাই, এ দেশবাসীর পক্ষে আপন প্রতিনিধিত্বের অধিকারের মর্যাদাকেও ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক স্বার্থকে এভাবে বিকাইয়া দেওয়া কি এতই সহজ?[৩৫]

পরদিন 'বাংলা ভাষার অপমান' শীর্ষক অপর একটি সম্পাদকীয়তে *আজাদ* মন্তব্য করে:

> ...পাক গণপরিষদের সদস্যগণের সংখ্যাগুরু অংশ এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬১ ভাগেরও অধিক পূর্ব্ব পাকিস্তানের ও তাহাদের শতকরা ৯৯ জনেরও অধিক বাংলাভাষী। এমতাবস্থায় বাংলাভাষাতো উপেক্ষিত হইতেই পারে না, অধিকন্তু ইহা সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা রাখে।... উর্দু মুসলমানের জাতীয় ভাষা হওয়ার অধিকার কবে এবং কোথায় অর্জন করিল?...এই অবস্থায় গণপরিষদের পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণের এখন হইতে

Dhaka University Institutional Repository

সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, যাহাতে বাংলা ভাষার অধিকতর অসম্মান তাঁহাদের নিষ্ক্রিয়তায় না ঘটে।...পূর্ব্ব বাংলার পরিষদের অধিবেশন আগামী একপক্ষ কালের মধ্যে আরম্ভ হইবে। এই অধিবেশনে প্রাদেশিক দফতরের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষাকে গ্রহণ করিয়া ... গণপরিষদের পূর্ব্ববঙ্গীয় সদস্যগণ তাহাদের পূর্ব্বকৃত ভুলের কিঞ্চিত প্রতিকার করিবেন বলিয়া আশা করি।[৩৬]

সম্পাদকীয়তে *আজাদ* বাংলা ভাষার পক্ষে একটি জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করলেও এতে কিছু ফাঁক ছিল। শেষ বাক্যে *আজাদ* উপদেশ দিয়েছে যে, পরিষদের অধিবেশনে যেন বাংলাকে পূর্ব বাংলার সরকারি কাজের ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মূল বিতর্কটি হয়েছিল গণপরিষদের ভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করা নিয়ে যেটি *আজাদ* সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছে। বাংলা ভাষার পক্ষে এত জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করার পরও *আজাদ* ১৯৪৮ সালের মার্চের ভাষা আন্দোলনের সময় সার্বিকভাবে সরকারি পক্ষ অবলম্বন করে। তবে সমগ্র ফেব্রুয়ারি ও মার্চ জুড়েই *আজাদ* স্থানীয় পর্যায়ে সংঘটিত আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ৫ মার্চ আজাদ 'পূর্ব্ব পাকিস্তানে বাংলাভাষা' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে যেখানে উর্দুর পক্ষ অত্যন্ত জোরালোভাবে সমর্থন করে বলা হয় যে, উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা হলে সেটি নিতান্ত অযৌক্তিক বা অশোভন হবে বলা চলে না।[৩৭]

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার দাবিতে এবং গণপরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলাকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে তমদ্দুন মজলিস ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। হরতাল পালনকালে প্রতিবাদকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে এবং ব্যাপক সহিংস ঘটনা ঘটে। ১১ মার্চের ঘটনা নিয়ে পূর্ব বাংলা সরকার যে ইশতাহার প্রকাশ করে সেখানে ঘটনাটির একটি সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে ঘটনাটি ঘটেছে।[৩৮] ১৪ মার্চ আজাদ এ বিষয়ে 'ঢাকার বিক্ষোভ' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এখানেও ভাষা প্রশ্নে পত্রিকাটি দ্বৈত নীতির পরিচয় দেয়। সামগ্রিক ঘটনার জন্য বামপন্থিদের দায়ী করে বলা হয়:

... রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নজড়িত আন্দোলন কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ে আবদ্ধ নহে। এ প্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তোলার কোন কারণ বা সঙ্গতি আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। তবে কোনো কোনো বামপন্থী আখ্যাধারী রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনের সুযোগ লইয়া নিজেদের মতলব হাসেল করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং অযথা উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া অশান্তি ঘটাইবার প্রয়াস পাইতেছে, এমন হওয়া অসম্ভব নহে।[৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

১৭ মার্চ *আজাদ* তাদের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী নাজিম উদ্দিনের বাংলাকে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক ভাষা করার ঘোষণা বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করে। এখানে *আজাদ* বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছুটা সাম্প্রদায়িক নীতির প্রকাশ ঘটায়। ১৯৪৮ সালের মার্চে জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে ঘোষণা করায় যে আন্দোলন তৈরি হয় *আজাদ* তাতে সরকারি পক্ষ অবলম্বন করে। ২৬ মার্চ *আজাদ* জিন্নাহর 'আন্দোলনের পশ্চাতে পঞ্চম বাহিনীর অস্তিত্ব' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে কিন্তু ছাত্ররা যে 'না না' বলে প্রতিবাদ করেছিল সেটি পত্রিকাটি এড়িয়ে যায়। একইভাবে ২৯ মার্চ সংখ্যায় 'প্রাদেশিকতা ত্যাগ করিয়া ঐক্য ও সংহতির পথে অগ্রসর হইতে আহ্বান' জিন্নাহর এ বক্তব্যকে শিরোনাম করা হয়। কিন্তু এ পুরো সময়টায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্র জনতার আন্দোলনের বিষয়টি *আজাদ* উপেক্ষা করে।[৪০]

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যখন সারা পূর্ব বাংলায় আন্দোলন চলছে তারই কাছাকাছি সময়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা – পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন।[৪১] এ সম্মেলনে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে *আজাদ* সাম্প্রদায়িক চরিত্রের প্রকাশ ঘটায়। ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন:

> আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাংগালী। ... মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাংগালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে মালা তিলক টিকিতে কিংবা টুপী-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো টি নেই।[৪২]

এ ঐতিহাসিক ঘোষণার মধ্যে নিহিত ছিল বাঙালি জাতিসত্তার মর্মবাণী, যা ছিল অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ। *আজাদ* এই সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজনের সাথে যুক্ত ছিল কিন্তু পত্রিকাটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এ বক্তব্যকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে বলা হয়:

> অখণ্ড ভারতের যুক্ত বাংলায় সাহিত্যিক অভিভাষণে এমন কথা অনেকেই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু বিভক্ত ভারতের দ্বিখণ্ডিত বাংলায় পাকিস্তানি পরিবেশে এই শ্রেণীর কথা শুনিতে হইবে, একথা ভাবা একটু কঠিন ছিল বৈকি। তাছাড়া কোন হিন্দু লেখক নয়, একেবারে স্বয়ং ড. শহীদুল্লাহ 'মা প্রকৃতির' এমন স্তব গান গাহিবেন একথাই বা কে ভাবিতে পারিয়াছিল।[৪৩]

এই সম্পাদকীয় ছিল সাম্প্রদায়িকতার তীব্র বহিঃপ্রকাশ। *আজাদ* এটাই বলতে চেয়েছে যে, দীর্ঘদিনের বাঙালি ও অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির পরিবর্তে এখানে মুলত পাকিস্তানি সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে যেখানে মুসলমান ছাড়া অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় বসবাস করে না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার বিশেষত হিন্দু সাহিত্যকদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি স্বতন্ত্র ধারার সন্ধানই ছিল এ সময়ের পত্রিকাগুলোর লক্ষ্য। তবে সে ধারার অন্বেষণে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল সুস্পষ্ট।

এ পর্যায়ে সরকারি প্রচেষ্টায় আরবি হরফে বাংলা লেখার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৫০-৫১ সালে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় আরবি হরফে বাংলা শেখানোর জন্য ২০টি শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়। ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকারের শিক্ষা দফতর এক সরকারি আদেশে ঘোষণা করে যে, শিশুরা ১ম ও ২য় শ্রেণিতে আরবি অক্ষর পরিচয় এবং ৩য় শ্রেণিতে আমপারা শিক্ষাগ্রহণ করবে। ৪র্থ থেকে পরবর্তী শ্রেণিগুলোতে বাধ্যতামূলক উর্দু পড়ানো হবে।[৪৪] সরকারি গণশিক্ষা বিভাগ পাক-বাংলা ও পাক-উর্দুর সমন্বয় সাধনের জন্য 'Common Script, Common Ideology, Common Language' তৈরির পরিকল্পনা নেয়। এই কর্মসূচির পক্ষে প্রচারণা চালানোর তাগিদ দিয়ে সংবাদপত্র সম্পাদকদের কাছে সরকারি নির্দেশ জারি করে নোটিশ প্রেরিত হয়।[৪৫] মুসলিম লীগ নেতৃত্ব আরবি হরফে বাংলা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করলে *আজাদ* বিষয়টি সমর্থন করে। পত্রিকাটির নিয়মিত লেখক মুজিবুর রহমান খাঁ বিভিন্ন সভা-সমতি ও লেখনীর মাধ্যমে এ বিষয়ে ভূমিকা রাখেন। তাছাড়া *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনও ভাষা সংস্কারের পক্ষে সক্রিয় হয়ে কাজ করেন।[৪৬] ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য প্রাদেশিক সরকারের উদ্যোগে যে 'ভাষা কমটি' গঠন করা হয় এতে সভাপতি ছিলেন *আজাদ* পত্রিকার মালিক মওলানা আকরম খাঁ। ফলে পত্রিকাটির সংবাদ প্রকাশের ধরন এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। ১৯৪৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি 'পাকিস্তানের শিক্ষা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের আরবি হরফে বাংলা প্রবর্তনের বিষয়টি উত্থাপন করা না হলেও তার শিক্ষা সংস্কার নীতির প্রশংসা করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ভুল তথ্য সংবলিত নিবন্ধ *আজাদ* প্রকাশ করতে থাকে। ১৯৪৯ সালের ১৫ মার্চ অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের 'বাংলা ভাষা ও আরবি বর্ণমালা' শীর্ষক প্রবন্ধ পত্রিকাটি প্রকাশ করে। এখানে লেখক উল্লেখ করেন যে, সপ্তদশ শতকে আলাওল অনেক সংস্কৃত শব্দ আরবি হরফে লিখতেন।[৪৭] তবে প্রকৃত সত্য হলো আলাওল নিজে তার কোনো কাব্য আরবি লিপিতে লেখেননি। বরং পরবর্তী সময়ে অন্যকেউ তার কাব্য আরবি হরফে নকল করেছেন।[৪৮] ১৯৪৯ সালের ১৯ মার্চ *আজাদ* 'বর্ণমালার বিতর্ক' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে খোলাখুলি ভাবে আরবি হরফ প্রবর্তনের সুপারিশ করে বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরে যা ছিল অনেকাংশেই সাম্প্রদায়িক। এর প্রতিক্রিয়ায় ৯ এপ্রিল ফেরদাউস খান 'বাংলা বনাম আরবি হরফ' প্রবন্ধে আরবি হরফে বাংলা প্রবর্তনের বিপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন।[৪৯] এ সময় ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহও আরবি হরফে বাংলা প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন এবং ১৯ এপ্রিল তার 'আরবি হরফে বাংলাভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয়।[৫০] সুতরাং সম্পাদকীয়তে আরবি হরফ প্রবর্তনের বিষয়টি সমর্থন জানালেও এর পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে *আজাদ* একটি মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করার চেষ্টা করে।

ভাষা আন্দোলনের ভেতরেই আরেকটি ঘটনা বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। পাকিস্তানের সাংবিধানিক কাঠামো নির্ধারণের জন্য গঠিত মূলনীতি কমিটি ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর একটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন গণপরিষদের কাছে পেশ করে। নানা সুপারিশের মধ্যে কমিটি ভাষা সম্পর্কে বলে – পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।[৫১] পাশাপাশি এই কমিটির সুপারিশে পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাবের প্রকাশ ঘটে। রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে ঢাকার প্রধান পত্রিকাগুলো প্রতিবাদ জানায়। *আজাদ* পত্রিকাও এর ব্যতিক্রম ছিলো না। ৩০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটি উচ্চ পরিষদে সব প্রদেশ থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকার সমালোচনা করে। ২ অক্টোবর প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে উচ্চ ও নিম্ন এই দুই পরিষদ রাখার সমালোচনা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৪ অক্টোবর পত্রিকাটি ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তান একটি উপনিবেশে পরিণত হবে বলে আশংকা প্রকাশ করে।[৫২] ঢাকার প্রথম সারির দৈনিকগুলোর প্রতিবাদের কারণেই শেষ পর্যন্ত এই রিপোর্ট বাস্তব রূপ লাভ করেনি। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫০ সালের ২১ নভেম্বর প্রস্তাবিত খসড়া প্রতিবেদন সম্পর্কে গণপরিষদে আলোচনা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখে।[৫৩]

১৯৪৮ সালের মার্চের পর মনে হয়েছিল ভাষা আন্দোলন হয়ত শেষ হয়ে গেছে। ছাত্ররা প্রতি বছর ১১ মার্চ পালন করতেন আর তার মধ্যেই ভাষা আন্দোলনের রেশটি টিকে ছিলো। কিন্তু ভাষার দাবি যে পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্ন আন্দোলন নয় ১৯৫২ সালে সেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সময়ের ঘটনাবলি জনমনে যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে সেটির প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রেও। ১৯৪৮ সালের পর ভাষা প্রশ্নটি একটি নতুন মাত্রা পায় ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পল্টনে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনের বক্তৃতা থেকে। তিনি কায়েদে আজমের দোহাই দিয়ে বলেন, “প্রদেশের ভাষা কি হবে তা প্রদেশবাসীই স্থির করবেন, কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকলে কোন রাষ্ট্র শক্তিশালী হতে পারে না।”[৫৪] মূলত এ বক্তব্যের স্ফুলিঙ্গই ভাষা আন্দোলনের দাবানল সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ছিল যা ফেব্রুয়ারিতে তীব্র রূপ নেয়। এ বক্তৃতার ভাষা সংক্রান্ত অংশটুকু *আজাদ* কোন পৃথক শিরোনাম ছাড়াই ‘প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে’ উপ-শিরোনামের অধীনে একবারে শেষের দিকে প্রকাশ করে। প্রথম পৃষ্ঠা থেকে মুদ্রিত ঐ প্রতিবেদনের চার কলামব্যাপী শিরোনাম ছিল ‘ভেদাভেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্রের খেদমতে আত্মনিয়োগ করুন’।[৫৫] সুতরাং এতে করে *আজাদ* পুনরায়

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা ইস্যুতে একটি নেতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি থেকে খাজা নাজিম উদ্দিনের সরে আসার বিষয়টি ২৮ জানুয়ারির সংখ্যায় কোনো গুরুত্বই পায়নি।

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম থেকেই *আজাদ* ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে। ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা শহরের সব স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা এবং আরবি হরফে বাংলাভাষা প্রচলনের চেষ্টার বিরুদ্ধে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। ৫ ফেব্রুয়ারি *আজাদ* এই ধর্মঘট পালনের বিবরণ সচিত্র প্রতিবেদনসহ প্রকাশ করে।[৫৬] এর বাইরে ফেব্রুয়ারি মাস জুড়েই *আজাদ* ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জেলা শহরের ভাষা আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। যেমন ৭ ফেব্রুয়ারি পত্রিকাটি ৪ তারিখ ও এর পরের কয়েকদিন চট্টগ্রামের লালদীঘির ময়দান ও অন্যান্য স্থানে ভাষার দাবিতে সংঘটিত বিক্ষোভ সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[৫৭]

২১ ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণের ঘটনায় জনমনে যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় তার প্রতিফলন ঘটিয়ে *আজাদ* বাংলা ভাষার পক্ষে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা নিয়ে পত্রিকাটি পরপর কয়েকদিন খবর ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ২২ ফেব্রুয়ারির সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় স্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত প্রতিবেদনের চারটি শিরোনাম ছিল – ‘ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ’, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন ছাত্র সহ চার ব্যক্তি নিহত ও ১৭ ব্যক্তি আহত’, ‘হাসপাতালে প্রেরিত আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক’, ‘স্কুলের ছাত্রসহ ৬২ জন গ্রেফতার: গুলিবর্ষণ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তদন্তের আশ্বাসদান’। সংবাদ প্রকাশের ধরন দেখে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে পত্রিকার অবস্থানটি ফুটে ওঠে। ঐ দিন *আজাদ* ‘তদন্ত চাই’ শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে ১৪৪ ধারা জারি ও গুলিবর্ষণের প্রতিবাদ করে বলা হয়:

> …১৪৪ ধারা জারী করিবার কোন কারণ ঘটিয়াছিল কিনা, এই প্রশ্নই সকলের আগে মনে হয়। কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রধানমন্ত্রী খওয়াজা নাজিমুদ্দীন যখন এখানে আসিয়াছিলেন তখন ঢাকার স্কুল কলেজের ছাত্ররা ধর্ম্মঘট পালন এবং বিরাট শোভাযাত্রা করিয়াছিল। তখন শহরে শান্তি ভঙ্গ হয় নাই। গতকল্য ছাত্রধর্ম্মঘট ও শোভাযাত্রা হইলে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কতটা নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাইয়াছিলেন, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা দেশবাসীকে তাহা জানাইতে বাধ্য বলিয়া আমরা মনে করি। … গুটিকতক বালক ও যুবক যদি নিয়ম বিরোধী কার্জ্য করিয়াই থাকে, এমনকি যদি তাহারা কর্তৃপক্ষকে উত্তেজনার কারণও দিয়া থাকে, তাহা হইলেও গুলী চালাইবার মত সংকটাপন্ন অবস্থা হইয়াছিল কিনা তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য।[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

এরপর তদন্তের দাবি জানিয়ে কি কি বিষয়য়ের তদন্ত করতে হবে তার একটি তালিকা দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি *আজাদ* ২২ ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় ২১ ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে সরকারি প্রেসনোট প্রকাশ করে। ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব বাংলার অনেক স্থানে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে এবং আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের প্রতিবাদে ধর্মঘট পালিত হয়। ২২ ফেব্রুয়ারির *আজাদ* নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে ধর্মঘট পালনের সংবাদ প্রকাশ করে।[৫৯] ঐ দিন সন্ধ্যায় *আজাদ* একটি বিশেষ সংখ্যা বের করে, যেটি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন পূর্ব বাংলার বিধান পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। তবে ঘটনাটির প্রকৃত তারিখ নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি আছে। বিভ্রান্তি সৃষ্টির কারণ ঐ বিশেষ সংখ্যার কোন কপি না থাকায় এ বিষয়ে অন্যান্য উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয়। ঐ বিশেষ সংখ্যার শিরোনাম ছিল 'ছাত্রদের তাজা খুনে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত'। তবে ঐ সংখ্যায় পুলিশের গুলিবর্ষণের জায়গায় ছাপা হয়েছিল সৈন্যবাহিনীর গুলিবর্ষণ।[৬০] আবুল কালাম শামসুদ্দিন তার আত্মজীবনীতে[৬১] লিখেছেন যে, পুলিশের গুলিতে ছাত্র অছাত্র নিহত হবার খবর যখন আসে তখন তিনি *আজাদ* অফিসে কাজ করছিলেন। খবরটি শুনে তিনি এতটা বিচলিত হয়ে পড়েন যে সাথে সাথে গভর্নরের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। গুলিবর্ষণ ও তার পদত্যাগের খবর নিয়ে *আজাদ*-এর এক বিশেষ সংখ্যা বের হয় যেখানে প্রকাশিত সম্পাদকীয় যুবকদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। অপরদিকে সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র* গ্রন্থেও একই মন্তব্য করেছেন।[৬২] কিন্তু বিশেষ সংখ্যা ও পদত্যাগের বিষয়টি ২২ ফেব্রুয়ারি ঘটে কারণ ঐ দিন বিকেলে প্রাদেশিক পরিষদের বিতর্কে শামসুদ্দিন আহমদ ঐ বিশেষ সংখ্যা থেকে পাঠ করে মন্তব্য করেন:

> I am told just now that curfew has been imposed in the city while here the motion is being moved by the Prime Minister. Is the Prime Minister justified in ruling the city under section 144 and issuing curfew orders? What is happening? Has he seen the special issue of the 'Azad'? Mr. Abul Kalam Shamsuddin, a member of this House who was also a member of the Government party has resigned.[৬৩]

শামসুদ্দীন আহমদ ঐ বিশেষ সংখ্যা থেকে পড়ে শোনান:

> মাসুম ও তরুণের রক্তে গলিদ করার জন্য দায়ী যাহারা সেই নুরুল আমিন মন্ত্রিসভার আশু পদত্যাগ আমরা দাবী করিতেছি। ... অদ্য শুক্রবারেও শহরের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও মিলিটারী গুলিবর্ষণ, রাজধানীর মাটীতে আর একবার শিশু ও কিশোরের শোণিতপাত ... পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদে আবুল কালাম শামসুদ্দিনের পরিষদ সদস্যপদে এস্তেফা দান।[৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ সংখ্যা ২১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে বের হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল বৃহস্পতিবার। কিন্তু বিশেষ সংখ্যায় 'অদ্য শুক্রবার' কথাটি ছিল। আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের পদত্যাগের খবর প্রকাশিত হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়। এতে বলা হয়:

> আজাদ পত্রিকার সম্পাদক অদ্য পুর্ব্ব পাক পরিষদের সদস্যপদে এস্তেফা দিয়াছেন। গভর্নর ও পরিষদের স্পীকারের নিকট প্রেরিত এক আবেদনে তিনি বলিয়াছেন: বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করায় ছাত্রদের ওপর পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে তাহার প্রতিবাদে আমি পরিষদে আমার সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতেছি।[৬৫]

প্রাদেশিক পরিষদের বক্তব্য এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার সূত্র ধরে বলা যায় যে, আবুল কালাম শামসুদ্দিন ২২ ফেব্রুয়ারি বিকেলে পদত্যাগ করেন, যেটি ঐ দিনের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ২৩ ফেব্রুয়ারি নিয়মিত সংখ্যায় প্রতিবেদনটি পুনরায় প্রকাশিত হয় কিন্তু 'অদ্য' কথাটি সংশোধন করা হয়নি। তাছাড়া ২১ ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করেলে সেটি অবশ্যই ২২ ফেব্রুয়ারির মূল সংখ্যায় প্রকাশিত হত, যেটি হয়নি।[৬৬] পদত্যাগপত্রটি তাঁর পক্ষে ইংরেজিতে লিখে দিয়েছিলেন *আজাদ* পত্রিকায় তার সহকর্মী মুজিবুর রাহমান খাঁ। নুরুল আমিন সরকারের একজন সমর্থক হয়েও *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের বিধান পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করার বিষয়টি ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজে উদ্দীপনা তৈরি করে এবং পথ প্রদর্শকের কাজ করে। তবে আবুল কালাম শামসুদ্দিন উল্লেখ করেছেন পদত্যাগ করলেও প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুসলিম লীগকে ত্যাগ করেননি, কারণ যে প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে সেটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সম্ভব নয়।[৬৭] ছাত্রদের অনুরোধে সদ্য পদত্যাগকারী পরিষদ সদস্য এবং *আজাদ* পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন গুলিবর্ষণের জায়গায় নির্মিত প্রথম শহীদ মিনার ২৫ ফেব্রুয়ারি অনানুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয়বার উদ্বোধন করেন। পুলিশ ও সামরিক বাহিনী ২৬ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারটি ধ্বংস করে দেয়।[৬৮] তবে বিষয়টি নিয়ে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে। গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ওয়াক-আউট করায় মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের সদস্য আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশকে গ্রেফতার করা হলেও আবুল কালাম শামসুদ্দীন সরকারি নির্যাতন থেকে রেহাই পেয়েছিলেন।

২২ ফেব্রুয়ারির ঢাকার ঘটনাবলি নিয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি *আজাদ* প্রায় পৃষ্ঠাজোড়া প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে শিরোনামগুলো ছিল- 'বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সোপারেশ', 'শুক্রবার শহরের অবস্থার আরও অবনতি ... সামরিক বাহিনী তলব', 'পুলিশ ও সেনাদের গুলিতে ৪ জন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত সাত ঘণ্টার জন্য কারফিউ জারি', 'শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ শহরে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন'। তবে *আজাদ* প্রকাশিত এই তথ্যের সাথে অন্যান্য কিছু উৎস্য থেকে

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া তথ্যের অমিল রয়েছে। অলি আহাদের বর্ণনা অনুযায়ী ২৩ ফেব্রুয়ারির *আজাদ* নিহতের যে সংখ্যা প্রকাশ করেছে সেই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। তার বর্ণনা অনুযায়ী হাইকোর্টের সামনে মিছিলের ওপর গুলি চালানো হয়নি, সেই মিছিল তিনিই পরিচালনা করছিলেন।[৬৯] ২৩ ফেব্রুয়ারি *আজাদ* 'পদত্যাগ করুন' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে যেখানে নুরুল আমিন মন্ত্রিসভার সমালোচনা করে বলা হয়:

> গত দুই দিন ধরিয়া শহরের বুকে যেসব কাণ্ড ঘটিতেছে, সে সমস্ত শুধু শোকাবহ নয়, বর্ব্বোরোচিতও বলা চলে। জনাব নুরুল আমিন পুলিশ সমন্ধে তদন্তের কথা বলিয়াছিলেন এবং ১৪৪ ধারা জারির যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও ইতস্ততার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে তদন্তের কোন ব্যবস্থা হইল না এবং ১৪৪ ধারাও বলবৎ রহিয়াছে। ফলে গুলীতে মানুষ হতাহত হইতেছে এবং মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হইতেছে। ... আমরা এই মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করিতেছি।[৭০]

বার্তা সম্পাদক মুজিবুর রহমান খাঁ এই সম্পাদকীয়টি লিখেছিলেন। এছাড়া ঐ দিন *আজাদ* সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে এপিপি পরিবেশিত পূর্ব বাংলা সরকারের প্রেসনোট প্রকাশ করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি *আজাদ* মওলানা ভাসানীর একটি বিবৃতি প্রকাশ করে যেখানে তিনি ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং প্রকাশ্য বিচার দাবি করেন। একইদিন আবুল হাশিমের একটি বিবৃতিও *আজাদ* প্রকাশ করে যেখানে ভাষা আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করায় পূর্ব বাংলা সরকার ও *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার সমালোচনা এবং আন্দোলনের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখায় *মিল্লাত, আজাদ, ইনসাফ* পত্রিকার প্রশংসা করা হয়।[৭১] আবুল হাশিমের এসব মন্তব্য প্রকাশ করে *আজাদ* বাঙালি জাতীয়তাবাদের অসাম্প্রদায়িক দিকটিই তুলে ধরেছিল। একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে সংবাদ প্রকাশের ধারাবাহিকতায় ২৪ ফেব্রুয়ারি নুরুল আমীন সরকারের সমালোচনা করে *আজাদ* প্রকাশ করে 'ভুলের মাশুল' শীর্ষক সম্পাদকীয়। ২২ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন সেটি আরও আগে করা সম্ভব হলে ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা এড়ানো সম্ভব হত বলে উল্লেখ করা হয়।[৭২] এরপর কয়েকদিন ঢাকা শহরের পরিস্থিতি এবং আন্দোলন, ধর্মঘট পালনের সংবাদ নিয়ে *আজাদ* প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এসময় একটি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অন্য পত্রিকায় হুবহু ছাপিয়ে দেওয়ার মত কিছু ঘটনা পাওয়া যায় যা সংবাদপত্রের মৌলিকতা ও নিজস্বতাকে ব্যাহত করে। যেমন – ২৪ ফেব্রুয়ারি *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় প্রকাশিত শহীদদের গায়েবানা জানাজা সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদ *আজাদ*-এ প্রকাশিত সংবাদের হুবহু নকল এবং এক্ষেত্রে *আজাদ* যেসব বানান ভুল করেছিল সেসবও ঠিক করা হয়নি।[৭৩]

Dhaka University Institutional Repository

একটি পর্যায়ে সরকারের দমনপীড়ন ও পুলিশি ধরপাকড়ের ফলে ২১ ফেব্রুয়ারির পরবর্তী আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে এবং *আজাদ*-এর নীতিতেও পরিবর্তন আসে। ভাষা আন্দোলনের পক্ষে ভূমিকা পালনের পর এ পর্যায়ে আগের মতই পত্রিকাটির বৈপরীত্যেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। *আজাদ* এ সময় অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক চরিত্রের প্রকাশ ঘটায়। ভাষা আন্দোলন ভারতীয় ও হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত এই বক্তব্য নুরুল আমীন সরকারের অনেক সদস্যের কাছে শোনা যায় এবং *আজাদ* অনেকটা একই বক্তব্য তুলে ধরে। ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে ভাষা আন্দোলনকারীদের রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে পত্রিকাটি আন্দোলন স্থগিতের আহ্বান করে। *আজাদ* মন্তব্য করে:

> ... আমরা এক্ষণে স্থির নিশ্চিত যে, ভাষা আন্দোলনকারীদের মধ্যে বহু ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী রহিয়াছে। অনেক বাঙালি হিন্দু সীমান্তের পার হইতে পাজামা পরিধান করিয়া আগমন করিয়াছে। ইহারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করিতে চায়। লাখো মুসলমান শহীদ হওয়ায় যে পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে, উহার বৃহত্তর স্বার্থে ও এসলামের খাতিরে ভাষা আন্দোলন স্থগিত করা উচিত। ... এখনও যাহারা ভাষা আন্দোলন অব্যাহত রাখিতে চায়, তাহারা রাষ্ট্রের শত্রুদের নির্দেশেই কাজ করিতেছে।[৭৪]

১ মার্চ ‘আজিকার প্রশ্ন’ শীর্ষক সম্পাদকীয়তে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ছাত্র সমাজকে ‘অন্ধ আবেগাপ্লুত’ ও ‘অন্ধভাবে ছুটিয়া চলা সুবিধাবাদী’ বলে উল্লেখ করা হয়। ছাত্র ও যুবকদের উদ্দেশ্য করে বলা হয় যে, তারা অন্ধ ভাবে ছুটে চলে বলেই পাকিস্তান বিরোধীরা তাদের এই উদ্যম ও উৎসাহকে নিজেদের কাজে লাগায়। ১৯৫২ সালের ২ মার্চ তারিখের সংখ্যায় নারায়ণগঞ্জ শহরের ভাষা সৈনিক মমতাজ বেগমের জীবন পরিচয়কে রহস্যময় বলে বর্ণনা করা হয় এবং তাকে ‘রাষ্ট্রের শত্রু’ বলে মন্তব্য করা হয়। প্রতিবেদনে তার পূর্ব পরিচয় উল্লেখ করে বলা হয় যে, তিনি ছিলেন একজন হিন্দু। অথচ তিনি ঐ শহরে ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিত করে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন।[৭৫] *আজাদ* একজন ভাষা সংগ্রামীর ধর্ম নিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সেটি ছিল সাম্প্রদায়িকতার চরম বহিঃপ্রকাশ।

১৯৫২ সালের মার্চেই পশ্চিম পাকিস্তানের ডাঃ আবদুল হকের একটি উক্তির প্রতিবাদ করতে গিয়ে *আজাদ* পুনরায় বাংলাভাষার পক্ষে ভূমিকা রাখে। ২১ মার্চ উর্দুর পক্ষে এবং বাংলার বিপক্ষে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আবদুল হক বলেন যে, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা যায় না কারণ এটা পাকিস্তানের সংস্কৃতির বহির্ভূত সংস্কৃত ভাবধারার বাহন।[৭৬] এর প্রতিবাদ জানিয়ে *আজাদ* ২৪ মার্চ ‘ডা. আবদুল হকের উক্তি’ শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে যেখানে উর্দু এবং বাংলা কোনো ভাষারই পাকিস্তানের একক রাষ্ট্রভাষা হওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

যোগ্যতা নেই বলে মন্তব্য করা হয়। এছাড়া আবদুল হকের মন্তব্যের প্রতিবাদ করে তাকে শত বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সাথে পরিচিত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।[৭৭]

পাকিস্তান গণপরিষদে ১৯৫২ সালের ১০ এপ্রিল মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য আব্দুস সাত্তার পীরজাদা (পশ্চিম পাকিস্তান) 'রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়ায় এবং এর আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা না দেওয়ায় যথা সময়ে বিষয়টি গণপরিষদে উত্থাপিত হওয়ার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ' করতে সংশোধন প্রস্তাব আনেন। তার এই সংশোধন প্রস্তাব ৪১-১২ ভোটে গৃহীত হয়।[৭৮] বিষয়টিকে সমর্থন করে *আজাদ* ১৫ এপ্রিল "রাষ্ট্রভাষা ও পাকিস্তান" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি অর্জন করতে বাংলা ভাষার কথা পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছে প্রচার করা এবং যুক্তি ও সম্প্রতি তৈরি হওয়া শুভবুদ্ধি ও ঐক্যের আবেদন নিয়েই সমস্যা সমাধানের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়।[৭৯] ভাষা প্রশ্নে পত্রিকাটির এ ভূমিকা ছিল ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বিকাশের পথে সহায়ক।

১৯৫২ সালের পর থেকে কুমিল্লা (১৯৫২), চট্টগ্রাম (১৯৫৩) এবং ঢাকা (১৯৫৪) তে সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সালের ২৩-২৭ এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল ও বর্ধমান হাউজ (বাংলা একাডেমি)-এ অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন। পাকিস্তানি সংস্কৃতি ও তথাকথিত ইসলামি মূল্যবোধের প্রচারক *আজাদ* সম্মেলনের ওপর নিয়মিত রিপোর্ট প্রকাশ করলেও সম্মেলনকে স্বাগত জানায়নি। *আজাদ*-এর সাথে যুক্ত হয় 'তমদ্দুন মজলিশ' এবং 'পাকিস্তান মজলিশ' নামে দুটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের ২৪ এপ্রিল 'মনন শাখা'র সভাপতি ছিলেন *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। কিন্তু তিনি অনুষ্ঠানে যোগদান করেননি। নিজের আত্মজীবনীতে এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে, সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অনেকেই বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের অবিভাজ্যতা সম্পর্কে দৃঢ় মত পোষণ করতেন বলেই তিনি যোগদান করেননি।[৭৯(ক)] এ সময় পত্রিকায় লেখক ও শিল্পীদের বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি প্রকাশিত হয়। *আজাদ*-এ প্রকাশিত বিবৃতিদাতাদের অন্যতম ছিলেন আব্বাস উদ্দিন, লায়লা আর্জুমান্দ বানু প্রমুখ। ১৯৫৪ সালের ২৪ এপ্রিল প্রকাশিত ঐ বিবৃতিতে কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর প্রাধান্য রহিত করতে সম্মেলনকে 'সর্বদলীয়' আখ্যায়িত করার সমালোচনা করে হয়। পাশাপাশি দেখা যায় যে, *আজাদ*-এর চিঠিপত্র কলামেও সম্মেলনের সমালোচনামূলক পত্র প্রকাশিত হয়েছে। মূলত যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরোধিতা থেকেই পত্রিকাটির নীতি নির্ধারিত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে ভাষা আন্দোলনে সংবাদ, প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে গণ মানুষকে আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করে *আজাদ* যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তেমনি ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী তরুণ সমাজকে উদ্ভ্রান্ত এবং অবাধ্য হিসেবে বর্ণনা করে পত্রিকাটির স্ববিরোধী ভূমিকাও ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে।

১.২ *পাকিস্তান অবজারভার*

পকিস্তান অবজারভার পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরী ছিলেন মুসলিম লীগ সরকার বিরোধী। ফলে পত্রিকার নীতিতেও এর প্রভাব পড়ে এবং এটি ভাষা আন্দোলনে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলনের পক্ষে সরকারের কঠোর সমালোচনা করে পত্রিকাটি খবর ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করতে থাকে। যেমন -১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৯৫১ সালের ১১ মার্চ ঢাকা শহরের শিক্ষালয়গুলোতে ছাত্ররা পূর্ণ হরতাল পালন করে। *পাকিস্তান অবজারভার* পরদিন ১২ মার্চ সংবাদটি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। পত্রিকাটির প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।[৮০]

১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পল্টনে খাজা নাজিম উদ্দিনের বক্তব্য ভাষা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিল। ২৮ জানুয়ারি *পাকিস্তান অবজারভার* তাদের প্রতিবেদন শুরু করে নাজিম উদ্দিনের ভাষা সংক্রান্ত উক্তি দিয়ে। এতে বলা হয় যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং মুসলিম লীগ সভাপতি হিসেবে ভাষণ দিতে গিয়ে খাজা নাজিম উদ্দিন ঘোষণা করেন উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা।[৮১] এ প্রতিবেদনটি ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী জাগরণে অনেকাংশে ভূমিকা রাখে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি পত্রিকাটি পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনকে নিয়ে 'Crypto Fascism' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে খাজা নাজিমউদ্দিনের সমালোচনা করে বলা হয় যে, তিনি ঢাকার নবাব পরিবারের একজন সদস্য এবং বাংলায় কথা বলেন না। তাকে স্বজনপ্রীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওসমানের উদাহরণ দেওয়া হয়। এর পরদিন ১৩ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলা সরকার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও শান্তি এবং রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপ ও রাষ্ট্র বহির্ভূত আনুগত্যের অভিযোগ এনে পত্রিকাটি নিষিদ্ধ করে এবং সম্পাদক আব্দুস সালাম ও প্রকাশক হামিদুল হক চৌধুরীকে গ্রেফতার করে। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল:

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের তৃতীয় খলিফা অত্যন্ত ধার্মিক ও সৎলোক ছিলেন, কিন্তু তিনি নির্লজ্জ আত্মীয় তোষণের অপরাধে অপরাধী ছিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব যাঁহাদের দাবী আদৌ বিবেচনার যোগ্য ছিল না, তিনি তাহাদিগকেই নানারুপে ক্ষমতার অধিকারী করিয়াছিলেন। খওয়াজা নাজিম উদ্দিন ধার্মিক মুসলমান একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু তিনি যেন নিজেকে দ্বিতীয় ওসমান-বেন-আফফান প্রমাণিত না করেন আমরা এই আশা এবং এই প্রার্থনাই করি।[৮২]

জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিন্নতা ও ব্যক্তিগত মতবিরোধ ছিল পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে মুখ্য বিষয়, পত্রিকার মালিক-সম্পাদকরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। *পাকিস্তান অবজারভার*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যের সূত্র ধরে *আজাদ* মালিক এবং পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ এবং মুসলিম লীগ নেতা শাহ আজিজুর রহমান *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার বিরুদ্ধে নিন্দা জানিয়ে *আজাদ*-এ বিবৃতি দেন।[৮৩] মুসলিম লীগ সরকার সমর্থক ও *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বী *মর্নিং নিউজ* ১৪ ফেব্রুয়ারি এই নিষেধাজ্ঞা জারি করায় নুরুল আমীন সরকারকে অভিনন্দন জানায়।[৮৪]

১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা *মর্নিং নিউজ* ও জুবিলি প্রেস পুড়িয়ে দিলে আবদুস সালামকে প্রধান আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়। ভাষা আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ করে মুসলিম লীগ বিরোধী ভূমিকার কারণে শিক্ষিত সমাজে *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার একটি জনপ্রিয়তা ছিল। ফলে পত্রিকাটি বন্ধ করার ঘোষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সভা করে এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সভায় প্রতিবাদ করে বলা হয় ভাষা আন্দোলনকে ব্যাহত করার জন্যই আন্দোলনের সমর্থক একমাত্র পত্রিকাটিকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।[৮৫] ১৭ ফেব্রুয়ারি যুবলীগের কার্যকরী পরিষদের এক সভায় *পাকিস্তান অবজারভার* নিষিদ্ধ করায় নিন্দা প্রস্তাব পাশ করা হয়। সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ সংবাদপত্রে প্রেরিত এক বিবৃতিতে বলেন যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের আগে এই দমননীতির পেছনে সরকারের দুরভিসন্ধি আছে।[৮৬] অন্যান্য পত্রিকা এমনকি স্থানীয় কিছু পত্রিকাও *পাকিস্তান অবজারভার* নিষিদ্ধ করার সমালোচনা করে। সিলেটের *নওবেলাল* এ ধরনের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ছাত্র জনতার আন্দোলনকে যুক্তিযুক্ত বলে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় মন্তব্য করে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের আগে পত্রিকাটি আর প্রকাশিত হয়নি। হামিদুল হক চৌধুরী এবং আব্দুস সালাম যুক্তফ্রন্ট থেকে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হন।

১.৩ *সংবাদ*

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের মালিকানাধীন *সংবাদ* ভাষা আন্দোলনের পক্ষে তেমন ভূমিকা রাখতে পারেনি। যদিও স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেন বা আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর মত প্রগতিশীল সাংবাদিকরা এ পত্রিকার সাথে ছিলেন কিন্তু নুরুল আমীনের মালিকানায় থাকায় এসব প্রগতিশীল সাংবাদিকরা অনেকটাই চাপের ভেতর থাকতেন। ফলে বাংলা ভাষার পক্ষে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেও তারা ব্যর্থ হন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভের পর প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় থেকে। এতে উর্দুর সাথে বাংলার দাবি কিছুটা সমর্থন করে বলা হয়ঃ

> ... পাকিস্তানের অধিকাংশ নাগরিকের ভাষা বাঙলা। এই ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা না দিলে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতি ব্যাহত হইবে। বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দিলে পাকিস্তানের অধিকাংশ নাগরিকের সাধারণ ভাষাকে ধ্বংস করায় সহায়তা করা হইবে। ... দুইটি রাষ্ট্রভাষা করার অভিমত একেবারে অযৌক্তিক ও হাস্যোস্পদ বলিয়া উড়াইয়া দেয়া যায় না। অনেক রাষ্ট্রেই একাধিক রাষ্ট্রভাষা আছে। কোন প্রকার সিধান্ত গ্রহণের পূর্বে দুইটি রাষ্ট্রভাষা করা সম্পর্কে গণপরিষদকে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।[৮৭]

তবে এই পত্রিকার সাথে যুক্ত সাংবাদিক ও সম্পাদকেরা বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনকারীদের সরকারের দমনমূলক মনোভাব সম্পর্কে জানিয়ে সতর্ক করতেন। *সংবাদ*-এর যুগ্ম সম্পাদক জহুর হসেন চৌধুরীর সরকারি উচ্চ মহলে যোগাযোগ ছিল। ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচির প্রতি সরকারের মনোভাব যে কঠোর সেটি তিনি জানতেন। তৎকালীন যুবলীগ নেতা অলি আহাদকে তার সেই আশংকার কথা জানান। জহুর হোসেন চৌধুরীর আশংকা ছিল ২১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলন দমনের নামে সরকারের নির্মম আঘাত হয়ত গণতান্ত্রিক শক্তিকেই নির্মূল করে ফেলবে এবং অদূর ভবিষ্যতে আর কোনো সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠতে পারবে না।[৮৮]

এর বাইরে কর্তৃপক্ষ বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাব সম্পন্ন হওয়ায় *সংবাদ* ভাষা আন্দোলন বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে। ফলে পত্রিকাটি ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশ করত খুবই কম গুরুত্ব দিয়ে। এমনকি ২১ ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণের ঘটনাও খুব কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এই নেতিবাচক ভূমিকার জন্য পত্রিকাটি থেকে পদত্যাগ করেন মুস্তফা নুরউল ইসলাম ও ফজলে লোহানী।[৮৯] *সংবাদ*-এর এই ভূমিকার কারণে ১৯৫২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*, *সংবাদ* পত্রিকা বর্জনের জন্য আহ্বান জানায়। এর আগে ২২ ফেব্রুয়ারি *মর্নিং নিউজ* এর সাথে সাথে ২৬৩ নং বংশাল রোডের *সংবাদ* অফিসও পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে উত্তেজিত জনতা। এ বিষয়ে অলি আহাদ ২২ ফেব্রুয়ারির গায়েবানা জানাজার পর অনুষ্ঠিত মিছিলের বর্ণনা দিয়ে বলেন যে, পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসে আক্রান্ত মিছিলের অপর অংশ নওয়াবপুর রোড দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

সদরঘাট অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে এবং পথে বংশাল রোডে অবস্থিত মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনের বাংলা দৈনিক *সংবাদ* অফিস আক্রমণ করে।[৯০] ২৪ ফেব্রুয়ারি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় *সংবাদ* পুনরায় প্রকাশিত হয়। ঐ দিনের সংখ্যায় ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার জন্য সরকারকে সরাসরি দায়ী না করে সরকারি কর্মকর্তাদের দায়ী করে সম্পাদকীয় কলামে মন্তব্য করা হয়:

> বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সুকঠিন পক্ষপুটের নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া দেশের মানুষকে পোকামাকড়ের ন্যায় নিরুদ্বেগে পিসিয়া মারিবার দিন যে গত ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট তারিখেই গত হইয়াছে, এই সত্যটি ভুলিয়া গিয়া যদি কোনো অফিসার ছাত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণের আদেশ দিয়া থাকেন, তবে তাহাকে এমন শাস্তি দিতে হইবে যেন ভবিষ্যতে কোনদিন কোনো অফিসার এই ভুলের পুনরাবৃত্তি না করেন।[৯১]

১.৪ *মর্নিং নিউজ*

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির শুরু থাকেই *মর্নিং নিউজ* বাংলা ভাষা বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে। অবাঙালি স্বার্থের প্রতিনিধি এই পত্রিকাটি ভাষা আন্দোলন নিয়ে বিভিন্ন নেতিবাচক সংবাদ ও সম্পাদকীয় পরিবেশন করে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়। ফলে শুরু থেকেই পত্রিকাটির বিরুদ্ধে বাঙালি জনগণের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর *মর্নিং নিউজ*-এ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হয় যা ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবিত করে। একটি প্রতিবেদনে প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হাবিবুলাহ বাহারের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয় যে, পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহিত হয়েছে। অন্যদিকে এপিআই পরিবেশিত অন্য প্রতিবেদনে বলা হয় শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের সর্বজনীন ভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে তবে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।[৯২] পরদিন ৭ ডিসেম্বর হাবিবুল্লাহ বাহার তাকে উদ্ধৃত করে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, করাচিতে পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহারের উর্দু ভাষার দাবিকে সমর্থন করার প্রতিবাদে ৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে এটা ছিল প্রথম সভা যেখানে সকল সংশয় দূর করে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা সম্পর্কে স্পষ্ট, বাস্তবসম্মত ও গণতান্ত্রিক দাবি গৃহীত হয়। সভায় গৃহীত ৪ নং প্রস্তাবে *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার বাঙালি বিরোধী প্রচারণার তীব্র নিন্দা করে জনগণের ইচ্ছার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য পত্রিকাটিকে সাবধান

Dhaka University Institutional Repository

করে দেওয়া হয়।[৯৩] ৭ ডিসেম্বর *মর্নিং নিউজ* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় যে, যারা উর্দু ভাষা না শিখবে তারা নিজেদের দেশেই পরবাসী হয়ে থাকবে।[৯৪] মওলানা আকরম খাঁ ৭ ডিসেম্বর সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের একটি সভায় বাংলার পক্ষে কঠোর বক্তব্য দেন। তিনি *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামের সমালোচনা করে বলেন এ ধরনের জবরদস্তি বাংলার মুসলমান সহ্য করবে না।[৯৫]

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে উর্দু ও বাংলা ভাষার সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষজনিত কারণে সরকার *আনন্দবাজার*, *ইত্তেহাদ* ও *স্বাধীনতা* পত্রিকাত্রয়ের পূর্ব বাংলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করে প্রেসনোট প্রকাশ করে। এতে বলা হয়:

> এসব পত্রিকা তাদের সম্পাদকীয় মন্তেব্য এই প্রদেশের অবাঙ্গালি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করিয়াছে। এমনকি বাঙালি মুসলমান অফিসাররা এই প্রদেশে উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র করিতেছেন বলিয়াও অভিযোগ করা হইয়াছে। ... প্রদেশের মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করিবার উদ্দেশে এবং শান্তি ভঙ্গের উসকানি প্রদানের উদ্দেশে পরিচালিত উক্তরূপ প্রচার কার্য সরকার কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারে না।[৯৬]

এই প্রেসনোটে একদিকে যেমন তৎকালীন সরকারের অবাঙালি প্রীতির বিষয়টি উঠে আসে তেমনি এই উর্দু প্রীতির বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য এসব সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় যখন দেখা যায় যে *মর্নিং নিউজ* একই দোষে দুষ্ট হবার পরও পত্রিকাটির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এ সময় *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতি ছিল বাংলাভাষার বিরোধী। ১৯৪৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর পত্রিকাটির সম্পাদকীয় কলামে উর্দুকে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের একমাত্র গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হিসেবে দাবি করে উর্দুর পক্ষে একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যেখানে বাংলাকে হেয় করার বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। এতে দাবি করা হয় যে, বাঙালি মুসলমানদের তথাকথিত দ্বৈত সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উর্দু ভাষা নির্ভর একটি তৃতীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতাকে পুঁজি করে বলা হয় যে, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে গ্রহণ করার মধ্যেই বাঙালি মুসলমানদের কর্তব্য পালন করা সম্ভব।[৯৭] কিন্তু সরকার পত্রিকাটির সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পাশাপাশি বাঙালি নেতৃত্বের সমালোচনা করে বলা হয় যে, পাকিস্তানের কথ্য ভাষাভাষী প্রতিটি গ্রুপ যদি নিজেদের ভাষার ওপর জোর দেয় তাহলে পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সহযোগিতা ও ভাবের আদান প্রদানের অবসান ঘটবে।[৯৮]

১৯৪৮ সালের মার্চে ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে *মর্নিং নিউজ* বাঙালি স্বার্থ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং সরকারি পক্ষ অবলম্বন করে। ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

পর ঢাকার প্রায় সবগুলো পত্রিকা এর প্রতিবাদ জানালেও *মর্নিং নিউজ* তা থেকে বিরত থাকে এবং সরকারকে সমর্থন করে। সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক বক্তব্য পত্রিকাটি এরপরও অব্যাহত রাখে এমনকি ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে অনেক বিকৃত বিবরণ ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। পত্রিকাটিতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ভারতীয় চর এবং হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত বলে দাবি করা হয়। ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় বলা হয় ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশ গুলি চালানোর পর কয়েকজন হিন্দু ও মুসলিম এমএলএ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় হোস্টেল প্রাঙ্গণে বসানো মাইক থেকে উসকানিমূলক বক্তৃতা করেন। *মর্নিং নিউজ* দাবি করে, দেশ ভাগের পর কংগ্রেস সদস্যরা এই প্রথম গণবিক্ষোভে অংশ নেন।[৯৯] এ প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ছিল সকলের মনোযোগ অন্যদিকে ফিরিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দেওয়া। ঐ দিন পূর্ব বাংলা বিধান পরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মনোরঞ্জন ধর *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টার প্রতিবাদ করেন। পরিষদের আরেকজন সদস্য শামসুদ্দিন আহমেদও জানতে চান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী *মর্নিং নিউজ* এর বিপক্ষে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তবে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার বিষয়টি কৌশলে এড়িয়ে যায়। স্পিকার আবদুল করিম সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, "I am sure that the honourable members know that "Morning News" is a banned paper so far as the Assembly is concerned and as such we have no further action to take against this paper."[১০০]

ফলে ভাষা আন্দোলন এবং বাঙালি অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিরোধী পত্রিকা হিসেবে *মর্নিং নিউজ* জনরোষের শিকারে পরিণত হয়। ভাষা আন্দোলন বিরোধী ভূমিকার জন্য পত্রিকাটিকে ২১ ফেব্রুয়ারি ভোরেই জনরোষে পড়তে হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোড ও আশেপাশের এলাকায় সফল ভাবে হরতাল পালিত হয়। এ সময় সেখানে কয়েকজন মেডিকেল কলেজ ছাত্র *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার 'ভয়েজ অব নেসন' ধরনের গাড়িটিকে ধাওয়া করে। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার গাড়ি পুনরায় জনতার ক্ষোভের মুখে পড়ে। ২১ ফেব্রুয়ারির বিকৃত বিবরণ জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ফলে *আজাদ* অফিসের সামনে বিক্ষুব্ধ জনগণ *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার গাড়ি আক্রমণ করে এবং সব কাগজ ছিনিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পত্রিকাটি ছাপা হতো বাংলা বাজারে জনসন রোডের জুবিলী প্রেস থেকে। ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বিক্ষুব্ধ জনতা এ প্রেসে অগ্নিসংযোগ করে। পত্রিকাটির ভাষা আন্দোলন বিরোধী অবস্থানের প্রতি আন্দোলনকারীরা কতটা ক্ষুব্ধ ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় *মর্নিং নিউজ* অফিসে আগুন নেভাতে আসা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি বাধা দেওয়ার মাধ্যমে।[১০১] ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনায় সরকারের অবস্থানটি স্পষ্ট হয় আন্দোলনকারী ছাত্র জনতাকে গুণ্ডা শ্রেণির লোক বলার মধ্য দিয়ে। ২৩ ফেব্রুয়ারি এপিপি পরিবেশিত পূর্ব বাংলা সরকারের প্রেস নোটে বলা

Dhaka University Institutional Repository

হয়, “আজ সকালের দিকেই অবস্থা খারাপ হয়ে ওঠে...গুণ্ডা শ্রেণির লোকেরা এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে...‘মর্নিং নিউজ’ প্রেসটি জনতা পুড়িয়ে দেয়।”[১০২] জুবিলী প্রেস ভস্মীভূত হওয়ার পর ২৩ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় মনু প্রেস থেকে দু’পৃষ্ঠার *মর্নিং নিউজ* প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায় ‘Morning News Can’t Die’ শীর্ষক সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটির ভাষা আন্দোলন বিরোধী ভূমিকার-ই প্রতিফলন ঘটে।[১০৩]

মর্নিং নিউজ পত্রিকার ভাষা আন্দোলন বিরোধী অবস্থানের বিষয়টি অন্যান্য রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের বক্তৃতা বিবৃতিতে উঠে আসে। ১৯৫২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* মন্তব্য করে, “খাজা ইস্পাহানীদের মুখপত্র *মর্নিং নিউজ* বাঙালি অবাঙালি হিন্দু মুসলমান বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াসে মাতিয়াছে। ভাষা আন্দোলনকারী ও জনসাধারণকে মর্নিং নিউজ ও দালালদের প্ররোচনা থেকে সাবধান থাকিতে হইবে।”[১০৪] একই দিন পত্রিকাটি *মর্নিং নিউজ* সম্পর্কে আবুল হাশিমের বিবৃতি প্রকাশ করে। আবুল হাশিম পত্রিকাটির ভাষা আন্দোলন বিরোধী ভূমিকার সমালোচনা করে এর তিরস্কার করেন।[১০৫] এ বিষয়ে অলি আহাদ ২২ ফেব্রুয়ারি গায়েবি জানাজার পর অনুষ্ঠিত মিছিলের বর্ণনা দিয়ে বলেন যে, জগন্নাথ কলেজের দারোয়ানের কাছে থেকে তিনি অবগত হন সদরঘাট এলাকা থেকে আসা মিছিল, মর্নিং নিউজ পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ করে।[১০৬]

১.৫ *ইনসাফ*

কিছু কিছু পত্রিকা ভাষা আন্দোলনকে কেবলমাত্র সমর্থন দিয়েই কর্তব্য শেষ করেনি, সক্রিয়ভাবে ভাষা আন্দলনে অংশগ্রহণ করেছে। *ইনসাফ* পত্রিকার ক্ষেত্রে এই ভূমিকা লক্ষণীয়। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ফজলুল হক হলে যে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় সেখানে পরবর্তী সময়ে *ইনসাফ* থেকেও প্রতিনিধি নেয়া হয়।[১০৭] মুসলিম লীগ সরকার আরবি হরফে বাংলা প্রবর্তনের সুপারিশ করলে *ইনসাফ* বিষয়টির তীব্র সমালোচনা করে সম্পাদকীয় কলামে মন্তব্য করে,

> পূর্ববঙ্গের ছেলে মেয়েরা বাঙলা বর্ণমালায় মাতৃভাষা শিখিলে এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা শুরু করিলে গোমরাহ বা ইসলামী ভাবধারা বিহীন হইয়া পড়িবে এই আশংকা কেন? সেই আশংকা যদি কাহারও মনে না থাকে তবে বর্ণমালা পরিবর্তনের জন্য কতৃপক্ষ মহলের এই অস্বাভাবিক আগ্রহ কেন?[১০৮]

২১ ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণের ঘটনার পর *ইনসাফ* ভাষা আন্দোলনের পক্ষে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। ২২ ফেব্রুয়ারি *ইনসাফ* ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ‘বিচার চাই’ শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এখানে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ওপর নির্ভর করে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার নামে জনগনের কণ্ঠরোধ ও ছাত্র শহীদ হওয়ায় নুরুল আমীন সরকারের কঠোর সমালোচনা করে জনগণের আদালতে এর বিচার দাবি করা হয়। পত্রিকাটির

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র সমাজকে উত্তেজিত হওয়ার পরিবর্তে ঐক্যবদ্ধ জনমত গঠনের আহ্বান জানানো ছিল গুরুত্বপূর্ণ।[১০৯] সম্পাদকীয় প্রকাশের পাশাপাশি ঐ দিন পত্রিকাটি আগের দিনের ঘটনা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে আন্দোলনকারী ছাত্রদের ওপর পূর্ব বাংলা সরকারের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর গুলিবর্ষণের কথা বলা হয়। তবে একটি ক্ষেত্রে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল ভাষা আন্দোলনের পক্ষ সমর্থনকারী অন্যান্য পত্রিকার তুলনায় ব্যতিক্রমী। ২২ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় আরবি হরফে পবিত্র কোরানের সূরা 'বকর' এর ১৫৩ নং আয়াতটি এবং তার বঙ্গানুবাদ উদ্বৃত্ত করে একটি শোকবাণী লেখা হয়। আয়াতটির বাংলা অনুবাদ হলো, "এবং যাহারা আল্লাহর পথে (নিঃস্বার্থ ভাবে ন্যায় ও সত্যের জন্য) নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে মৃত বলিও না, বরং তাহারা জীবিত কিন্তু তোমরা অবগত নও।"[১১০] ধর্মের কথা বলে ঐক্য বজায় রাখার নামে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মানুষ হত্যার প্রতিবাদে এটি ছিল একটি বড় প্রতিবাদ। *ইনসাফ* ২১ ফেব্রুয়ারি নিয়ে সংবাদ প্রকাশ অব্যাহত রাখে এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি সরকারের লাশ সরিয়ে ফেলা সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে, 'লাশ কোথায়?'[১১১] শিরোনামে। এই ধারা অব্যাহত রেখে পত্রিকাটি ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সফল ভাবে হরতাল পালন ও রেল ধর্মঘট সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করে। পরের কয়েকদিন পত্রিকাটি ঢাকাসহ অন্যান্য স্থানে সংঘটিত প্রতিবাদ সমাবেশ, ধর্মঘট পালন ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করে। ২৬ ফেব্রুয়ারি *ইনসাফ* রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মকৌশল সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ২৫ ফেব্রুয়ারি পরিষদ তাদের ৯ দফা দাবি মেনে নেয়ার জন্য পূর্ব বাংলা সরকারকে ৯৬ ঘন্টা সময় বেঁধে দেয়। কিন্তু *ইনসাফ* ২৬ ফেব্রুয়ারি '৯৬ ঘন্টা ধর্মঘট' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে এই কৌশলের সমালোচনা করে মন্তব্য করে যে, যেহেতু নুরুল আমীন গণপরিষদে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করতে রাজি হয়েছেন তাই ৯৬ ঘন্টা চরমপত্রের কাছে সরকার হয়ত নতি স্বীকার করবে না। সম্পাদকীয়তে সংগ্রাম পরিষদকে আরও গণতান্ত্রিক এবং ধীরস্থির ভাবে অগ্রসর হওয়ার কথা বলা হয়।[১১২] ভাষা আন্দোলনের এ পর্যায়ে পত্রিকাটির মূল্যায়ন ছিলো অনেকটা গঠনমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ। ঐ সময় পূর্ব বাংলা সরকার, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক মহল থেকে নামে বেনামে বিভিন্ন প্রচারপত্র ছড়িয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছিল। এ. কে. ফজলুল হককে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হাওয়ার আহ্বান জানিয়ে এমনই একটি ইশতাহার প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এই ইশতাহারের সাথে তাদের সম্পর্ক থাকার কথা অস্বীকার করে।[১১৩] ২৬ ফেব্রুয়ারি *ইনসাফ* 'হক সাহেবের খোলা চিঠি' শিরোনামে দ্বিতীয় আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে প্রচলিত বিভিন্ন বিভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করা হয়। ফজলুল হক নিজেই সরকারের কাছে প্রেরিত খোলা চিঠিতে ১৪৪ ধারা ও মোতায়েনকৃত পুলিশ মিলিটারি প্রত্যাহার, সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও

Dhaka University Institutional Repository

গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবি জানিয়েছিলেন। *ইনসাফ* এসব দাবির প্রতি সমর্থন জানায়। পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে এসব দাবি মেনে না নেয়ায় হতাশা প্রকাশ করা হয়।[১১৪]

১.৬ অন্যান্য

ভাষা আন্দোলনের সমর্থক অন্যান্য দৈনিক পত্রিকাগুলো ছিল *মিল্লাত* ও *আমার দেশ*। *মিল্লাত* ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করে শহীদদের সংখ্যা নিয়ে। পত্রিকাটির আরেকটি শিরোনাম ছিল, 'রাতের আঁধারে এত লাশ যায় কোথায়?'। ফলে পত্রিকাটির সম্পাদক মোঃ মোদাব্বেরের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। তবে নূরুল আমীনের হস্তক্ষেপে বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটে।[১১৫] মুসলিম লীগ নেতার মালিকানাধীন হওয়ার পরও সম্পাদকের নির্ভীক ভূমিকার কারণেই পত্রিকাটি ভাষা আন্দোলনের পক্ষে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত অপর একটি সম্পাদকীয়তে গুলি চালানোর নির্দেশ প্রদানকারীদের খুঁজে বের করে শাস্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়।[১১৬] একই তারিখে *মিল্লাত* মালিক এবং পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরীর একটি বিবৃতিও পত্রিকাটি প্রকাশ করে যেখানে মূলত সম্পাদকীয় কলামের প্রতিফলন পাওয়া যায়।

২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনাবলির ওপর পূর্ব বাংলা সরকার যে প্রেসনোট প্রকাশ করে সেটি ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। একই সাথে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারির মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় যে, সরকারি প্রেসনোট ছাড়া ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত অন্য কোনো সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না।[১১৭] কিন্তু *সংবাদ* ও *মর্নিং নিউজ* ছাড়া অন্যান্য পত্রিকা ভাষা আন্দোলনের খবর ও সরকারের সমালোচনা করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এভাবে ভাষা আন্দোলনে ঢাকার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকগণ জনমতের পক্ষে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন।

২. ১৯৫৪ সালের নির্বাচন

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ঘোষিত "Provincial Legislative Assembly Order, 1947" অনুসারে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যগণ ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যে পরিণত হন। সুতরাং পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ১৯৫২ সালে। কিন্তু ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলায় টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাজিত হওয়ার পর, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার আর কোনো নির্বাচন মোকাবেলা করতে চায়নি।[১১৮] ফলশ্রুতিতে নূরুল আমীন সরকারের অনুরোধক্রমে পাকিস্তান গণপরিষদ "The

Dhaka University Institutional Repository

East Bengal Legislative Assembly (Continuation) Act, 1953" পাস করার মাধ্যমে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের মেয়াদ আরও এক বছর বৃদ্ধি করেন। অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে মোট ১৬ টি দল অংশগ্রহণ করে। মুসলমান আসনে যেসব দল অংশগ্রহণ করে তাদের চরিত্রগত ভাবে দুটো ভাগ করা যায় – মুসলিম লীগ এবং যুক্তফ্রন্টভুক্ত ও এর সহযোগী দলসমূহ।[১১৯] নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে। ২৩৭ টি মুসলমান আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২১৫ টি এবং মুসলিম লীগ ৯ টি আসন পায়।[১২০] বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। নির্বাচনে সরকারি দলের এমন শোচনীয় পরাজয় ছিল বিরল ঘটনা। মুসলিম লীগ সরকার নির্বাচনে পরাজয় এড়ানোর জন্য নির্বাচন পিছিয়ে দেন কিন্তু কারচুপির চেষ্টা করেননি। বাঙালি জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যালটের মাধ্যমে তাদের অভিমত প্রকাশের সুযোগ পেয়ে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে। পূর্ব বাংলায় এরপর মুসলিম লীগ আর কখনো শক্তিশালী হতে পারেনি।

ভাষার প্রশ্নে গুটিকয়েক পত্রিকা ছাড়া ঢাকার সব দৈনিক পত্রিকাই মুসলিম লীগ সরকারের বিরোধিতা করলেও এর অর্থ এই নয় যে, পত্রিকাগুলোর রাজনৈতিক বিশ্বাসের স্থায়ী কোনো পরিবর্তন ঘটেছে। বরং পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলির মিথস্ক্রিয়ায় পত্রিকাগুলো তাদের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক অবস্থানেই ফিরে গেছে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনি প্রচারণার কৌশল হিসেবে সংবাদপত্রকে কাজে লাগায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হবার পর নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের কাছে জনগণের যে প্রত্যাশা ছিল তা পূরণ হয়নি। জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে মুসলিম লীগের অবস্থান নিম্নমুখী হলেও *আজাদ*, *মর্নিং নিউজ*, *সংবাদ* এবং ঢাকার প্রায় সব দৈনিক মুসলিম লীগকে সমর্থন করে। সঙ্গত কারণেই মুসলিম লীগের পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করা পত্রিকাগুলোর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অপরদিকে সাপ্তাহিক থেকে দৈনিকে রূপান্তরিত *ইত্তেফাক* যুক্তফ্রন্টের মুখপত্র হিসেবে কাজ করে। *পাকিস্তান অবজারভার*-এর প্রকাশনা তখনও বন্ধ। পত্রিকাটির মালিক হামিদুল হক চৌধুরী এবং সম্পাদক আবদুস সালাম যুক্তফ্রন্ট থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হন।

২.১ *আজাদ*

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে *আজাদ* মুসলিম লীগের প্রধান মুখপত্র হিসেবে কাজ করে। তবে এর সূচনা ঘটে আরও আগে ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচনে। এই নির্বাচনে *আজাদ* সরকার দলীয় প্রার্থী খুররম খান পন্নীর পক্ষে প্রচারণা চালায়। পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক সরকারের জারিকৃত নিষেধাজ্ঞার ফলে আইনত ১৯৫৩ সালের আগে

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা ভাসানী ও খুররম খান পন্নীর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা ছিল না। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার বিশেষ ক্ষমতাবলে নিষেধাজ্ঞাটি প্রত্যাহার করে নেয়। মুসলিম লীগের মনোনয়ন প্রক্রিয়ার সাথে যারা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে *আজাদ* মালিক মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন অন্যতম। ফলে পত্রিকার নীতিতেও এর প্রভাব পড়ে। পত্রিকাটি খুররম খান পন্নীর অগণতান্ত্রিক মনোনয়নের বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করলেও বিরোধী প্রার্থী শামসুল হককে মুসলিম লীগ কর্মী হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপন। নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী পরাজিত হওয়ার পর *আজাদ* এই পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করে। ১৯৪৯ সালের ৩ মে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয়তে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ'র ভূমিকাকে গৌণ করে সব দায় চাপানো হয় নুরুল আমীন সরকারের ওপর। পত্রিকাটি নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতির পাশাপাশি 'সরকারি পাপের বোঝা'কে পরাজয়ের কারণ হিসেবে দায়ী করে। মওলানা আকরম খাঁ পদত্যাগ করলেও তিনি পুনরায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৫৪ সালের নির্বাচনেও *আজাদ* একই নীতি গ্রহণ করে মুসলিম লীগকে সমর্থন করে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন উপলক্ষে ২৭ জানুয়ারি *আজাদ* মুসলিম লীগের একটি দীর্ঘ নির্বাচনি ইশতাহার প্রকাশ করে। মার্চের ৮ তারিখ পর্যন্ত সেটি মাঝে মধ্যেই ছাপানো হতো। এর বাইরে ১৯৫৪ সালের ১-৫ মার্চ প্রতিদিন ৫নং পাতায় মুসলিম লীগকে ভোটদানের আবেদন জানিয়ে বিশাল লিফলেট প্রকাশ করে পত্রিকাটি।[১২১] নির্বাচনি প্রচারনায় *আজাদ* যুক্তফ্রন্টের বিরোধিতার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয় – যুক্তফ্রন্টের অবশ্যম্ভাবী ভঙ্গুরত্ব, যুক্তফ্রন্টের ওপর কমিউনিস্টদের প্রভাব এবং পাকিস্তান আন্দোলনের সময় যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ বিশেষত ফজলুল হক এবং সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা। বিভিন্ন ইসলামি দল ও ব্যক্তিত্ব নিজেরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলেও মুসলিম লীগের সমর্থনে বক্তৃতা বিবৃতি প্রদান করেন যা *আজাদ* নিয়মিত প্রকাশ করে। ১৯৫৪ সালের ৫ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে হেজবুল্লাহর সম্পাদক মওলানা আজিজুর রহমানের বিবৃতি *আজাদ* প্রকাশ করে। তিনি মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন যে, পাকিস্তানে ইসলামি আদর্শ কায়েম করতে হলে মুসলিম লীগকে সমর্থন করা ব্যতীত শরিয়ত সম্মত অন্য পথ নেই।[১২২] এরই ধারাবাহিকতায় ২১ জানুয়ারি জমিয়তে হেজবুল্লাহর ছাত্রফ্রন্ট পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র হেজবুল্লাহর প্রচার সম্পাদক মওলানা ছাহেব আলীর বক্তব্য *আজাদ* প্রকাশ করে। তিনি পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার দোহাই দিয়ে মুসলিম লীগের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন।[১২৩] একইভাবে ৩১ জানুয়ারি শর্ষীনার পীর[১২৪] এবং ৪ ফেব্রুয়ারি আগা খানের বক্তব্য[১২৫] *আজাদ* প্রকাশ করে। তাঁরা উভয়ই পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য মুসলিম লীগকে জয়ী করার কথা বলেন। কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে পত্রিকাটির এই সাম্প্রদায়িক অবস্থান নির্বাচনের দুই সপ্তাহ আগেও পরিলক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। ১৯৫৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি *আজাদ* জমিয়তে হেজবুল্লাহর 'লীগকে সমর্থন করা ওয়াজেব'[১২৬] এই বক্তব্য প্রকাশ করে। পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে আহলে হাদিস- এর সভাপতি মওলানা মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হেল কাফি মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীদেরকেই জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান এবং *আজাদ* এই বক্তব্য ৪ মার্চ প্রকাশ করে। বিভিন্ন ইসলামি দল ও ব্যক্তিত্ব মুসলিম লীগকে সমর্থন জানায় এবং তাদের এই সমর্থনের বিষয়টি *আজাদ*-এ প্রচারণা পায়। এর পাশাপাশি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহ, প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী, পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনেরও বিভিন্ন সময়ে মুসলিম লীগকে সমর্থন করে দেওয়া বক্তব্য পত্রিকাটি প্রকাশ করে।[১২৭] যেমন – ১৯৫৪ সালের ২ মার্চ *আজাদ* ফাতিমা জিন্নাহর বক্তব্য উদ্ধৃত করে আট কলামব্যাপী শিরোনাম প্রকাশ করে। এখানে মুসলমানদের শাসন ও পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখতে মুসলিম লীগকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। মুসলিম লীগ প্রার্থীদের সমর্থনে দেওয়া বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতির পাশাপাশি *আজাদ* তার সম্পাদকীয় কলামে মুসলিম লীগকে সমর্থন করে। নির্বাচনের ঠিক আগে ৬ মার্চ *আজাদ* এ. কে. ফজলুল হকের সরাসরি সমালোচনা করে 'পাকিস্তানী হুশিয়ার' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে মুসলিম লীগের প্রতি *আজাদ*-এর পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি আবারও প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> মোছলেম লীগের পাকিস্তান সংগ্রামের সংকটকালে যখন এই উপমহাদেশের মোছলেম জনসাধারণ মোছলেম লীগের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ, তখন জনাব হক সাহেব শুধু লীগ ত্যাগ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, লীগ এবং স্বয়ং কায়েদে আজম সম্পর্কে যেসব অকথ্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও আজ সকলে অবগত আছেন।[১২৮]

এই সম্পাদকীয়তে কমিউনিস্টদের প্রভাব এবং তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে পত্রিকাটির সাম্প্রদায়িক চরিত্র ফুটে উঠে। সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "...লীগকে খতম করাই কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান উদ্দেশ্য... কোন রূপে যুক্তফ্রন্টরূপী অস্ত্র ব্যবহার করে মোছলেম লীগকে ধবংস করিতে পারিলে দেশের মুসলমানদের এছলামী জীবনধারা গঠনের মৌলিক আশা-আকাঙ্ক্ষাও চূর্ণ করা সম্ভব হইবে।"[১২৯] নির্বাচনের ঠিক আগেই পত্রিকাটির এই সম্পাদকীয় ছিল পক্ষপাতদুষ্ট।

আজাদ যুক্তফ্রন্ট নেতাদের কিছু কিছু বক্তব্যও প্রকাশ করে। যেমন সোহরাওয়ার্দী ২৩ জানুয়ারি যশোরে এক জনসভায় মুসলিম লীগের বিপক্ষে ভোটারদের ঘুষ দিয়ে বশীভূত করার অভিযোগ আনেন। *আজাদ* ২৭ জানুয়ারি সংখ্যায় এই সংবাদ প্রকাশ করে। একটি পর্যায়ে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টনের প্রশ্নে এ. কে. ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে *আজাদ*-সহ লীগ সমর্থিত অন্য কয়েকটি পত্রিকাকে ব্যবহার করে যুক্তফ্রন্টকে বিভাজিত করার চেষ্টা করা হয়। *আজাদ*, *সংবাদ* ও *মর্নিং নিউজ*

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন যে, 'যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে গেছে' শিরোনামে সংবাদটি ফলাও করে ছাপতে হবে। পরবর্তী সময়ে এই দুই নেতার মতবিরোধের অবসান হলে, দু'জনের স্বাক্ষরিত একটা যুক্ত বিবৃতি সংবাদপত্রে জারি করা হয়। এ সময় পূর্ব বাংলায় *আজাদ*-এর প্রভাব ছিলো সবচেয়ে বেশি। ফলে সোহরাওয়ার্দী নিজেই *আজাদ* পত্রিকার যুগ্ম বার্তা সম্পাদক সিরাজউদ্দিন হোসেনকে যুক্ত বিবৃতি ছাপার জন্য অনুরোধ জানালেন। সিরাজউদ্দিন হোসেন যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্কিত পূর্ব পরিকল্পিত সংবাদ বেশি ফলাও করে না ছেপে পাশাপাশি হক-সোহরাওয়ার্দীর যুক্ত বিবৃতিও ছেপে দিলেন। ফলশ্রুতিতে *আজাদ* থেকে সিরাজউদ্দিন হোসেনকে চাকুরিচ্যুত হতে হয়।[১৩০] নির্বাচনের তিন দিন আগে ৪ মার্চ সংখ্যায় *আজাদ* নির্বাচনের সর্বশেষ পরিস্থিতি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। এই বর্ণনা অনুযায়ী নির্বাচনপূর্ব একটি সুষ্ঠ পরিবেশের চিত্র পাওয়া যায়। *আজাদ*-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, "...প্রচারকার্যের এই শেষ পর্যায়েও লক্ষণীয় বস্তু এই যে, একদলের সভা বা শোভাযাত্রায় আরেকদল আর বাধা দিতেছে না।"[১৩১] ৯ মার্চের সংখ্যায় *আজাদ* নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করে মন্তব্য করে, "নির্বাচনী দিবসের পূর্বে নানাজনে নানা প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু গতকল্য...পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রের প্রথম পরীক্ষায় সাফল্যজনকভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে"।[১৩২] কিন্তু মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় বুঝতে পেরে ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার আগেই *আজাদ* 'তদন্ত ও প্রতিকার' শিরোনামে সম্পাদকীয় বের করে। এতে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পক্ষপাতমূলক আচরণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়।[১৩৩] পত্রিকাটির এই বক্তব্য ছিল মুসলিম লীগ ও নুরুল আমীনের বক্তব্যের সমর্থক। এর আগে নুরুল আমীন সাংবাদিকদের বলেছিলেন পূর্ব বাংলায় নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি।[১৩৪] পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করলেও এমন শোচনীয় পরাজয়ের বিষয়টি তাঁদের ধারণায় ছিল না। এ নির্বাচনে *আজাদ* পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন এবং তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। তিনি নিজেই মন্তব্য করেন, "নির্বাচনে হার হবে এতো জানতামই, কিন্তু সে-হার যে জামানত বাজেয়াফতের মতো হার হবে তা অবশ্য কল্পনা করতে পারি নাই।"[১৩৫] প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীনসহ তার চার মন্ত্রিপরিষদ সদস্য এবং আরও ৫০ জন নেতার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।[১৩৬]

তবে নির্বাচনে পরাজয়ের পর মুসলিম লীগের মুখপত্র হিসেবে কাজ করা পত্রিকাটি নির্বাচনে দলটির পরাজয়ের কারণ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে। ২২ মার্চ সংখ্যায় পত্রিকাটি মুসলিম লীগের পরাজয়ের পেছনে নিম্নলিখিত কারণগুলোকে দায়ী করে –

ক. বাংলাভাষার দাবির প্রতি অবিচার

Dhaka University Institutional Repository

খ. পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার ও শোষণ নীতি

গ. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাকে স্বায়ত্তশাসন না দেওয়া

ঘ.পূর্ব বাংলার জনগণের আর্থিক দুর্দশা[১৩৭]

ঙ. শাসনতন্ত্র রচনার বিলম্ব

চ. লীগের প্রতি ছাত্র ও তরুণ সমাজের বিরূপ মনোভাব ইত্যাদি[১৩৮]

এর আগে পত্রিকাটি ফজলুল হক সম্পর্কে যথেষ্ট অপভাষা ব্যবহার করলেও যুক্তফ্রন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ২৭ মার্চ 'নতুন মন্ত্রিসভা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে ফজলুল হকের জনপ্রিয়তাকে স্বীকার করে নেয়। সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "...তাঁর এই বয়সেও জাতি তাঁর হস্তে দেশ শাসনের গুরুদায়িত্বভার তুলিয়া দিয়া স্বস্তিবোধ করিয়াছে, ইহা তাঁহার অসামান্য জনপ্রিয়তারই অকাট্য প্রমাণ"[১৩৯]

২.২ *ইত্তেফাক*

১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দৈনিক পত্রিকা হিসেবে *ইত্তেফাক* বের হয়। এর আগে ১৫ আগস্ট ১৯৪৯ সাল থেকে এটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে বের হতো। আওয়ামী মুসলিম লীগের মুখপত্র হিসেবে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করে। পত্রিকাটি মুসলিম লীগের দেশ পরিচালনার ব্যর্থতাকে যুক্তি ও পরিসংখ্যান দিয়ে সাবলীলভাবে প্রকাশ করতে থাকে। 'মোসাফির' ছদ্মনামে লেখা তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)'র নিজস্ব কলাম 'রাজনৈতিক মঞ্চ' জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। এ সময় *ইত্তেফাক*-এর প্রচার সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে যায়।[১৪০]

দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর আবির্ভাব ঘটে মুসলিম লীগ সরকারের সমালোচনার মধ্য দিয়ে। দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার প্রথম দিনই পত্রিকাটি লাল কালিতে শিরোনাম করে - 'মুসলিম লীগের নাভিশ্বাস'।[১৪১] *ইত্তেফাক* মুসলিম লীগ সরকারের বিভিন্ন গঠনমূলক সমালোচনা করে। যেসব বিষয়কে সামনে রেখে সমালোচনা করা হয় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো – পূর্ব বাংলার লবণ দুর্ভিক্ষ, লাইসেন্স ইস্যু করে এক-তৃতীয়াংশ পাটের চাষ হ্রাস, রাজধানীর খাপরা ওয়ার্ডে নিরীহ রাজবন্দীদের গুলি করে হত্যা, জননিরাপত্তা আইনে রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের গ্রেফতার, ৩৪ টি উপনির্বাচন যথাসময়ে না করে স্থগিত রাখা ইত্যাদি। *ইত্তেফাক* যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা ভিত্তিক নির্বাচনি প্রচারণার পক্ষে ভূমিকা পালন করে। ২১ দফা কর্মসূচিকে বাঙালি এলিট শ্রেণির কর্মসূচি হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের পাশাপাশি বৃহত্তর সামাজিক শ্রেণির ভোটারদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আবুল মনসুর আহমেদ ২১ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন

Dhaka University Institutional Repository

করেন। একুশে ফেব্রুয়ারির ২১ সংখ্যাটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি এটি বেছে নেন।[১৪২] ফলে ২১ দফা কর্মসূচি খুব সহজেই পূর্ব বাংলার ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় এবং বাঙালির মুক্তির সনদ হয়ে ওঠে।[১৪৩] সুতরাং ২১ দফা ভিত্তিক কর্মসূচির পক্ষে বাঙালি জনমতকে সংঘটিত করার মাধ্যমে *ইত্তেফাক* বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ নির্বাচনের আগে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক বিভিন্ন প্রচারণা চালায়। যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিলে বিবি তালাক হয়ে যাবে, যুক্তফ্রন্ট ভারতের দালাল, মুসলিম লীগ মসজিদ সমতুল্য ইত্যাদি বিভিন্ন বক্তব্য মুসলিম লীগ ও এর সমর্থকেরা প্রচার করতে থাকে। এসব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে *ইত্তেফাক* বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে এবং বিভিন্ন ভাবে এসব অপপ্রচার যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে।[১৪৪] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগে *ইত্তেফাক* অনেক ক্ষেত্রে কর্মীর দায়িত্ব পালন করেছে। মুসলিম লীগ সরকারের দমননীতির কারণে অনেক স্থানে প্রকাশ্যে প্রচারণা চালানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু অনেক হাটবাজার ও জনসমাবেশে *ইত্তেফাক* ঝুলিয়ে রাখা হতো। নির্বাচনের আগে স্কুল, কলেজ, হাট, বাজার, পাড়ার ক্লাবসহ বড় বড় সমাবেশে *ইত্তেফাক* পাঠ করা হয়েছে।[১৪৫] চট্টগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী পত্রিকাটিকে এভাবে ব্যবহার করে প্রচারণা চালিয়েছিলেন।[১৪৬] *ইত্তেফাক* যুক্তফ্রন্টের তিন শীর্ষ নেতা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা ভাসানীর নির্বাচনি প্রচারণার সচিত্র প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করে। পত্রিকাটি ফেব্রুয়ারি মাসেই নির্বাচন নিয়ে ১২ টি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) 'মোসাফির' ছদ্মনামে তার 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। 'রাজনৈতিক মঞ্চ' পাঠকদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করে এবং ফলশ্রুতিতে মুসলিম লীগের পরাজয় ঘটে। সাধারণ বাঙালি যারা অল্প শিক্ষিত কিন্তু পত্রিকা পড়তে অভ্যস্ত – তারাই ছিলেন 'মোসাফির'র নিয়মিত পাঠক। তারাই যুক্তফ্রন্টকে ভোটাধিক্যে জিতিয়ে দেন।[১৪৭] মূলত মুসলিম লীগ বিরোধী মানসিকতার ক্ষেত্রটি আগেই তৈরি করে রেখেছিল সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক* এবং 'মোসাফির'। দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার পর এটি আরও সামনে চলে আসে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকালীন সময়ে *আজাদ*-এর মত জনপ্রিয় কাগজের সাথে নতুন *ইত্তেফাক*-এর টিকে থাকার কারণ ছিল মূলত 'মোসাফির' এবং 'রাজনৈতিক মঞ্চ'র জনপ্রিয়তা। যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হলে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে যুক্ত বাংলা গঠিত হবে –

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকাগুলোর এ ধরনের প্রচারণার বিপরীতে ‘মোসাফির’ ১৯৫৪ সালের ৫ মার্চ মন্তব্য করেন:

> প্রথমত যুক্ত বাংলা গঠনের খেয়াল বা পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ইচ্ছা পূর্ব বাংলার মুসলমানের নাই। দ্বিতীয়ত এই অঞ্চলের লোকদের কিসে মঙ্গল আর কিসে অমঙ্গল হইবে – সেটুকু বিচার করিবার বুদ্ধি শুদ্ধি তাদের আছে। আর আছে বলিয়াই পাকিস্তান আন্দোলনে তাহারাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯৪৬ সালে পাকিস্তানী ইস্যুর উপর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এই অঞ্চলের নির্বাচনী ফলাফলের উপরই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল।[১৪৮]

নির্বাচনের ঠিক আগে ১৯৫৪ সালের ৭ মার্চ যুক্তফ্রন্টের প্রধান তিন নেতার বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকাগুলোর প্রচারণার জবাবে ‘মোসাফির’ মন্তব্য করেন, “বাংলায় প্রজা আন্দোলনে ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী প্রমুখ নেতার অবদানের কথা বাংলার ঘরে ঘরে জানা আছে। বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কৃষককুলের চেতনা জাগ্রত করার ব্যাপারে ফজলুল হকের অবদান সর্বাপেক্ষা বেশী”[১৪৯] নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ঢাকার রাজারবাগে ‘মোসাফির’ তথা মানিক মিয়ার একটি গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিপুল জনসমাগম তার জনপ্রিয়তাকেই প্রমাণ করে।[১৫০]

সার্বিকভাবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগে *ইত্তেফাক*-এর সংবাদ পরিবেশনা ছিল অনেক ত্বরিত ও আকর্ষণীয়। পত্রিকাটি যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবির পক্ষে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে এবং জনমতকে সংগঠিত করে। পত্রিকাটি যুবসমাজকে বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে ভূমিকা পালন করে।

২.৩ অন্যান্য

আজাদ-এর পাশাপাশি *সংবাদ* এবং *মর্নিং নিউজ* ছিল মুসলিম লীগের সমর্থক। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে যে জনমত তৈরি হয় সেটি লক্ষ্য করে মুসলিম লীগ নির্বাচন পেছানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিশেষ করে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, এ. কে. ফজলুল হকের সাথে গোপনে আঁতাত করার পরিকল্পনা নেন। তিনি নির্বাচন এক বছরের জন্য স্থগিত রেখে ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী বানানো এবং তার দল থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ ভিত্তিতে সদস্য গ্রহণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রের বিষয়টি যুক্তফ্রন্টের ভেতরে ফাঁস হয়ে যায়। *সংবাদ* এর সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী এই গোপন তথ্যটি *ইত্তেফাক* পত্রিকার তফাজ্জল হোসেনকে জানিয়ে দেন, যদিও *সংবাদ* ছিল মুসলিম লীগের পত্রিকা।[১৫১] অপরদিকে চার পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পত্রিকা *মিল্লাত* ১৯৫৪

সালের নির্বাচনের আগে মুসলিম লীগের সমর্থক ছিল। কিন্তু মোহন মিয়ার লীগ থেকে বহিষ্কার এবং যুক্তফ্রন্টে যোগদানের পর পত্রিকাটি যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন করতে থাকে।[১৫২] অর্থাৎ *মিল্লাত* জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল। নির্বাচনের আগে *মিল্লাত*-এর সম্পাদক মোহাম্মদ মোদাব্বের পদত্যাগ করেন। তিনি অর্ধ সাপ্তাহিক *পাকিস্তান* পত্রিকার সম্পাদকের পাশাপাশি যুক্তফ্রন্টের প্রচারণার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

৩. ১৯৫৬ সালের সংবিধান

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হওয়ার পর ১৯৫৪ সালের মার্চ থেকে ১৯৫৮ সালের আগস্ট পর্যন্ত পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্যে প্রচুর পরিবর্তন হয়। এই সময়কালে পূর্ব বাংলায় সাতটি মন্ত্রিসভা পরিবর্তিত হয় এবং তিনবার গভর্নরের শাসন চালু হয়। রাজনৈতিক চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বরে আইনসভার ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী নিহত হলে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করা হলে পূর্ব বাংলা তথা পাকিস্তানে সংসদীয় পদ্ধতির অবসান ঘটে।

নির্বাচনে বিজয়ের ফলে ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের সাফল্য মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী সুনজরে দেখেনি। তারা নবগঠিত সরকারকে উৎখাত করার বিভিন্ন উপায় খুঁজতে থাকে। এরই প্রেক্ষিতে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে একের পর এক বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। এছাড়া সুপরিকল্পিত ভাবে পূর্ব বাংলার শিল্প এলাকাগুলোতে বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে অভিযোগ করা হয় যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ। ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে উপস্থিত হতে করাচি গেলে *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার সাংবাদিক জন. পি. কালাহান ফজলুল হকের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং ২৩ মে সেটি বিকৃত করে প্রকাশ করেন। ফজলুল হক পূর্ব বাংলার অধিক স্বায়ত্তশাসন পাওয়া উচিত বলে দাবি করলেও কালাহান লেখেন যে ফজলুল হক পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চান।[১৫৩] অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সালের ২৯ মে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২-ক ধারা অনুযায়ী পূর্ব বাংলায় ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বাতিল করে গভর্নরের শাসন জারি করে এবং কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা সচিব ইস্কান্দার মির্জা নতুন গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পান। পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন ১৯৫৫ সালের ২ জুন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ইতোমধ্যে সোহরাওয়ার্দী ও এ. কে. ফজলুল হকের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদে যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন তৈরি হয়। নির্বাচনের এক বছরের মধ্যেই নীতির চেয়েও এই দুই নেতার ব্যক্তিত্বের লড়াই

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তফ্রন্টকে দ্বিধা বিভক্ত করে। একদিকে আওয়ামী লীগ অন্যদিকে কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলামি ও আওয়ামী মুসলিম লীগ। গণতন্ত্রী দল ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা আওয়ামী লীগকে এবং খিলাফতে রব্বানী ফজলুল হক জোটকে সমর্থন করে।[১৫৪] কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৫ সালের জুন মাসে কেএসপি'র আবু হোসেন সরকারকে পূর্ব বাংলার মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি দেয়। এই সরকারের মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব রক্ষার্থে ১৯৫৬ সালের ৫ মার্চ ফজলুল হক পূর্ব বাংলার গভর্নর পদ লাভে সক্ষম হন। তবে এক্ষেত্রে মুসলিম লীগকে দেওয়া কৃষক শ্রমিক পার্টির দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ছিল – পাকিস্তান গণপরিষদে পাশ করার জন্য পেশ করা খসড়া সংবিধান দলটি সমর্থন করবে এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত যৌথ নির্বাচনি ব্যবস্থা এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি সমর্থন করবে না।[১৫৫] খসড়া সংবিধানে পাকিস্তানকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' হিসেবে ঘোষণা করাকে আওয়ামী লীগ বিরোধিতা করে।[১৫৬] তবে কৃষক শ্রমিক পার্টির সমর্থন নিয়ে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি সংবিধান পাশ করিয়ে নেয় যা ২৩ মার্চ থেকে কার্যকর হয়।

ইতোমধ্যে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সমর্থিত কোয়ালিশন সরকার গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটে এবং ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নতুন কোয়ালিশন সরকার (গণতন্ত্রী দল, রফিক হোসাইনের আওয়ামী মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু মুসলিম দল) গঠিত হয়। এ ঘটনার পর কেন্দ্রেও আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। কিন্তু সরকার গৃহীত বিভিন্ন নীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে কোন্দল তৈরি হয়। বিশেষ করে বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদকে বহিষ্কার করা হয় এবং ওয়ার্কিং কমিটির ৯ জন সদস্য পদত্যাগ করেন। শেষ পর্যন্ত ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতির পদে ইস্তফা দেন এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ তৈরি হয়। তবে গভর্নর এ. কে. ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারকে ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চ সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান। কেন্দ্রে ফিরোজ খান নূনের মন্ত্রিসভা আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকায়, পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য এ. কে. ফজলুল হককে বরখাস্ত করে ১ এপ্রিল পূর্ব বাংলার চিফ সেক্রেটারিকে অস্থায়ী গভর্নরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। নতুন অস্থায়ী গভর্নর ঐদিনই আতাউর রহমান খানের আওয়ামী লীগ সরকারকে পুনর্বহাল করেন। কিন্তু পরিষদের খাদ্য পরিস্থিতির ওপর ভোটাভুটিতে আওয়ামী লীগ হেরে যায় এবং ১৯৫৮ সালের ১৯ জুন মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। ফলে ২০ জুন কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন সরকার পুনরায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করে। এ সময় আওয়ামী লীগ নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ন্যাপের সমর্থন আদায় করে এবং ১৯৫৮ সালের ২৩ জুন আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভাকে আস্থা ভোটে পরাজিত করে। ২৫ জুন পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয়। তবে ২৫ আগস্ট পূর্ব বাংলায় পুনরায় আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হয়। কিন্তু আইন পরিষদের ডেপুটি স্পিকার - আওয়ামী লীগ দলীয় শাহেদ আলী পাটোয়ারী আইন সভার সদস্যদের (কৃষক শ্রমিক পার্টির) নিক্ষিপ্ত বস্তুর আঘাতে নিহত হন। রাজনৈতিক এই চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করা হলে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে।

যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার পর এর বিভিন্ন অঙ্গদলের সমর্থক সংবাদপত্রগুলো নিজেদের মধ্যে বিভেদে জড়িয়ে পড়ে। *ইত্তেফাক* এবং পরিবর্তিত মালিকানায় *সংবাদ* আওয়ামী লীগের পক্ষ সমর্থন করে। অন্যদিকে *পাকিস্তান অবজারভার, মর্নিং নিউজ, আজাদ, মিল্লাত* প্রভৃতি পত্রিকা কৃষক শ্রমিক পার্টি (কেএসপি)-কে সমর্থন করে। ঢাকার পত্রিকাগুলোর এই রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ প্রকটভাবে উপস্থাপিত হয় ১৯৫৬ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করার সময়। পূর্ব বাংলা থেকে এই সংবিধান প্রণয়নে মূল ভূমিকা পালন করে বিভাজিত যুক্তফ্রন্ট বিশেষ করে কৃষক শ্রমিক পার্টি।

৩.১ *ইত্তেফাক*

পূর্ব বাংলায় ৯২(ক) ধারা জারি এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়ার প্রতিবাদে *ইত্তেফাক* সম্পাদকীয় কলামে মন্তব্য করে "অদ্যকার সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হইল না"।[১৫৭] খসড়া সংবিধান প্রণয়নের অনেক আগে থেকেই *ইত্তেফাক*-এর সাথে মুসলিম লীগ ও এর সমর্থক পত্রিকা *আজাদ* এর বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নির্বাচনের পর ১৯৫৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মত জননিরাপত্তা আইন (Public safety Act)-এর অধীনে *ইত্তেফাক* পত্রিকার প্রকাশনা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বন্ধ রাখা হয়। পত্রিকাটি পুনরায় ১৯৫৪ সালের ২ নভেম্বর নতুন কলেবরে প্রকাশিত হয়। ঐ দিন তফাজ্জল হোসেন *ইত্তেফাক* বন্ধের পেছনে মুসলিম লীগ ও *আজাদ* পত্রিকাকে দায়ী করে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে লেখেন:

> আমরা ২০ সেপ্টেম্বরের 'ইত্তেফাকে' ক্ষমতালোভীদের মুখপত্র 'আজাদের' পূর্বেকার ভূমিকা উহার পৃষ্ঠা হইতেই উদ্ধৃত করি। ...ওয়ার্নিং না দিয়া আকস্মিকভাবে ইত্তেফাক বন্ধ করা হইল। আমরা যে মতবাদ পোষণ করি – দেশের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের যে মতবাদ রহিয়াছে, উহার কোথাও অসারতা থাকিলে তার জবাব লীগ দলীয় পত্রিকাগুলি বা লীগ

Dhaka University Institutional Repository

মোড়লরা দিতে পারিতেন। কিন্তু যেহেতু বিশ্বাসঘাতকতার কোন জওয়াব হয়না, তাই আমাদের নিক্ষেপ করা হইয়াছিল অন্ধকারের মধ্যে।[১৫৮]

১৯৫৫ সালের ২১ অক্টোবর ঢাকার সদরঘাট রূপমহল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সম্মেলনে গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে সংগঠনের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে সংগঠনটি হয়ে ওঠে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র। বিষয়টিকে অভিনন্দন জানায় *ইত্তেফাক*।

পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়নকালে পূর্ব বাংলার স্বার্থ বিরোধী বিষয়গুলোর তীব্র বিরোধিতা করে *ইত্তেফাক* অসংখ্য সংবাদ ও সম্পাদকীয় ছাপতে শুরু করে। আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে পত্রিকাটি দলটির প্রতিবাদ সভার বিজ্ঞপ্তি বক্স করে ১৯৫৬ সালের ৬ জানুয়ারি প্রকাশ করে। পরদিন ৭ জানুয়ারি সংবিধান সম্পর্কে পত্রিকাটি নিজস্ব মতামত জানিয়ে 'শাসনতন্ত্র ও আমরা কি চাই' শিরোনামে নিবন্ধ প্রকাশ করে। এখানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাজস্ব, আয়, চাকুরি ইত্যাদি বিভিন্ন বৈষম্য তুলে ধরা হয়। খসড়া সংবিধানকে গণবিরোধী আখ্যা দিয়ে ১০ জানুয়ারি *ইত্তেফাক* সম্পাদকীয় প্রকাশ করে যেখানে স্বাধীনতার আট বছরেও পরিপূর্ণ সংবিধান প্রণয়ন করতে না পারার সমালোচনা করে মন্তব্য করা হয়, "... মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী আর একটি খসড়া শাসনতন্ত্র প্রকাশ করা হইল। ... কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে তৈরি পূর্বেকার তিন তিনটি খসড়া যে পথে গিয়াছে বর্তমানের খসড়াটি সেই পথে যাইতে বাধ্য।"[১৫৯] পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এই সম্পাদকীয়তে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি পূরণ না করায় পরোক্ষভাবে কৃষক শ্রমিক পার্টির সমালোচনা করা হয়। *ইত্তেফাক*-এর ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের প্রকাশ পাওয়া যায় এই সম্পাদকীয়তে। শাসনতন্ত্রে ইসলামি ধারাগুলোর কারণে মুসলিম লীগ এবং দলটির মুখপত্র *আজাদ* এবং *মর্নিং নিউজ* সন্তোষ প্রকাশ করায় *ইত্তেফাক* সেটির সমালোচনা করে বলে:

> ... গত নির্বাচনে এই সাইনবোর্ড সম্বল করিয়া মুসলিম লীগ নির্বাচনী মাঠে নামিয়া কি ভাবে পর্যুদস্ত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষদর্শী হইয়াও যাদের শিক্ষা হয় নাই তাদের দৃষ্টির উন্মেষ করিতে চাহিলেও কোন লাভ নাই জানি, কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদী ও তাহাদের এজেন্টরা যদি মনে করিয়া থাকে যে, পবিত্র ইসলামের নামোচ্চারণ করিলেই তাহাদের গত সাত বৎসরের পাপ ঢাকা পড়িয়া যাইবে বা জনসাধারণ তদ্দারা এতটুকু বিভ্রান্ত হইবে, তাহা হইলে অচিরেই তাহাদের সেই ভুল ধারণা ভাঙ্গিবে।[১৬০]

ইত্তেফাক কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার সমালোচনা অব্যাহত রাখে। ১৯৫৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বের হওয়া ভুখামিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের তীব্র

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচনা করে পত্রিকাটি। মূলত আওয়ামী লীগ সমর্থক হিসেবেই পত্রিকাটি এই সমালোচনামূলক নীতি গ্রহণ করে। কারণ এর পরপরই কেন্দ্র ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হলে *ইত্তেফাক* বিষয়টিকে অভিনন্দিত করে। এটিকে স্বাধীনতার পর গণতন্ত্রের 'নব অরুণোদয়' হিসেবে উল্লেখ করে পত্রিকাটি শিরোনাম করে –'পাকিস্তানের তিমিরাচ্ছন্ন রাজনৈতিক দিক চক্রবালে নূতন আশার আলোকচ্ছটা।'[১৬১]

১৯৫৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে টাঙ্গাইলের কাগমারিতে শুরু হওয়া সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের ভাঙ্গনের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পশ্চিমা যুদ্ধ জোটগুলোতে অংশগ্রহণের পক্ষে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী এর বিরোধী ছিলেন। কাগমারী সম্মেলন চলাকালে *ইত্তেফাক* আওয়ামী লীগের এই মতবিরোধের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকে। বিপরীতে সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়ে পত্রিকাটি সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। এর মাধ্যমে *ইত্তেফাক* আওয়ামী লীগের পাশ্চাত্য ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। সম্মেলন সমাপ্তির পর পত্রিকাটির সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন তার 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে ভাসানীর এই নীতির সমালোচনা করেন। তার বক্তব্যে পূর্ব বাংলার জাতীয় রাজনীতিতে ভারত বিরোধিতার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়। ১৯৫৭ সালের ১২ জুন মানিক মিয়া 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে মন্তব্য করেন:

> ... যে বলিষ্ঠ পররাষ্ট্রনীতি গোটা দেশের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করিয়াছে সেই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের কাহারো যদি আপত্তি থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের মতামত প্রতিষ্ঠানের মারফত উপস্থাপন করিতে পারিতেন। ... মওলানা ভাসানীর উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে ভারত সরকার পাকিস্তান অর্জনের পরও তাঁহাকে ধুবরীতে গ্রেফতার করিয়া জেলে আটক রাখিয়া পরে মুক্তি দিয়া আসাম হইতে বহিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই ভারতের সংবাদপত্রগুলি আজ কেন তাঁহার প্রসংশায় পঞ্চমুখ।[১৬২]

দলের অভ্যন্তরেই জাতীয় ইস্যুতে সৃষ্ট বিভাজনের সমালোচনা করে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে মন্তব্য করা হয়:

> আওয়ামী লীগ দেশে বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও অনুপ্রবেশকারী ঐ কুচক্রী অবৈধ প্রভাবের ফলে জাতীয় সংকটকালে যে যোগ্য স্পষ্ট ভূমিকা গ্রহণে বিলম্ব করিতে বাধ্য হয়, ইহার ফলে শুধু আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যেই নয়, দেশ বিদেশে চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। যে কোনো জাতীয় ইস্যু দেখা দিলে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিতে না পারিলে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি অনিবার্য, তদুপরি আওয়ামী লীগ আজ কেন্দ্রে ও প্রদেশে ক্ষমতাসীন। গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তাঁহাকে যে দিকেই হউক, স্পষ্ট নীতি ঘোষণা করিতে হইবে।[১৬৩]

তবে ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের ওপর শোষণ বন্ধ করার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন *ইত্তেফাক* সেটি সম্পূর্ণ ভাবেই এড়িয়ে যায়। মানিক মিয়া ও *ইত্তেফাক* কমিউনিস্ট বিরোধী ও পাশ্চাত্যপন্থি

Dhaka University Institutional Repository

মনোভাবের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। ১৯৫৭ সালের ১৭ মার্চ প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের কাছে লেখা ভসানীর পদত্যাগপত্র শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে পৌঁছানোর আগেই ভাসানীর ঘনিষ্ঠ অলি আহাদের মাধ্যমে *সংবাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অলি আহাদ বহিষ্কার হলে প্রাতিষ্ঠানিক সংহতি বজায় রাখার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে *ইত্তেফাক* বহিষ্কারের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে মন্তব্য করে, "... যেসব ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মিঃ ওলি আহাদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছিল তারা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে নিজেদের মর্যাদা বা প্রভাবকে বেশি মনে করিয়াছিলেন"[১৬৪] কাগমারী সম্মেলনের সময় স্বায়ত্তশাসন ও পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে মতবিরোধ থেকে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থিরা আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে গিয়ে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপ গঠন করলে *ইত্তেফাক*-এর পাতায় বিষয়টির সমালোচনা করা হয়। সুতরাং জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তথা আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন থেকেই পত্রিকাটি সংবাদ পরিবেশন করছিল। ১৯৫৭ সালের ২৫-২৬ জুলাই ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হয়। বিষয়টিকে *ইত্তেফাক* সমালোচনা করে মন্তব্য করে – "লাল মিঞাদের গণতন্ত্র বিরোধী চক্রান্ত; কম্যুনিস্ট জুজুর অলীক কাহিনী"[১৬৫]

তবে *ইত্তেফাক* ও তফাজ্জল হোসেনর এই কমিউনিস্ট বিরোধিতাকে অন্যভাবে মূল্যায়ন করে সাংবাদিক এম. আর. আখতার মুকুল বলেন, "মানিক ভাই নিশ্চয়ই কম্যুনিস্ট বিরোধী ছিলেন। কেননা কম্যুনিস্ট দুনিয়ার একদলীয় শাসন এবং বাক্‌স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অনুপস্থিতি তার মর্মপীড়ার কারণ ছিল ... কিন্তু তিনি ছিলেন আপোসহীন ভাবে গণতন্ত্রের সমর্থক।"[১৬৬]

ইত্তেফাক নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ থেকেই ভাসানী বিরোধী অবস্থান নেয়। কিন্তু দুই বছর আগেই পত্রিকাটি ভাসানীর প্রশংসা করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছিল। ১৯৫৫ সালের ২৪ মার্চের সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়, "পাকিস্তানের জন্য যেসব নেতা সর্বাধিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, আজিকার জীবিতদের মধ্যে মাওলানা ভাসানীর দান কাহারো অপেক্ষা কম নয় বরং অনেকের চেয়ে বেশী।" ঐ সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানের জনগণের ওপর ভাসানীর অপূর্ব প্রভাবের কথা স্বীকার করা হলেও কাগমারী সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ভাসানীকে *ইত্তেফাক* 'লুঙ্গি সর্বস্ব নেতা', 'ভারতের চর' ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করে। মুসলিম লীগপন্থি ও রক্ষণশীল ধারার সংবাদপত্রের কাছে এই সমালোচনা বোধগম্য হলেও, *ইত্তেফাক*-এর মত প্রগতিশীল পত্রিকার কাছে এটি ছিল

Dhaka University Institutional Repository

অনভিপ্রেত। পত্রিকাটি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ইংরেজি অদ্যাক্ষর ‘NAP’ কে বিকৃত করে ‘Nehru Aided Party’ বলে সমালোচনা করে।[১৬৭]

আওয়ামী লীগের কাগমারী সম্মেলনের পর এবং পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন জারির আগে পূর্ব বাংলার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্যদের মধ্যে সৃষ্ট সংঘাত এবং আওয়ামী লীগ দলীয় ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর মৃত্যু। পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা গঠনের পর ১৯৫৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক আইন পরিষদের বৈঠক ডাকা হয়। স্পিকার, কৃষক শ্রমিক পার্টির আবদুল হাকিম আওয়ামী লীগের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। অধিবেশনের প্রথম দিনই আওয়ামী লীগ অনাস্থা প্রস্তাব আনলে তিঁনি দায়িত্ব থেকে সরে যেতে বাধ্য হন। তাঁর জায়গায় স্থলাভিষিক্ত আওয়ামী লীগ দলীয় ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী কৃষক শ্রমিক পার্টির কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন না।[১৬৮] বিষয়টি নিয়ে অধিবেশনের প্রথম দিন থেকেই প্রাদেশিক আইন পরিষদে সংঘাতের সূত্রপাত হয়। পরিষদের সদস্যদের পাশাপাশি বাইরের লোকদের অংশগ্রহণে পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। প্রেস গ্যালারিতে বাইরের লোকদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণে ২২ সেপ্টেম্বর সাংবাদিকগণ পরিষদ বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন।[১৬৯] পরদিন ২৩ সেপ্টেম্বর শাহেদ আলী আক্রান্ত ও নিহত হন। পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য কোনো সাংবাদিকের পরিষদ কক্ষে থাকার কথা নয়। তবে *ইত্তেফাক* পত্রিকার রিপোর্টার এম. আর. আখতার মুকুল সেদিন পেশাগত দায়িত্ব পালনে বিরত থাকলেও দর্শক গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন।[১৭০] সাংবাদিকদের পরিষদ বর্জনের সিদ্ধান্তের পরও পরবর্তী কয়েকদিন এই ঘটনার সচিত্র প্রতিবেদন পাওয়া যায় বিভিন্ন পত্রিকায়। আওয়ামী লীগ সমর্থক পত্রিকা *ইত্তেফাক* এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিরোধী দলের ওপর আরোপ করে ২৪ সেপ্টেম্বর শিরোনাম করে, ‘ডেপুটি স্পীকারের জীবনের উপর সুপরিকল্পিত হামলা : এতদিনে বিরোধী দলের জঘন্য কারসাজির প্রকাশ।[১৭১] ঐ দিন পত্রিকাটি বিরোধী দলের সমালোচনা করে আরও কিছু প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পরদিন ২৫ সেপ্টেম্বর *ইত্তেফাক* ২৩ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পাঁচটি ছবি প্রকাশ করে। এগুলো ছিল - মৃত্যু পথযাত্রী শাহেদ আলীর দুই কলামব্যাপী ছবি, কাঠের আসবাব ভেঙ্গে অস্ত্র তৈরিরত অবস্থায় ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া)’র দুই কলামব্যাপী ছবি, ‘সার্জেন্ট অ্যাট আর্মস’দের ওপর দুদু মিয়ার হামলার দুই কলাম ছবি, ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় বিরোধী দলীয় সদস্যদের আসন।[১৭২] শাহেদ আলীর মৃত্যুর পরদিন ২৭ সেপ্টেম্বর ‘মিঠেকড়া’ কলামে ‘ভীমরুল’ মন্তব্য করে, “শহীদ শাহেদ আলীর শাহাদাত জাতির রক্তকমলেই নহে, আশার শতদলেও ফুটিয়া থাকিবে। ঘাতকদের জিঘাংসার আঘাত তাঁহার জীবন প্রদীপ নির্বাপিত করিয়া দিলেও আদর্শের দীপালী অমলিনভাবে প্রজ্জ্বলিত থাকিবেই”।[১৭৩]

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ *সংবাদ*

ইত্তেফাক এর মত *সংবাদ* খসড়া সংবিধানের বিরোধিতা করে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। *সংবাদ* মূলত খসড়া সংবিধানে পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য এবং এর অগণতান্ত্রিক চরিত্রকে সামনে তুলে ধরে। ১৯৫৬ সালের ১৫ জানুয়ারি মওলানা ভাসানী পল্টনের জনসভায় খসড়া সংবিধানের সমালোচনা করে এটিকে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে হীন চক্রান্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, কেন্দ্র যদি পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবি না মানে তবে আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে হতে পারে। ভাসানীর বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে *সংবাদ* পরদিন 'খসড়া শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানের নির্যাতিত জনসাধারণকে শৃঙ্খলিত করার এক মহাষড়যন্ত্র' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[১৭৪] *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরী খসড়া সংবিধানের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করলে ১৬ জানুয়ারি, 'জনাব হামিদুল হকের সাফাই' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে তার সমালোচনা করে বলা হয়, "...তবে যে কোন কৈফিয়তই দেননা কেন জনাব চৌধুরী সাহেব এই খসড়া শাসনতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক বলিয়া বিশ্বাস করাইতে পারিবেন না।"[১৭৫] খসড়া সংবিধানের বিরোধিতার ক্ষেত্রে কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা ফজলুল হকের সমালোচনার বিষয়টিও সামনে চলে আসে। এ বিষয়ে ২৪ জানুয়ারি পত্রিকাটি শিরোনাম করে, 'যুক্তফ্রন্ট নেতা জনাব ফজলুল হক কর্তৃক পূর্ববঙ্গবাসীর প্রাণের দাবি পদদলিত'।[১৭৬] একইদিন পত্রিকাটি খসড়া সংবিধানকে 'অগণতান্ত্রিক ও পূর্ব বাংলার প্রতি অবিচারমূলক' আখ্যায়িত করে সংবাদ শিরোনাম করে।[১৭৭]

খসড়া সংবিধানের প্রতি পূর্ব বাংলার জনগণের মনোভাব তুলে ধরে সচেতনতার বিস্তারেও *সংবাদ* মুখ্য ভূমিকা রাখে। ২৭ জানুয়ারি পত্রিকাটি 'জনগণের প্রতিক্রিয়া' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে, "... যে স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি ইতোপূর্বে দোষত্রুটি সত্তেও ইহাকে গ্রহণীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহারাও সজাগ হইয়া ইহার বিরুদ্ধে তীব্রতম প্রতিবাদের কশাঘাত হানিতে শুরু করিয়াছেন।" এভাবে *সংবাদ* প্রায় প্রতিদিনই খসড়া সংবিধানের বিরোধিতা করে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করার মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক ও বাঙালি স্বার্থ বিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। *সংবাদ*-এর ভূমিকা ছিল অনেকাংশেই *ইত্তেফাক*-এর সাথে একই সারিতে এবং আওয়ামী লীগের সমর্থক।

এ. কে. ফজলুল হক পূর্ব বাংলার গভর্নর থাকা অবস্থায় ভুখা মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনায় *সংবাদ* সরকারের তীব্র নিন্দা করে। এই সমালোচনার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয় কেন্দ্র ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর *সংবাদ*-এর অভিনন্দন জানানোর মধ্যে দিয়ে। তবে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী মতবিরোধকে কেন্দ্র করে *সংবাদ*, *ইত্তেফাক*-এর তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপস্থাপিত হয়।[১৭৮] সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতিকে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় নিন্দা করে *সংবাদ*। *ইত্তেফাক* সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্যকে প্রাধান্য দিলেও *সংবাদ* ১৯৫৭ সালের ৭-৯ ফেব্রুয়ারি প্রতিদিন শিরোনাম করে কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়ে। ৭ ফেব্রুয়ারি পত্রিকাটি এ বিষয়ে শিরোনাম করে, "জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমস্ত শক্তি দিয়া সর্বপ্রকার সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করিব... সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সাধনই বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য: সামরিক চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তান শক্তিশালী হয় নাই। আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের পথ অনুসরণ করিবে বলিয়া মন্তব্য।" একইদিন *সংবাদ* ভাসানীর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। ভাসানী জোটনিরপেক্ষতার প্রতি তার নিজস্ব অবস্থান তুলে ধরে বলেন, "...যত কঠিন বাধাই আসুক না কেন আমি পাকিস্তানের জনগণের প্রকৃত কল্যাণের জন্য স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির জন্য সংগ্রাম করিয়া যাইব।"

এভাবে কাগমারী সম্মেলনের সময় থেকেই *সংবাদ* আওয়ামী লীগের পরিবর্তে ভাসানীর সমর্থক হয়ে ওঠে। তবে *ইত্তেফাক*-এর মত সংবাদও আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ বিরোধের বিষয়টি অস্বীকার করে। ভাসানীর প্রতি সমর্থনের বিষয়টি উল্লেখ করে পত্রিকাটি ১১ ফেব্রুয়ারি প্রথম পৃষ্ঠায় 'অপপ্রচার' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ভাসানীর প্রতি অপপ্রচারের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উল্লেখ করে বলা হয়:

> ...সাম্প্রতিক পরস্পর বিরোধী সংবাদ ও মতবিরোধ হইতে কায়েমী স্বার্থের বাহনগুলি মনে করিয়াছে যে, আওয়ামী লীগ ভাঙ্গনের সম্মুখীন হইয়াছে এবং এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য তাহারা পুনরায় বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টায় মাতিয়াছে।... তাহারা জানে যে মওলানা সাহেবই আওয়ামী লীগের বিবেকের প্রতিনিধিত্ব করিয়া আছিয়াছেন এবং তিনিই জনসাধারণের অন্যতম আশা ভরসার স্থল। তাঁহাকে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রমাণ করিতে পারিলেই গণতান্ত্রিক সংগঠন হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ দুর্বল হইয়া পরিবে।[১৭৯]

১৯৫৭ সালের ১৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানকে লেখা একটি পত্রে ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদের মাধ্যমে এই পত্র সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের কাছে পৌঁছানোর আগেই *সংবাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে যায়।[১৮০] কাগমারী সম্মেলনের পর আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে আসেন ভাসানী এবং প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)। ১৯৫৭ সালের ২৫-২৬ জুলাই ঢাকার রূপনগর সিনেমা হলে গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন *সংবাদ* সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী। অন্যান্য পত্রিকা নতুন

Dhaka University Institutional Repository

এই দলের আনুগত্য ও দেশপ্রেম সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেও *সংবাদ* নতুন দলকে স্বাগত জানায়।[১৮১] এ পর্যায়ে *সংবাদ* হয়ে ওঠে দলটির সমর্থক। পত্রিকাটি ন্যাপকে পাকিস্তানের বৃহত্তম অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসেবে দাবি করে। *সংবাদ* সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী ও প্রকাশক আহমেদুল কবীর ন্যাপ-এ যোগদান করেন। ন্যাপ-এর প্রতি সমর্থন থেকে সাংবাদিক কে. জি. মুস্তাফা *ইত্তেফাক* ছেড়ে *সংবাদ*-এর বার্তা সম্পাদক পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১৮২] ন্যাপকে ভিত্তি করেই ১৯৫৭ সালের ৫ ডিসেম্বর গঠিত হয় 'সর্বদলীয় যুক্ত নির্বাচন সংগ্রাম পরিষদ'। *সংবাদ*-এর জহুর হোসেন চৌধুরী ছিলেন এর অন্যতম সদস্য। তবে আওয়ামী লীগ দলীয় ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী নিহত হওয়ার পর *সংবাদ* সরকারি দল আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে।

৩.৩ *আজাদ*

১৯৫০ সালে পাকিস্তানের খসড়া সংবিধানের মূলনীতি নির্ধারণ কমিটির প্রতিবেদনের বিপক্ষে অবস্থান নেয় *আজাদ*। যদিও পত্রিকাটির মালিক মওলানা আকরম খাঁ এই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন কিন্তু *আজাদ* কমিটির প্রতিবেদনের সমালোচনা করে পরপর কয়েকদিন সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়ে *আজাদ* মন্তব্য করে যে, এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে পরিণত হবে।[১৮৩] ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণয়নের আগে থেকেই *আজাদ* সম্পাদকীয়তে সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে। কিন্তু পত্রিকাটি শেষ পর্যন্ত সংবিধানের ধর্মীয় দিকটিকেই সমর্থন করে সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে অবস্থান নেয়। ১৯৫৪ সালের ২৪ এপ্রিল 'সাম্প্রদায়িক বনাম অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে, "বস্তুতঃ দেশে অতঃপর সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান থাকিবে না অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান কায়েম হইবে, পাকিস্তানীরা এই প্রশ্নের মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"[১৮৪] এই সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটি স্বীকার করে নিয়েছে যে, তখন পর্যন্ত পাকিস্তানে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব ছিল।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পরাজিত মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভাঙ্গনে তৎপর হয়। যুক্তফ্রন্ট ভুক্ত দলগুলোর মধ্যে অনৈক্য বিষয়টিকে সহজ করে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের সদস্য নির্বাচন নিয়ে ফজলুল হকের সাথে আওয়ামী লীগের মতানৈক্য তৈরি হয়। ১৯৫৪ সালের মে মাসে মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত ফজলুল হক সরকারি সফরে কলকাতা যান এবং সেখানে বিভিন্ন সভায় যে বক্তৃতা দেন তার মূল বক্তব্য দাঁড়ায়- "রাজনৈতিক কারণে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে থাকলেও বাঙালির শিক্ষা সংস্কৃতি এবং বাঙালিত্বের যে

Dhaka University Institutional Repository

একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে তা দুটি বাংলায়ই বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও বর্তমান থাকবে।"[১৮৫] এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ফজলুল হকের বিরুদ্ধে ভারতের সাথে আঁতাতের অভিযোগ উত্থাপন করেন। *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার সংবাদদাতা জন. পি. কালাহানের মিথ্যা[১৮৬] প্রতিবেদনের বিরোধিতা করেন ফজলুল হক। কিন্তু কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ শাসক গোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকে এবং দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে *আজাদ* মুসলিম লীগের সকল কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দিয়ে একাধিক সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। পত্রিকাটি ৯২(ক) ধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বাতিল করে প্রদেশের উপর গভর্নরের শাসন জারিকে সমর্থন করে। ১৯৫৪ সালের ২ জুলাই এ. কে. ফজলুল হকের বিচার দাবি করে পত্রিকাটি 'প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এখানে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারকে সমর্থন করে বলা হয়:

> ...৯২(ক) ধারার প্রবর্ত্তন সাধারণ অবস্থায় কাম্য না হইলেও অবস্থা বিশেষে এরূপ কঠোর অবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইতে পারে।...কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব্ব পাকিস্তানে নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই ৯২(ক) ধারা প্রবর্ত্তনের মত চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।[১৮৭]

এভাবে কেবলমাত্র দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পত্রিকাটি পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি ব্যাহত করতে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের সকল কাজের বৈধতা দেয়। তবে *আজাদ* সংবিধান বিষয়ে মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করে। *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন সংবিধানের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। ঢাকায় সংবিধান কমিশনের সাথে এক বৈঠকে তিনি যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের প্রতি জোর দেন। ফলে *আজাদ* কর্তৃপক্ষের সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি। দীর্ঘদিন পরে হলেও সংবিধান প্রণয়ন করার বিষয়টিকে সাধুবাদ জানিয়ে ১৯৫৬ সালের ১০ জানুয়ারি 'শাসনতন্ত্রের খসড়া' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে *আজাদ* পূর্ব বাংলার জনগণের মৌলিক দাবি মেটানোর বিষয়ে যুক্তফ্রন্টের প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যর্থতা এবং পূর্ব বাংলার ওপর রেলওয়ের ঘাটটি বোঝা চাপানোর সমালোচনা করলেও শাসনতন্ত্রের ধর্মীয় দিকটিকে সমর্থন করার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক চরিত্রের প্রকাশ ঘটায়। সম্পাদকীয় কলামে উল্লেখ করা হয়:

> প্রস্তাবিত খসড়ায় বাতিল গণপরিষদের নৈতিক বিজয় ও জনদাবীর স্বীকৃতি সর্বত্র না হইলেও মাঝে মাঝে রহিয়াছে। উক্ত খসড়ায় এসলামী দিকটিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা একথা বলিতেছি।... পূর্ব্ববর্ত্তী মোছলেম লীগ, অন্তর্ব্বর্ত্তী আওয়ামী লীগ এবং বর্তমানের যুক্তলীগ-আলীগ নেতারা একটা জিনিসকে সবসময়ই আঁকড়াইয়া থাকিতে চান, তা হইল গদী এবং তাঁরা একটা নীতিতেই বিশ্বাস করেন, তা হইল ক্ষমতার রাজনীতি।[১৮৮]

Dhaka University Institutional Repository

আজাদ খসড়া সংবিধানকে কেন্দ্র করে ভারত বিরোধিতা এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষয়টি সামনে নিয়ে আসে। আবু হোসেন সরকার ১৯৫৬ সালের ১৭ জানুয়ারি কমিশনার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সভায় তৃতীয় পক্ষের দ্বারা হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সৃষ্টির বিষয়ে সচেতন থাকার আহ্বান জানালে *আজাদ* তার সমালোচনা করে এবং হিন্দুদের উত্থাপিত সকল অভিযোগকে কাল্পনিক বলে অভিহিত করে। একই সম্পাদকীয়তে কলকাতার *অমৃতবাজার পত্রিকা* হিন্দু সম্প্রদায় নির্যাতন সমস্যার সমাধান করতে না পারায় পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ সরকারের সমালোচনা করার প্রেক্ষিতে *আজাদ অমৃতবাজার পত্রিকা*'র সমালোচনা করে।[১৮৯]

মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকা হিসেবে *আজাদ* পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যের বিষয়টি সরাসরি স্বীকার না করলেও খসড়া সংবিধানকে সামনে রেখে কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করে। ১৮ ফেব্রুয়ারি 'ঐক্য ও অনৈক্য' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে *আজাদ* স্বীকার করে নেয় যে, ভাষার ব্যবধান পাকিস্তানের দুই অংশের ভৌগোলিক ব্যবধানকে আরও বড় করে তুলেছে। কারণ পূর্ব পাকিস্তানে উর্দুর কিছু কিছু চর্চা হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে সেটি একেবারেই হয় না। এই সমস্যা দূর করতে *আজাদ* ঢাকাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী এবং উভয় অংশে উর্দু বা বাংলা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করে।[১৯০] তবে বৈপরীত্য হলো এই সম্পাদকীয়তে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো অভিযোগ নেই বলে দাবি করলেও *আজাদ* সব সময় সংবিধানের ইসলামি দিকটিকেই সমর্থন করেছে। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়নের পর *আজাদ* সেটি বাস্তবায়নে শাসন ব্যবস্থার সংস্কার দাবি করে ১৯৫৬ সালের ৩০ মার্চ 'শাসন ব্যবস্থার সংস্কার' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে *আজাদ* পাকিস্তানকে একটি ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রতি জোর দিয়ে বলে:

> শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠনের কথা বলিতে আমরা কোন বিভাগ বিলুপ্তিকরণ বা একাধিক বিভাগের সংযুক্তি বা এখানে কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস বা ওখানে সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলিতেছি না... দেশের শাসনব্যবস্থার কাঠামোকে পূর্ব্বতন রূপে নাকি ইহাকে নূতনভাবে প্রকৃত এসলামী গণতান্ত্রিকরূপে গড়িয়া তোলা হইবে তাহ স্থির করা প্রয়োজন। ... এইভাবে শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন করিলে পাকিস্তান প্রকৃত এসলামী জমহুরিয়াতের পথে অগ্রসর হইবে।... বিশ্বে এসলামী জমহুরিয়ার আদর্শ স্থাপন করিয়া পাকিস্তান এক গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

সুতরাং *আজাদ* কেবলমাত্র পাকিস্তানের মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা বিবেচনা করে এই সম্পাদকীয়টি প্রকাশ করে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙালির জন্য একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের বিষয়টি *আজাদ* বিবেচনায় আনেনি। *আজাদ*-এর এই সাম্প্রদায়িক নীতির প্রকাশ পাওয়া যায় রক্ষণশীল সংগঠনগুলোর সাহিত্য সাংস্কৃতিক তৎপরতা পত্রিকাটিতে ব্যাপক প্রচারণা পাওয়ার মধ্য দিয়ে। যেমন - ১৯৫৮ সালের ১১ মে রওনক

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য সংস্থার প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হলে *আজাদ*-এ সভা সম্পর্কে প্রতিবেদনে মন্তব্য করে, "অতীতের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলা ভাষা হইতে হিন্দু ভাবধারার বাহক সংস্কৃত শব্দগুলো বর্জন করিয়া আমাদের রাষ্ট্রগত আদর্শের ভিত্তিতে ইহার সংস্কার সাধন সময়-সাপেক্ষ হইলেও পাক-বাংলা ভাষার রূপান্তর অবধারিত।"[১৯১]

এ পর্যায়ে কাগমারী সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে *আজাদ*-এর অবস্থান *ইত্তেফাক* পত্রিকার সাথে একই সমান্তরালে হলেও সেটি আওয়ামী লীগের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন দেওয়ার জন্য নয়, বরং মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকাটি যুক্তফ্রন্ট বিরোধিতা এবং তাদের নিজস্ব নীতি থেকেই এই অবস্থান গ্রহণ করেছিল। ১৯৫৬ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে পূর্ব বাংলার খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে *আজাদ* যুক্তফ্রন্ট সরকারের তীব্র সমালোচনা করে। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্র ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হওয়ার পর *আজাদ* যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গনে কিছুটা অবদমিত সন্তোষ জানায়।[১৯২] পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী মতবিরোধের প্রেক্ষিতে *আজাদ* সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতিকেই সমর্থন করে। এক্ষত্রে ভাসানীর পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসার প্রচ্ছন্ন হুমকিই মুখ্য ছিল। কাগমারী সম্মেলনে ভাসানী ঘোষণা করেছিলেন, "পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ যদি বন্ধ না হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে, যখন পূর্ব পাকিস্তান হয়ত পশ্চিম পাকিস্তানকে জানাইবে আসসালামু আলায়কুম।"[১৯৩] *আজাদ* ভাসানীর বক্তব্যকে লক্ষ্য করেই ১৯৫৭ সালের ১২-১৬ ফেব্রুয়ারি 'কাগমারী সম্মেলন' শীর্ষক পরপর ৫ টি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৫৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি 'কাগমারী সম্মেলন' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে ভাসানীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ উত্থাপন করে ভারত বিরোধিতার বিষয়টি সামনে নিয়ে এসে *আজাদ* মন্তব্য করে:

> আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গবেষণা করা অবশ্য আমাদের কাজ নয়। এই ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য শুধু এইটুকু যে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যারা পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি বদলাইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাঁরা পাকিস্তানকে কোথায় লইয়া যাইতে চান? পররাষ্ট্রনীতিতে নিরপেক্ষতা মানে বন্ধুহীনতা... এই বাদুড়নীতি আজ ভারতকে বন্ধুহীন করিয়াছে। ... কাজেই এই সময়ে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভারতের বাদুড় নীতির অনুসরণ করিতে যারা বলেন, পাকিস্তানের মঙ্গল তাঁদের কতটুকু কাম্য? ... পশ্চিম পাকিস্তান – বিদ্বেষে এমন কথা কোন পাকিস্তানী উচ্চারণ করিলে তাতে তার পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রীতি হয়ত প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের প্রতি ইহা রাষ্ট্রদ্রোহকর উক্তি ছাড়া আর কিছুই না।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সময় সমালোচনা করলেও *আজাদ* এ পর্যায়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন করতে না দেওয়ায় সোহরাওয়ার্দীর প্রশংসা করে। কাগমারীতে এ সময় একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পশ্চিমবঙ্গের কিছু অতিথি উপস্থিত থাকায় বিষয়টিকে *আজাদ* তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে। ১৪ ফেব্রুয়ারি 'কাগমারী সম্মেলন' শীর্ষক অপর সম্পাদকীয়তে *আজাদ* আরও তীব্র ভাবে ভাসানীর সমালোচনা করে। এ সময় বাঙালি জনগণের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে পত্রিকাটি পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকবর্গকেই সমর্থন জানায়। এমনকি এই অঞ্চলকে 'পূর্ব বাংলা' নামে অভিহিত করার ক্ষেত্রেও পত্রিকাটি তীব্রভাবে সংকীর্ণ মানসিকতা প্রদর্শন করে। সম্পাদকীয়তে *আজাদ* উল্লেখ করে:

> ... যারা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাকিস্তানের চাইতে ভারতীয় নীতির বেশী ভক্ত, যারা কাশ্মীরের দাবি তুলিলে মিথ্যা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিতে চায়, যারা সাহিত্য এবং তমদ্দুন বলিতে পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্য এবং তমদ্দুনকেই বুঝিয়া থাকে এবং যাদের মুখে পূর্ব্ব পাকিস্তান কথাটাই অসতর্ক মুহূর্ত ছাড়া উচ্চারিত হয় না এবং যারা 'পূর্ব্ব বাংলা' বলিতে অজ্ঞান, যুক্ত বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঢোল নিত্য এবং আহরহ: যাদের হাতে বাজে, তাঁদের কুচক্রই কাগমারীতে বিষাক্ত ফণা বিস্তার করিয়াছিল।[১৯৪]

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে *আজাদ* মন্তব্য করে, "মানিলাম একদল লোক পূর্ব্ব পাকিস্তানকে তার ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে ও করিতেছে। ... পশ্চিম পাকিস্তান তার জন্য দায়ী নয়।"[১৯৫] ১৬ ফেব্রুয়ারি *আজাদ* একই শিরোনামে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এ সম্পাদকীয়তে ভাসানীর সাথে সাথে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট নেতা এ. কে. ফজলুল হকের বিরুদ্ধেও ভারত তোষণের অভিযোগ আনা হয়। একই সাথে কাগমারীতে পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানানোরও সমালোচনা করা হয়। বস্তুত সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব প্রথম থেকেই ইসলাম রক্ষা ও ভারত বিদ্বেষের নামে 'পূর্ব বাংলা'য় পাকিস্তানি ভাবধারা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। *আজাদ* এই সাম্প্রদায়িক এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরোধী ধারাটিরই প্রতিনিধিত্ব করেছে সব সময়। কাগমারী সম্মেলনের পর ভাসানী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করলে *আজাদ* 'রাজনীতির হেরফের' শিরোনামে দলটির ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে সম্পাদকীয় বের করে। এতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার তীব্র সমালোচনা করা হয়। ঐ নির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাজিত হওয়ার পর *আজাদ* নিজেই দলটির সমালোচনা করে পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করেছিল। কিন্তু পুনরায় ২১ দফার সমালোচনা করে পত্রিকাটি ভাষা আন্দোলনসহ রাষ্ট্র পরিচালনার সকল পর্যায়ে মুসলিম লীগের ব্যর্থতা ও অন্যায়কেই বৈধতা দেয় এবং জনরায়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে ।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা ভাসানীকেই সামনে রেখে *আজাদ*-এর সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতি সমর্থনের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগ দলীয় ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে। *আজাদ* এ ঘটনায় সার্বিক ভাবে কৃষক শ্রমিক পার্টিকে সমর্থন দেয় এবং সামগ্রিক ঘটনার জন্য সরকারি দল আওয়ামী লীগকে দায়ী করে। ১৯৫৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর পত্রিকাটি 'বিপন্ন গণতন্ত্র' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে যেখানে সরকারের সমালোচনা করে বলা হয়, "একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নাই যে, ক্ষমতাসীন দল কেন্দ্র ও প্রদেশে ভিতর এবং বাহির হইতে দেশের গণতান্ত্রিক জীবনের ওপর হামলা শুরু করিয়া দিয়াছেন।"[১৯৬]

৩.৪ *মর্নিং নিউজ*

মুসলিম লীগের অপর সমর্থক পত্রিকা *মর্নিং নিউজ* কেএসপি'র পক্ষে অবস্থান নেয় এবং খসড়া সংবিধানকে পরিপূর্ণ সমর্থন দেয়। বিশেষ করে সংবিধানের ইসলামি দিকটিকে সমর্থন দিয়ে পত্রিকাটি *আজাদ*-এর মতই সাম্প্রদায়িক নীতির প্রতিফলন ঘটায়। খসড়া সংবিধানে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উপেক্ষা করা হলেও *মর্নিং নিউজ* বিষয়টিকে এড়িয়ে যায় এবং প্রদেশগুলোর জন্য সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসনের পাশাপাশি একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণাকে স্বাগত জানায়। খসড়া সংবিধানকে সমর্থন জানিয়ে *মর্নিং নিউজ* ১৯৫৬ সালের ১১ জানুয়ারি একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে জনগণকে এই সংবিধান সমর্থন করার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়:

> ... it appears to us that nothing very great has been lost in the sickening process of burgaining and accomodation. The Islamic character of the state is maintained ... A strong, if not very strong, centre has been envisaged, conceding, at the sametime, maximum autonomy to the provinces.[১৯৭]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকেই পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকাগুলো নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করত। সংবিধান পাশ করার বিষয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমর্থন প্রয়োজন ছিল বলে বিষয়টি তেমনভাবে সামনে আসেনি। তবে সংবিধান পাশের পরেই ১৯৫৬ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্য পরিস্থিতির অবনতির জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের তীব্র নিন্দা জানায় *মর্নিং নিউজ*। মুসলিম লীগ সমর্থক এই পত্রিকাটির অবস্থান *ইত্তেফাক* ও *সংবাদ*-এর সাথে একই সারিতে থাকলেও সেটি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে তখনকার দ্বিতীয় শক্তি আওয়ামী লীগের অবস্থানকে সমর্থন দানের জন্য নয় বরং যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব থেকেই এই অবস্থান নির্ধারিত হয়েছিল।[১৯৮] ফলে যুক্তফ্রন্ট

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের ভাঙ্গনের মাধ্যমে প্রদেশে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর বিষয়টিতে *মর্নিং নিউজ* কিছুটা অবদমিত সন্তোষ প্রকাশ করে। প্রদেশের পর কেন্দ্রেও আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হলে ১৯৪৭ সালের পর প্রথম বারের মত মুসলিম লীগ পাকিস্তানের শাসন থেকে বাদ পড়ে। তবে মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকা হিসেবে *মর্নিং নিউজ* তার নিজস্ব নীতি থেকেই সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে ভাসানীর পরিবর্তে *মর্নিং নিউজ* সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতিকে সমর্থন জানায়। তবে এর পেছনে আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থনের পরিবর্তে ভাসানীর প্রতি পত্রিকাটির বিরোধিতা কাজ করেছিল। ১৯৫৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কাগমারী সম্মেলনে ভাসানীর পূর্ব পাকিস্তানের ওপর শোষণ বন্ধ না হলে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রচ্ছন্ন হুমকির বিষয়টিই ছিল মুসলিম লীগ সমর্থক অন্যান্য পত্রিকার মত *মর্নিং নিউজ*-এর আক্রমণের মূল লক্ষ্য। ১১ ফেব্রুয়ারি *মর্নিং নিউজ* সম্পাদকীয় কলামে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ আনে মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে। তবে ১৯৫৭ সালের ২৫-২৬ জুলাই ঢাকায় 'নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন' শীর্ষক কনভেনশনের মাধ্যমে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হলে নতুন দলটির সরাসরি সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকে *মর্নিং নিউজ*। কনভেনশন উপলক্ষ্যে পত্রিকাটিতে লেখা হয়:

> This Convention of the representatives of democratic parties and groups and all of democratic elements – from both of the wings of Pakistan having reviewed the political, economic and social condition within the country and having realised the need for integrity of democratic forces within the country in order to consolidate the people of Pakistan into one strong and independent nation free from evils of communalism and provincialism, exploitation and imperialism, to ameliorate the economic conditions of the people and to establish by constitutional means democracy in the country and autonomy in the two wings of Pakistan hereby resolves to form a new party, dedicated to Pakistan and its people, and known as Pakistan National Awami Parti.[১৯৯]

একটি পর্যায়ে কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিরোধিতা করলেও আওয়ামী লীগ দলীয় ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর মৃত্যুর পর মুসলিম লীগ সরকার সমর্থক *মর্নিং নিউজ* সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণেই বিরোধী দল তথা কৃষক শ্রমিক পার্টির পক্ষ অবলম্বন করে।

৩.৫ ***পাকিস্তান অবজারভার***

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান অবজারভার প্রাথমিক পর্যায়ে সংবিধানের খসড়া মূলনীতির বিরোধী ছিল। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান রচনার লক্ষ্যে খসড়া মূলনীতি ঘোষণা করেন যেখানে একটি মাত্র রাষ্ট্রভাষা উর্দু এবং পৃথক নির্বাচনের মত বিতর্কিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্ব বাংলার শিক্ষিত সমাজ এর বিরুদ্ধে সচেতন হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের কামরুদ্দীন আহম্মদ এবং আতাউর রহমান খান, আর বিষয়টিকে সর্বাত্মক সমর্থন দেয় *পাকিস্তান অবজারভার*।

মূলনীতি কমিটির প্রস্তাবিত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও আন্দোলনকে একটি সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে গঠন করা হয় - Committee of Action for Democratic Federation. আবদুস সালাম (*পাকিস্তান অবজারভার*), মোহাম্মাদ মহিউদ্দিন ও মোহাম্মদ ইদ্রিস (*ইনসাফ*), তফাজ্জল হোসেন (*সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*) প্রমুখ এই সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার অফিস ছিল এর অস্থায়ী কার্যালয়। ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৯৫০ সালের ৪ ও ৫ নভেম্বর ঢাকায় একটি মহাসম্মেলন আহ্বান করা হয়। তাছাড়া ফেডারেশন সরকারি প্রতিবেদনের পাল্টা আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[২০০] তবে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে পত্রিকাটির নীতিতেও পরিবর্তন আসে।*পাকিস্তান অবজারভার* এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং খসড়া সংবিধানকে সমর্থন করে। তবে বিষয়টি অনেকাংশেই ছিল রাজনৈতিক মেরুকরণ ও ক্ষমতার পালাবদলের সাথে সম্পর্কিত। জন কালাহান ফজলুল হকের বক্তব্য বিকৃত করে প্রকাশ করায় ১৯৫৪ সালের ২৬ মে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে তিনি এর প্রতিবাদ করেন। *পাকিস্তান অবজারভার*-এ প্রকাশিত বিবৃতিতে ফজলুল হক বলেন, "East Pakistan should be an autonomous unit of Pakistan. This is our ideal; and we will fight for it, I never said for a moment that our ideal is Independence"[২০১] ১৯৫৪ সালের ২৯ মে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার ফজলুল হক মন্ত্রীসভা বাতিল করে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন জারি করলে *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকা বিষয়টিকে সমর্থন করে। ৩১ মে পত্রিকাটি এ বিষয়ে 'A Grave Emergency Exists' শিরোনামে মন্তব্য করেঃ

> Where as Governor General is satisfied that a Grave Emergency exists and theeby the security of East Bengal is threatened and that a situation has arisen in which the Government of East Pakistan Can't be carried on the accordance with the provisions of Government of India Act of 1935.[২০২]

তবে পরবর্তী কয়েকদিন পত্রিকাটি জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার ও দমনপীড়নের শিকার হওয়া যুক্তফ্রন্ট নেতা-কর্মীদের নিয়ে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে। *পাকিস্তান অবজারভার*-এর ১৯৫৪ সালের ১-১৫

Dhaka University Institutional Repository

জুনের সংবাদ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ৯২(ক) ধারা প্রবর্তনের পর প্রায় ১৬'শ নেতা-কর্মী গ্রেফতার হন। পত্রিকাটি ৯২(ক) ধারা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে অবস্থা নেয়। ১ জুন পত্রিকাটি একটি প্রতিবেদনে জন-অসন্তোষ বিষয়ে মন্তব্য করে, "General sense of disappointment and frustration prevails among the prople in the city since the imposition of 92-A in province."[২০৩] ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নাম পরিবর্তন করে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়ায় *পাকিস্তান অবজারভার* সিদ্ধান্তটিকে ইতিবাচক হিসেবে মূল্যায়ন করে। ১৯৫৫ সালের ২৪ অক্টোবর এ বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম ছিল, "Awami League open to non-Muslims non-denomination move accepted by overall majority."। ১৯৫৬ সালের ৫ মার্চ ফজলুল হক পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদ লাভে সক্ষম হন এবং তার দল খসড়া সংবিধানকে সমর্থন করলে *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গিও কৃষক শ্রমিক পার্টির প্রতি পরিবর্তিত হয়। পত্রিকাটির এই নীতি ছিল এর মালিকানার সাথে সম্পর্কিত – মালিক হামিদুল হক চৌধুরী ছিলেন শাসনতন্ত্র প্রণেতাদের অন্যতম। সুতরাং জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে পত্রিকাটি নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শকে গুরুত্ব দেয়।

১৯৫৬ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটলেও কৃষক শ্রমিক পার্টির সমর্থক পত্রিকা *পাকিস্তান অবজারভার* এ. কে. ফজলুল হকের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। প্রায় সব কয়টি পত্রিকা ৪ সেপ্টেম্বর ভুখা মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটিনার সমালোচনা করলেও *পাকিস্তান অবজারভার* এর পেছনে আওয়ামী লীগের ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করে 'সুপরিকল্পিত' ও 'অদৃশ্য হাতের কারসাজি' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। মূলত *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার আওয়ামী লীগ বিরোধী নীতি এক্ষত্রে ভূমিকা পালন করে। কৃষক শ্রমিক পার্টি মন্ত্রিসভার পতন এবং আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হলে পত্রিকাটি ১৯৫৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর একটি সমালোচনামূলক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে যেখানে মন্তব্য করা হয়, "In fact, the downfall of the government signifies the triumph not of the popular will but of intrigue."[২০৪]

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী বিরোধকে পত্রিকাটি দেশপ্রেমের পরিবর্তে ক্ষমতার প্রতি ভালোবাসা হিসেবে সমালোচনা করে। এ বিষয়ে তৎকালীন সময়ে আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষক শ্রমিক পার্টি সমর্থিত পত্রিকাটি ১০ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৭) তার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে:

> The details of the crisscross of Awami League's politics however must have convinced Mr. Suhrawardy that the elements to whom he thought it necessary to hitch his waggon to gain power are now giving him much troubles in all conceivable ways. Such a consequence is

Dhaka University Institutional Repository

inevitable when the dominant factor is love of power as distinct from real service to the country.

তবে ন্যাপ গঠিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগের প্রতি বিরোধিতা থেকে পত্রিকাটি ন্যাপকে সমর্থন জানায়। ন্যাপ ভিত্তিক 'সর্বদলীয় যুক্ত নির্বাচন সংগ্রাম পরিষদ'-এর অন্যতম সদস্য ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক আবদুস সালাম। কৃষক শ্রমিক পার্টির প্রতি পত্রিকাটির এই সমর্থন অব্যাহত থাকে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর মৃত্যুর সময়েও। সামগ্রিক ঘটনার জন্য সরকারি দল আওয়ামী লীগকে দায়ী করে পত্রিকাটি ১৯৫৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর শিরোনাম করে, "Opposition Pushed out of Assembly: Clash with police in Chamber, Deputy Speaker and M.P.A's injured"[২০৫]

এমপিএ'দের তালিকায় পত্রিকাটি ইউসুফ আলী চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক, পনিরুদ্দীন এবং আবদুল লতিফ বিশ্বাসের নাম উল্লেখ করে যারা সবাই ছিলেন আওয়ামী লীগ বিরোধী পক্ষের। ঐ দিনই সরকারের সমালোচনা করে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে *পাকিস্তান অবজারভার* মন্তব্য করে, "The question has seriously arisen in the minds of many educated citizens if we are at all fit for Parliamentary democracy or if any set of men can be trusted with Governmental power."[২০৬]

৩.৬ *মিল্লাত*

১৯৫৬ সালে সংবিধান প্রণয়ন করার সময় *মিল্লাত* পত্রিকার মালিক ছিলেন কৃষক শ্রমিক পার্টি নেতা ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) ফলে পত্রিকাটি সার্বিক ভাবে খসড়া সংবিধানকে সমর্থন করে। পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নেও পত্রিকাটি ছিল বামপন্থি আদর্শের সমর্থক ফলে পত্রিকাটি সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করাকে সমর্থন করে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। তবে পরবর্তী সময় পত্রিকাটির মালিকানা হস্তান্তর হয় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার কাছে এবং এ সময় পত্রিকাটি হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগের সমর্থক। সরকারি দল আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে *মিল্লাত* ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী নিহত হওয়ার জন্য কৃষক শ্রমিক পার্টিকে সরাসরি দায়ী করে ১৯৫৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর শিরোনাম করে, 'বিরোধী দলের সংঘবদ্ধ আক্রমণে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী মারাত্মক রূপে আহত ... সরকার পক্ষের অপূর্ব ধৈর্যশীলতা'।[২০৭] শিরোনামের পাশাপাশি সামগ্রিক ঘটনার জন্য বিরোধী দলকে দায়ী করে *মিল্লাত* পরদিন ২৫ সেপ্টেম্বর 'শিরে সর্পাঘাত' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে যেখানে ভবিষ্যৎ অগণতান্ত্রিক শাসনের ব্যাপারে সতর্ক করে বলা হয়, "বিরোধী দলের

Dhaka University Institutional Repository

কথা হইতেছে, ক্ষমতায় যদি তাঁরা না থাকেন, তাহা হইলে দেশে গণতন্ত্রের কোন দরকার নাই। সেই অবস্থায় ১৯৩ ধারার অগণতান্ত্রিক শাসন অথবা অন্য যে কোন রকম স্বৈরাচারী ব্যবস্থা মানিয়া নিতেও সম্মত।"[২০৮]

অগণতান্ত্রিক শাসনের বিষয়ে পত্রিকাটির কথা কিছুদিনের মধ্যেই সত্য প্রমাণিত হয় ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন জারির মধ্য দিয়ে।

৩.৭ *ইত্তেহাদ* (ভাসানী)

মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত *ইত্তেহাদ* মূলত ন্যাপ-এর মুখপত্র হিসাবে ভূমিকা রাখে। পত্রিকাটি 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়ার যেমন প্রশংসা করে তেমনি খসড়া সংবিধানের বিভিন্ন নিবর্তনমূলক ধারার বিপক্ষেও প্রচারণা চালায়। পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে পত্রিকাটি ভাসানীকে সমর্থন করে বিভিন্ন প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পত্রিকাটি সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করার বিষয়টি সমর্থন করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। পাশাপাশি পত্রিকাটির অনেক সংবাদ ছিল সাংবাদিকতার নীতি ও আদর্শ বিবর্জিত। এ প্রেক্ষিতে *পাকিস্তান অবজারভার* সম্পাদক আবদুস সালাম ও প্রকাশক হামিদুল হক চৌধুরীকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেও *ইত্তেহাদ* সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। যেমন – ১৯৫৬ সালের ২৭ অক্টোবর 'বর্ণচোরা গৃহশত্রু' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার মালিক ও সম্পাদককে পূর্ব বাংলার রাজনীতি থেকে বিতাড়িত বলে উল্লেখ করা হয়। আবদুস সালাম এবং হামিদুল হক চৌধুরী খসড়া সংবিধানের এবং পাশ্চাত্য ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক ছিলেন। *পাকিস্তান অবজারভার* মিসরের সুয়েজ খাল জাতীয়করণের সমালোচনা করায় *ইত্তেহাদ*, *পাকিস্তান অবজারভার*-কে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের দালাল হিসেবে অভিহিত করে।[২০৯] কাগমারী সম্মেলনের পর *ইত্তেহাদ* কিছুটা আপোশমূলক সংবাদ পরিবেশন করে। যেমন ১৯৫৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পত্রিকাটি শিরোনামে উল্লেখ করে যে, মওলানা ভাসানী কখনও পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি প্রদান করেননি। পাশাপাশি পত্রিকাটি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের একটি বিবৃতি প্রকাশ করে যেখানে মওলানা ভাসানীর বক্তব্য বিকৃত করায় *আজাদ* ও *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার সমালোচনা করা হয়।

৩.৮ *ইনসাফ*

Dhaka University Institutional Repository

ইনসাফ পাকিস্তানের সংবিধান রচনার মূলনীতির খসড়া তৈরির জন্য গঠিত মূলনীতি কমিটির প্রতিবেদনের বিরোধিতা করে। পত্রিকাটি মুলনীতি কমিটির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে সমর্থন দিয়ে বিভিন্ন সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ফলে তৎকালীন সরকার বিভিন্নভাবে পত্রিকাটির ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

পত্রিকাগুলোর এ ধরনের পারস্পারিক শ্রদ্ধা বিবর্জিত আচরণ তৎকালীন অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির ইঙ্গিত বহন করে।

মূল্যায়ন

পাকিস্তান সৃষ্টির আগে থেকেই লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা পত্র-পত্রিকায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠার যে দাবি তুলেছিলেন সেটি ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের প্রবলভাবে উৎসাহিত করে। ১৯৪৮-৫২ কালপর্বে বাংলার পক্ষে যে সব যুক্তি বারবার উচ্চারিত হয়েছে তার প্রায় সবই এ সময় ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের পাতায় ছিল। এ চেতনা কালক্রমে সাংবাদিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের হাত দিয়ে রাজনৈতিক চেতনায় রূপান্তরিত হয়ে পরিস্ফুট আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। এর অনিবার্য পরিণাম বাঙালি জাতীয়তাবোধের পথে উত্তীর্ণ, যা পরিশেষে ভূখণ্ড চেতনার বিকাশ নিশ্চিত করেছে।

মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকা *মর্নিং নিউজ* এবং *সংবাদ* ভাষা আন্দোলন বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে। পত্রিকা দুটোর সংবাদ ও সম্পাদকীয় ছিল আন্দোলন সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক। এই দুটো পত্রিকা বাদ দিলে বলা যায় যে অন্যান্য পত্রিকা একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে। পত্রিকাগুলো ভাষা আন্দোলনে কেবল জনমতকেই সংগঠিত করেনি তারা ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণও করেছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহসহ অন্যান্য বুদ্ধিজীবী পত্র-পত্রিকায় বাংলা ভাষার পক্ষে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন সেটি নিঃসন্দেহে ভাষা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তাঁরা বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানগর্ভ যুক্তি উপস্থাপন করেছেন সেটি ভাষা আন্দোলনসহ বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনে *আজাদ* পত্রিকার ভূমিকা ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। দেশ ভাগের আগে পত্রিকাটির সম্পাদকীয় নীতি ছিল দ্বিমুখী কারণ এতে বাংলা ভাষার পক্ষ ও বিপক্ষ এই দু'পক্ষের বক্তব্যই উপস্থাপিত হয়। ফলে ভাষা প্রশ্নে *আজাদ*-এর নিজস্ব কোন বক্তব্য ছিল না। দেশ ভাগের পরও *আজাদ* এ নীতি বজায় রাখে। সুতরাং *আজাদ* রাষ্ট্র ভাষা বাংলার পক্ষে জোরালো ভূমিকা পালন করেছিল এ কথা বিনা বাক্যে বলা যায় না। বরং অনেকাংশেই পত্রিকাটি উর্দুর পক্ষ নিয়েছিল। *আজাদ*-এর এই ভূমিকা ভাষা আন্দোলনের পুরো সময় জুড়েই দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে আন্দোলন সম্পর্কিত খবরাখবর পত্রিকাটিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়নি। পত্রিকাটি সমগ্র পাকিস্তানের পরিবর্তে পূর্ব বাংলার ভাষা হিসাবে বাংলার দাবি কিছু কিছু সম্পাদকীয়তে সমর্থন করলেও একই সাথে পত্রিকাটি ভাষা আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত বলেও মন্তব্য করে। কিন্তু ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনাবলি তুলে ধরে এবং ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে পত্রিকাটি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে। বস্তুত ২১ ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণ এবং ছাত্র নিহতের ঘটনাটি এতটাই আকস্মিক ছিল যে সরকার সমর্থক পত্রিকাগুলোর পক্ষেও জনমতের বাইরে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। তবে মার্চ মাস থেকেই পত্রিকাটির নিরপেক্ষতা মুসলিম লীগ সরকারের অধীনে শিথিল হয়ে যায়। পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, *আজাদ* ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলা ভাষার পক্ষে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এরপরই পত্রকাটির নীতিতে পরিবর্তন হয়। ভাষা আন্দোলনকে *আজাদ* সব সময় সরকার বিরোধী আন্দোলন হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে। জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে *আজাদ* নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। পত্রিকাটির মালিক মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের সভাপতি। ফলে দলীয় স্বার্থের ঊর্দ্ধে *আজাদ*-এর স্বার্থকে নেয়া সম্ভব হয়নি। সংবাদ প্রকাশের ধরন বিশ্লেষণ করে বলা যায়, *আজাদ* নীতিগতভাবে ভাষা আন্দোলনের পরিবর্তে ব্যবসায়িকভাবে পত্রিকার প্রচার এবং ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহার করে সমর্থন আদায় তথা সাম্প্রদায়িক নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়।

সার্বিক ভাবে বলা যায়, দেশ ভাগ পরবর্তী পূর্ব বাংলার ঢাকা থেকে যেসব বাংলা পত্রিকা বের হয় সেগুলোর অধিকাংশের মালিক ছিলেন কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক। ভাষা আন্দোলনের সময় পত্রিকার নীতিতেও এর প্রভাব পড়ে। *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরী ছিলেন মুসলিম লীগ বিরোধী। ফলে ভাষা প্রশ্নে পত্রিকাটির নীতিতে এর প্রভাব পাওয়া যায়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো যতটা না সাংবাদিকতার নীতি ও সততার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি পরিচালিত হয়েছে রাজনৈতিক নীতি ও উদ্দেশ্যের প্রভাবে। বাঙালি জাতিত্বের পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবিভাজ্যতার বিরুদ্ধেও ঢাকার পত্রিকাগুলো তাদের নিজস্ব মতামত তুলে ধরতে শুরু করে। মূলত হিন্দু লেখকদের প্রভাব মুক্ত হয়ে ধর্মীয় ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র ধারা খুঁজে বের করার চেষ্টা এ সময় করা হয় যা ছিল সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের রাজনীতির ইতিহাসে ১৯৫৪-৫৮ পর্যন্ত সময়টি ছিল ঘটনাবহুল। এসময় ক্ষমতার ভাগ বণ্টন নিয়ে বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে একদিকে যেমন সমঝোতা হয়েছে তেমনি দলাদলি ভাঙ্গন ইত্যাদি ঘটনাও ঘটেছে। এসব রাজনৈতিক ঘটনার আবর্তন বাঙালি জনগণের মধ্যে পৃথক জাতিসত্তা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ তৈরিতে ভূমিকা রাখে যেটির ওপর ভিত্তি করে বিকশিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে জনগণকে আরও সচেতন করে তোলা, বিভিন্ন ভাবে জনমত সংগঠন করার বিষয়টি সম্ভব হচ্ছিল না। এসব ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঢাকার সংবাদপত্রগুলোতেও লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে পত্রিকাগুলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং নৈতিকতা ও সাংবাদিকতার আদর্শের পরিবর্তে রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা অনেক বেশি পরিচালিত হয়েছে।

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো ছিল পূর্ব বাংলার জাতীয় বুর্জোয়া বিকাশের পথে একটি বাধা। এখানকার উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণি এই কাঠামো ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায় তার নিজস্ব বিকাশের স্বার্থেই। ফলে বাঙালির মুক্তি আকাঙ্ক্ষায় সংগঠিত এখানকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একটি সমন্বিত রূপ পায় জনগণ এবং এই বিকাশকামী জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির শ্রেণিস্বার্থের মাধ্যমে। তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ছিলেন এই বিকাশকামী জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিরই প্রতিভূ এবং তাঁর পত্রিকা *ইত্তেফাক* ছিল এই শ্রেণিরই অঘোষিত মুখপত্র।[২১০] ফলে পাকিস্তান আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনসমূহে *ইত্তেফাক* একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনও এর ব্যতিক্রম ছিল না। নির্বাচনের আগে পত্রিকাটি যুক্তফ্রন্টের পক্ষে লিখতে থাকে। বিশেষ করে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের মাধ্যমে *ইত্তেফাক* পাঠকদের আস্থা অর্জন করে এবং 'মোসাফির'-এর এসব সচেতন পাঠকরাই যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে ভূমিকা রাখেন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনা। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের রায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের ইঙ্গিত বহন করে। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বাঙালি জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য মুসলিম লীগের অবস্থান এবং বাংলা ভাষার পক্ষে নিহতের ঘটনা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন বাঙালিদের ভেতর অসন্তোষ তৈরি করে। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবির মধ্যে এসব নিহিত ছিল। সুতরাং যুক্তফ্রন্ট ও ২১ দফা দাবির পক্ষে কাজ করার মাধ্যমে *ইত্তেফাক* বাঙালি জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশেই কাজ করেছে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর আবির্ভাব ঘটে এবং বাঙালির পরবর্তী স্বাধিকার আন্দোলনে পত্রিকাটি জনগণের মুখপাত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভাঙ্গন এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক শক্তি ও সম্ভাবনার উত্থান মুসলিম লীগ সমর্থক *আজাদ* এর নীতিকে প্রভাবিত করেছিল। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব বাংলা বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার হলেও *আজাদ* সরাসরি কখনো এজন্য শাসক দল মুসলিম লীগের দায়িত্বকে স্বীকার করেনি। বরং ভাষা আন্দোলনে বাঙালি স্বার্থ বিরোধী অবস্থানের পর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনেও পত্রিকাটি মুসলিম লীগ ও এর সাম্প্রদায়িক চরিত্রকে সমর্থন করে গেছে। পত্রিকাটির মালিক মওলানা আকরম খাঁ মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি *আজাদ* এর এই ভূমিকার পেছনে কারণ হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন ছিলেন এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের একজন প্রার্থী। *সংবাদ* পত্রিকাটিও ছিল মুসলিম লীগের সমর্থক। তবে *আজাদ*-এর সিরাজউদ্দিন হোসেন এবং *সংবাদ*–এর জহুর হোসেন চৌধুরী বিভিন্ন ভাবে যুক্তফ্রন্টকে সহায়তা করেন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে বিভিন্ন মেরুকরণ হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর মালিকানার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক হওয়ায় পত্রিকাগুলোর মধ্যেও মতাদর্শগত পার্থক্য তৈরি হয়। সার্বিকভাবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে শুরু করে ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারি করার আগে পর্যন্ত *ইত্তেফাক* - আওয়ামী লীগের, *পাকিস্তান অবজারভার* - কেএসপি তথা কৃষক শ্রমিক পার্টির এবং *মর্নিং নিউজ* ও *আজাদ* মুসলিম লীগকে সমর্থন করে। নির্বাচনের পর *পাকিস্তান অবজারভার*-এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় এবং পঞ্চাশ এর দশক থেকে পত্রিকাটি রাজনৈতিক সাংবাদিকতার সূত্রপাত ঘটায়। তবে নির্বাচনের আগে যুক্তফ্রন্ট বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও ১৯৫৪ সালের পর থেকে *সংবাদ* আওয়ামী লীগের এবং পরবর্তী সময়ে কাগমারী সম্মেলন ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতিকে কেন্দ্র করে পত্রিকাটি মওলানা ভাসানী ও তার দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সমর্থক হয়ে ওঠে। একইভাবে *মিল্লাত* কেএসপি'র সমর্থক থেকে মালিকানা হস্তান্তরের পর থেকে আওয়ামী লীগের সমর্থক হয়ে ওঠে। *আজাদ* ও *মর্নিং নিউজ* তাঁদের সুবিধা ভোগী চরিত্রের সুযোগ নিয়ে কখনো আওয়ামী লীগ আবার কখনো কেএসপি'র সাথে একই সমান্তরালে অবস্থান নিলেও তাঁরা মূলত যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকাকালীন ও যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার পর আওয়ামী লীগ বিরোধী অবস্থান নেয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারি পর্যন্ত *আজাদ* পত্রিকার দুটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়,

প্রথমত, শাসন ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর ইসলামিকরণের প্রতি সমর্থন অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক নীতির প্রকাশ। পত্রিকাটি সবসময় বলে এসেছে পূর্ব বাংলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো অভিযোগ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত, মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন।

রাজনৈতিক আদর্শগত দ্বন্দ্বের পাশাপাশি ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বও একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে ঢাকার পত্রিকাগুলোর সম্মিলিত প্রয়াসের পথে ছিল অন্তরায়। *ইত্তেফাক*-এর প্রকাশনা ১৯৫৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য পত্রিকাটি সরাসরি *আজাদ* ও মুলসিম লীগকে দায়ী করে। অবশ্য *আজাদ* ও মওলানা আকরম খাঁ-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের সময় থেকেই পাওয়া যায়। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের (সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম) সমর্থক হওয়ায় *ইত্তেহাদ* পত্রিকাকে পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগ সরকার কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরের অনুমতি দেয়নি। আবার হামিদুল হক চৌধুরী মুসলিম লীগ থেকে বের হয়ে গেলে তার পত্রিকা *পাকিস্তান অবজারভার* কিছুদিন নিষিদ্ধ থাকে। এমনকি *পাকিস্তান অবজারভার* বন্ধ হয়ে যাওয়ায় *মর্নিং নিউজ* অভিনন্দন জানিয়েছিল। পত্রিকাগুলোর এই বিভক্তি থেকেই স্পষ্ট যে তাঁরা জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়নি। কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে একটি পত্রিকা সমর্থন করলেও পরবর্তী সময় সেটি নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে এর বিরোধিতা করেছে।

পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বিভিন্ন ইসলামি ধারার বিরোধিতা করার মাধ্যমে *ইত্তেফাক* বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে। তবে কৃষক শ্রমিক পার্টির সাথে আওয়ামী লীগের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে বলা যায় আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে *ইত্তেফাক*-এর এই অবস্থান গ্রহণে দলীয় আদর্শ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ ধারণা আরও শক্ত ভিত্তি পায় কেন্দ্র ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর পররাষ্ট্রনীতির প্রেক্ষিতে সোহরাওয়ার্দীকে সমর্থন ও ভাসানীর বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে। বিপরীতে *আজাদ* ও *মর্নিং নিউজ* সংবিধানের ইসলামি দিকটিকে সমর্থন করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিপক্ষে অবস্থান নেয়। এর আগে কেবলমাত্র দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই পত্রিকাটি পূর্ব বাংলার স্বার্থবিরোধী ৯২(ক) ধারা প্রবর্তনকে সমর্থন করে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তকেই মেনে নেয়। *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৈধুরী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সাথে জড়িত হওয়ায় এবং *মিল্লাত*-এর মালিক ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা হওয়ায় পত্রিকাদ্বয় খসড়া সংবিধানকে সমর্থন জানায়।

পূর্ব বাংলার জাতীয় রাজনীতিতে ভারত বিরোধিতা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। *আজাদ* ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর থেকেই ফজলুল হককে কেন্দ্র করে বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে। এমনকি প্রগতিশীল ও

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের *ইত্তেফাক* এর বাইরে ছিল না। *আজাদ* ও *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার সাথে একই কাতারে দাঁড়িয়ে *ইত্তেফাক* কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর বক্তব্যের পেছনে ভারত ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসে। কাগমারী সম্মেলনের বিষয়ে *ইত্তেফাক* জাতীয় ইস্যুতে দলীয় সংহতি রক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়। আওয়ামী লীগ গঠিত হওয়ার সময় এবং পরবর্তী পর্যায়ে অনেক বামপন্থি নেতাকর্মী দলটিতে ঢুকে পড়ে। তফাজ্জল হোসেন ছিলেন এই অংশটির বিরোধী যেটি *ইত্তেফাক* পত্রিকায় তার লেখনী থেকে উঠে আসে। অন্যদিকে *আজাদ* ও *মর্নিং নিউজ* মুসলিম লীগের রাজনৈতিক আদর্শ অনুযায়ী প্রথাগত ভারত বিরোধিতার পক্ষেই অগ্রসর হয়। মূলত পত্রিকা দুটি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের পর থেকেই পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বার্থের বিপক্ষে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল।

ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর হত্যার ঘটনা পাকিস্তানের পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্ববহ, তেমনি শিবিরাশ্রয়ী সাংবাদিকতার একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত হিসেবেও উল্লেখযোগ্য। আইন পরিষদের অভ্যন্তরে, আইন প্রণেতার আঘাতে স্পিকারের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তৎকালীন অরাজক ও অসহিষ্ণু রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সংবাদপত্র অঙ্গনেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।[২১১] সংবাদপত্রগুলোর সংবাদ ও সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ করে বলা যায় আক্ষরিক অর্থেই ঢাকার পত্রিকাগুলো মূল ঘটনাকে আড়াল করে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ থেকেই ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করে। *ইত্তেফাক*, *মিল্লাত* এবং *সংবাদ* এই ঘটনার জন্য বিরোধীদল তথা কৃষক শ্রমিক পার্টিকে দায়ী করে। আওয়ামী লীগ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে *পাকিস্তান অবজারভার*, *আজাদ* এবং *মর্নিং নিউজ* সরকারি দলকে দায়ী করে। রাজনৈতিক আদর্শগত কারণে পত্রিকাগুলোর এই বিভক্তি নিঃসন্দেহে জাতীয় অনৈক্যের পরিচায়ক যা অগণতান্ত্রিক শক্তির ক্ষমতায় আরোহনের পথ সুগম করে। এভাবে সংসদীয় রাজনীতির চরম নৈরাজ্যকর মুহূর্তে রাজনৈতিক আদর্শগত দ্বন্দ্বের কারণে ঢাকার পত্রিকাগুলো গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল।

সার্বিকভাবে বলা যায় ১৯৪৭-৫৮ কালপর্বে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালি জনগণকে আরও সচেতন করে তোলা এবং বিভিন্ন ভাবে জনমত গড়ে তোলার বিষয়টি সম্ভবপর হচ্ছিল না। ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলো সরাসরি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক হওয়ায় জনমত গঠনে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। সাধারণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থের বাইরে জাতীয়তাবাদী চেতনা দ্বারা পরিচালিত না হওয়ায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্রের ভূমিকার ক্ষেত্রে নেতিবাচক উদাহরণ তৈরি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখার ব্যর্থতা এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলোর অনৈক্য ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন জারির পথ সুগম করেছিল।

তথ্যসূত্র

১. পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৫৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিটে পরিণত করার জন্য একটি আইন পাশ করা হয়। পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় পূর্ব পাকিস্তান।

২. মাহমুদউল্লাহ (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা : গতিধারা, ১৯৯৯, পৃ. ৬৫।

৩. আবদুল হক, *চেতনার এলবাম এবং বিবিধ প্রসংগ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩, পৃ.১৩৬।

৪. S. A. Akanda, 'The Language Issue: Potent force for transforming East Pakistani Regionalism into Bengali Nationalism' *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol.I, 1976, pp. 1-29

৫. আবদুল হক, *ভাষা আন্দোলনের আদি পর্ব*, ঢাকা : মুক্তধারা, পৃ. ভূমিকা।

৬. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮।

৭. বশীর আলহেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ১৯৭।

৮. *আজাদ*, ১৯ মে ১৯৪৭।

৯. বশীর আলহেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১।

১০. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য – আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, তিনি প্রবন্ধ রচিনা ছাড়াও বাংলা ভাষার পক্ষে লেখক ও সাংবাদিকদের মধ্যে প্রচারণা ও পারস্পরিক আলোচনার বিষয়টিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। *আজাদ* থেকে *সওগাত* পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হিসেবে যোগদানের পর (৩ জানুয়ারি ১৯৪৭) তার এই রাষ্ট্রভাষা নিয়ে আলোচনার সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে কে প্রথম প্রবন্ধ লেখেন তা নিয়ে কিছুটা বিতর্ক আছে। এ বিষয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাহবুব জামাল জাহেদী ইত্যাদি বিভিন্ন নাম আসলেও প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে বলা যায় লেখক ও সাংবাদিক আবদুল হক প্রথম কলম ধরেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বশির আল হেলাল, *প্রাগুক্ত* পৃ. ১৮৯। মাহবুব জামাল জাহেদীর ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই 'রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই কলকাতার *ইত্তেহাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি পূর্ব বাংলায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে অভিমত দেন। *ইত্তেহাদ*-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে বাঙালি সমাজে ইংরেজি, উর্দু ও হিন্দির প্রতি পক্ষপাত এবং বাংলা ভাষার প্রতি উদাসীনতার সমালোচনা করে বলা হয় যে, বাংলা হিন্দুর ভাষা নয়, হিন্দু-মুসলমানের যৌথ ভাষা। লেখক আরও মন্তব্য করেন, পৌত্তলিকতা কোনো ভাষার স্থায়ী বা একমাত্র লক্ষণ নয়।

১১. *আজাদ*, ৩০ জুন ১৯৪৭।

১২. আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭-৮।

১৩. বশীর আলহেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫।

১৪. *আজাদ*, ২১ জুলাই ১৯৪৭।

১৫. *ঐ*, ২৭ জুলাই ১৯৪৭।

১৬. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, ঢাকা : নভেল পাবলিশিং হাউজ, ২০১৩, পৃ. ৬১।

১৭. *আজাদ*, ২৯ জুলাই ১৯৪৭।

১৮. ড. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা*, ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ.৩২৫।

১৯. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ১৯।

২০. সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫, পৃ. ৪৪।

২১. *আজাদ*, ৫ অক্টোবর ১৯৪৭।

২২. বশীর আলহেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪।

২৩. *আজাদ*, ৫ নভেম্বর ১৯৪৭।

২৪. *ঐ*, ১৫ নভেম্বর ১৯৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।

২৬. বশীর আলহেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩-২।

২৭. *ঐ*, পৃ. ২১৫।

২৮. *আজাদ*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৭।

২৯. *ঐ*, ২১ ডিসেম্বর ১৯৪৭।

৩০. মোঃ এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮, পৃ. ৫৬।

৩১. বশীর আলহেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০।

৩২. ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে হত্যা করে।

৩৩. সংশোধনীটি ছিল খসড়া নিয়ন্ত্রণ প্রণালির ২৯ নং ধারা সম্পর্কে – যেখানে বলা হয়েছে পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে উর্দু ও ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করতে হবে। তিনি বলেন, "Mr. President, Sir, I move: That in sub-rule (1) of rule 29, after the word "English" in line 2, the words "or Bengalee" be inserted"। বিস্তারিত – হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র,* প্রথম খণ্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়য়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ ৫৪-৬৫।

৩৪. বদরুদ্দীন উমর, 'ভাষা আন্দোলন', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ৪৩৩।

৩৫. *আজাদ*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।

৩৬. *ঐ*, ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।

৩৭. *আজাদ*, ৫ মার্চ ১৯৪৮, *আজাদ* মালিক মওলানা আকরম খাঁ পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রতিনিধি হিসেবে করাচিতে গণপরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের উত্থাপিত প্রস্তাবটি বাতিল হওয়ার পক্ষে ভোট দেন। তিনি করাচি থাকা অবস্থাতেই এই সম্পাদকীয়গুলো প্রকাশিত হয়।

৩৮. মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।

৩৯. *আজাদ*, ১৪ মার্চ ১৯৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

৪০. ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে *আজাদ* যে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে সেটির পেছনে পত্রিকাটির মালিক মওলানা আকরম খাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছিল। মুসলিম লীগের একজন কর্মী হিসেবে তিনি মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সব কর্মকাণ্ড ও বক্তব্যকে সমর্থন করেন। ১৯৪৮ সালের ৫ এপ্রিল তিনি 'স্টার অব ইণ্ডিয়া'র একজন প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎকারে বলেন যে, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে কায়েদে আজমের অভিমত তিনি সমর্থন করেন। বিস্তারিত - বশীর আলহেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৩।

৪১. ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর এবং ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়। মুসলিম লীগ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার সম্মেলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিস্তারিত – রেজোওয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭১)*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬, পৃ. ১৬৯-১৭৯।

৪২. *ঐ*।

৪৩. *আজাদ*, ১ জানুয়ারি ১৯৪৯।

৪৪. মনসুর মুসা (সম্পাদিত), *বাঙলাদেশ*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ৬০।

৪৫. মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯।

৪৬. বশীর আলহেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯৮-৭০০।

৪৭. *আজাদ*, ১৫ মার্চ, ১৯৪৯।

৪৮. বশীর আলহেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১২।

৪৯. *আজাদ*, ৯ এপ্রিল, ১৯৪৯।

৫০. *ঐ*, ১৯ এপ্রিল, ১৯৪৯।

৫১. বশীর আলহেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৯।

৫২. *আজাদ*, ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ২ ও ৪ অক্টোবর ১৯৫০।

৫৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০-১৬৭।

৫৪. *আজাদ*, ২৮ জানুয়ারি, ১৯৫২।

৫৫. *ঐ*।

Dhaka University Institutional Repository

৫৬. *ঐ*, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

৫৭. *ঐ*, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

৫৮. *ঐ*, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

৫৯. *ঐ*

৬০. এম. আর. আখতার মুকুল, *ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা : শিখা প্রকাশনী, ২০১৪, পৃ. ১৫৫।

৬১. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি*, ঢাকা : খোশরোজ পাবলিকেশনস লিমিটেড, ১৯৬৮, পৃ. ৩৩০-৩৩২

৬২. সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২।

৬৩. শামসুদ্দীন আহমদ ছিলেন পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী মুসলিম লীগ দলের নেতা; বিস্তারিত - বশীর আলহেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৮-৪৪৮।

৬৪. *ঐ*।

৬৫. *আজাদ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

৬৬. বশীর আলহেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৬।

৬৭. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩০-৩৩২।

৬৮. এম. আর. আখতার মুকুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮।

৬৯. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৪ , পৃ. ২৪১-২৪২।

৭০. *আজাদ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

৭১. *ঐ*।

৭২. *ঐ*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

৭৩. *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

৭৪. *আজাদ*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

Dhaka University Institutional Repository

৭৫. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬।

৭৬. *আজাদ*, ২২ মার্চ ১৯৫২।

৭৭. *ঐ*, ২৪ মার্চ ১৯৫২।

৭৮. বশীর আলহেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬১।

৭৯. *আজাদ*, ১৫ এপ্রিল ১৯৫২।

৭৯(ক) আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১।

৮০. *পাকিস্তান অবজারভার*, ১২ মার্চ ১৯৫১।

৮১. *ঐ*, ২৮ জানুয়ারি ১৯৫২।

৮২. বশীর আলহেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৪।

৮৩. *আজাদ*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

৮৪. *মর্নিং নিউজ*, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

৮৫. সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

৮৬. *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

৮৭. বশীর আলহেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৫।

৮৮. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬-১৪৭।

৮৯. সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২।

৯০. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪।

৯১. *সংবাদ*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

৯২. *মর্নিং নিউজ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭।

৯৩. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪-৩৫।

৯৪. *মর্নিং নিউজ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

৯৫. *আজাদ*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৪৭।

৯৬. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭।

৯৭. *মর্নিং নিউজ*, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪৭।

৯৮. *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪৭।

৯৯. *মর্নিং নিউজ*, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

১০০. বশীর আলহেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩২-৪৩৩।

১০১. *সৈনিক*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

১০২. বশীর আলহেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৫।

১০৩. *মর্নিং নিউজ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

১০৪. *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

১০৫. *ঐ*।

১০৬. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩।

১০৭. সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

১০৮. মনসুর মুসা(সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯।

১০৯. *ইনসাফ*, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

১১০. *ঐ*।

১১১. *ঐ*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

১১২. *ঐ*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

১১৩. বশীর আলহেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৭।

১১৪. *ইনসাফ*, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

১১৫. সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

১১৬. *মিল্লাত*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

১১৭. মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২।

১১৮. Najma Chowdhury, *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature, 1947-58*, Dhaka: University of Dhaka, 1980, pp. 85-88

১১৯. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং নিজাম-ই-ইসলাম এর সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। তবে গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা আওয়ামী মুসলিম লীগের নামে নমিনেশন পায়।

১২০. Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh*, Dhaka: UPL, 1986, p. 124

১২১. *আজাদ*, ১-৬ মার্চ ১৯৫৪।

১২২. *ঐ*, ৫ জানুয়ারি ১৯৫৪।

১২৩. *ঐ*, ২১ জানুয়ারি ১৯৫৪।

১২৪. *ঐ*, ৩১ জানুয়ারি ১৯৫৪।

১২৫. *ঐ*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪।

১২৬. *ঐ*, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪।

১২৭. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, ঢাকা : সময়, ২০০৫, পৃ. ১১৪-১১৫।

১২৮. *আজাদ*, ৬ মার্চ ১৯৫৪।

১২৯. *ঐ*।

১৩০. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২।

১৩১. *আজাদ*, ৪ মার্চ ১৯৫৪।

১৩২. *ঐ*, ৯ মার্চ ১৯৫৪।

১৩৩. *ঐ*, ১১ মার্চ ১৯৫৪।

১৩৪. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৫. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭।

১৩৬. মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০।

১৩৭. ১৯৪৮ সালের পর থেকেই সরকারের অব্যবস্থার কারণে পূর্ব বাংলায় খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এই খাদ্য সংকটের ফলে উদ্ভূত দুর্ভিক্ষের খবরও ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলো ছাপতে থাকে। খাদ্য সংকটের ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য অস্বাবাভিক হারে বৃদ্ধি পায়। একই সাথে তৈরি হয় লবণ সংকট। পত্রিকাগুলোতে এই সংকটের জন্য সরকারের অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে থাকে। *আজাদ* সরাসরি সরকারের সমালোচনা না করলেও জনগণের দুর্ভোগের বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে। ঢাকার সংবাদপত্রের এই ভূমিকা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

১৩৮. *আজাদ*, ২২ মার্চ ১৯৫৪।

১৩৯. *ঐ*, ২৭ মার্চ ১৯৫৪।

১৪০. *প্রেসক্লাব স্মরণিকা*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৬।

১৪১. *ইত্তেফাক*, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩।

১৪২. আবুল মনসুর আহমেদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০১৫, পৃ. ২৫২; ২১ দফার বিস্তারিত পরিশিষ্ট ২ এ।

১৪৩. কামালউদ্দিন আহমেদ, 'চুয়ান্ন সালের নির্বাচনঃ স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গ', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ৪৭১।

১৪৪. আবু জাফর শামসুদ্দিন, *আত্মস্মৃতি*, অখণ্ড সংস্করণ, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ২৩২।

১৪৫. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *স্মরণীয় সাংবাদিক*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭, পৃ. ৫০।

১৪৬. নিরঞ্জন হালদার, 'মানিক ভাই ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা', *ইত্তেফাক : তফাজ্জল হোসেন স্মৃতি সংখ্যা*, আগস্ট, ১৯৭৩।

১৪৭. মাহবুব-উল-আলম, 'মহান সত্তা', *ইত্তেফাক : তফাজ্জল হোসেন স্মৃতি সংখ্যা*, আগস্ট, ১৯৭৩

১৪৮. *ইত্তেফাক*, ৫ মার্চ ১৯৫৪।

১৪৯. *ঐ*, ৭ মার্চ ১৯৫৪।

১৫০. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

১৫১. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর,* ঢাকা : বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, পৃ. ৪৯।

১৫২. *ঐ*।

১৫৩. *আজাদ*, ২৫ ও ২৬ মে ১৯৫৪।

১৫৪. আওয়ামী লীগের ধারাটি ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িকতাকে গ্রহণ করে। অপরদিকে ফজলুল হক জোট রক্ষণশীল ধারার রাজনীতি গ্রহণ করে নিজেদের মুসলিম লীগের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

১৫৫. Keith Callard, *Pakistan- A Political Study,* London: George Allen and Unwin Ltd. 1958, p. 86

১৫৬. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩।

১৫৭. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১।

১৫৮. *ইত্তেফাক*, ২ নভেম্বর ১৯৫৪।

১৫৯. *ঐ*, ১০ জানুয়ারি ১৯৫৬।

১৬০. *ঐ*।

১৬১. *ঐ*, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬।

১৬২. *ঐ*, ১২ জুন ১৯৫৭।

১৬৩. *ঐ*, ১৬ জুন ১৯৫৭।

১৬৪. *ঐ*।

১৬৫. *ঐ*, ২৬ জুলাই ১৯৫৭।

১৬৬. এম. আর. আখতার মুকুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮।

১৬৭. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩।

১৬৮. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩।

১৬৯. সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৭০. *ঐ*, পৃ. ৬৮।

১৭১. *ইত্তেফাক*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮।

১৭২. *ঐ*, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮।

১৭৩. *ঐ*, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮।

১৭৪. *সংবাদ*, ১৬ জানুয়ারি ১৯৫৬।

১৭৫. *ঐ*।

১৭৬. *ঐ*, ২৪ জানুয়ারি ১৯৫৬।

১৭৭. *ঐ*।

১৭৮. সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪।

১৭৯. *সংবাদ*, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭

১৮০. আবুল মনসুর আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৬।

১৮১. মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০।

১৮২. *ঐ*, পৃ. ১২৪।

১৮৩. *আজাদ*, ৪ অক্টোবর ১৯৫০।

১৮৪. *ঐ*, ২৪ এপ্রিল ১৯৫৪।

১৮৫. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০।

১৮৬. *আজাদ*, ২৫-২৬ মে ১৯৫৪।

১৮৭. *ঐ*, ২ জুলাই, ১৯৫৪।

১৮৮. *ঐ*, ১০ জানুয়ারি, ১৯৫৬।

১৮৯. *ঐ*।

১৯০. *ঐ*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৯১. *ঐ*, ১৩ মে ১৯৫৮; ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানপন্থি কিছু লেখক ও সাহিত্যিক 'রওনক সাহিত্য গোষ্ঠী' গড়ে তোলেন। এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের জাতীয়তাভিত্তিক তমদ্দুন গঠনে সাহিত্যিক প্রয়াস চালানো। *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন এর সাথে জড়িত ছিলেন। বিস্তারিত – আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৩।

১৯২. সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।

১৯৩. *ঐ*, পৃ. ৬৬।

১৯৪. *আজাদ*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭।

১৯৫. *ঐ*।

১৯৬. *ঐ*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮।

১৯৭. *মর্নিং নিউজ*, ১১ জানুয়ারি ১৯৫৬।

১৯৮. সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।

১৯৯. *মর্নিং নিউজ*, ২৬ জুলাই ১৯৫৭।

২০০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০-১।

২০১. *পাকিস্তান অবজারভার*, ২৬ মে ১৯৫৪; *নিউইয়র্ক টাইমস* বরাবরই মুসলিম লীগ সরকারকে সমর্থন করেছে। এ বিষয়ে *পাকিস্তান অবজারভার* ১৯৫৪ সালের ২৬ মে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

২০২. *পাকিস্তান অবজারভার*, ৩১ মে ১৯৫৪।

২০৩. *ঐ*, ১ জুন ১৯৫৪।

২০৪. *ঐ*, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬; আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার পতনে *পাকিস্তান অবজারভার* মালিক হামিদুল হক চৌধুরীর মন্ত্রিত্বেরও অবসান হয়।

২০৫. *ঐ*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮।

২০৬. *ঐ*।

২০৭. *মিল্লাত*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮।

২০৮. *ঐ*, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

২০৯. ১৯৫৬ সালের ২৭ অক্টোবর ‘বর্ণচোরা গৃহশত্রু’ শিরোনামে সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য।

২১০. সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪।

২১১. মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আইয়ুব আমল (১৯৫৮-৬৯) ও সংবাদপত্র

ভাষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক যে আন্দোলন মধ্য পঞ্চাশের দশকে রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছিল তা ষাটের দশকে এসে অর্থনৈতিক মাত্রাও অর্জন করে। জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন ও স্বৈরাচার নিয়ে এ পর্বের শুরু। রবীন্দ্র বিতর্ক, ছাত্র আন্দোলন, ভাষা ও সংস্কৃতির সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পাক-ভারত যুদ্ধ এবং ছয় দফা আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামকে একটি মাত্রা দান করে। ফলে ১৯৬৬ সালের পর অত্যন্ত দ্রুত তালে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, আইয়ুব খানের পতন, সত্তরের নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধ ধাপে ধাপে বাংলাদেশকে স্বাধীনতার সিংহদ্বারে পৌছে দেয়। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন শুরুর ৪৪ মাসে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনো আন্দোলন হয়নি কিংবা কোনো বক্তব্য বা বিবৃতি উচ্চারিত হয়নি। কিন্তু পরোক্ষভাবে ছাত্র, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ও কিছু রাজনীতীবিদ সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এবং এক্ষত্রে সংবাদপত্র সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। সামরিক শাসন প্রত্যাহার করার পর বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে এবং একটি পর্যায়ে সেটি গণ-অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। বর্তমান অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে আইয়ুব আমলে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘটনাপ্রবাহ

ইস্কান্দার মির্জা ১৯৫৬ সালের ৫ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর নিজের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে কূটকৌশলের আশ্রয় নেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর জনপ্রিয়তা তার ভীতির কারণ ছিল। ইস্কান্দার মির্জার কূটচালে একের পর এক সংসদীয় সরকারের পতন ঘটে এবং সংসদীয় রাজনীতির কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে।[১] ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলে নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টি (ন্যাপ)-এর কার্যকলাপকে কমিউনিস্টদের সাথে আঁতাত বলে প্রচার করা হয়। প্রতিক্রিয়াশীল *মর্নিং নিউজ* এ বিষয়ে প্রচার করে, “The country was leading towards communism and the communists who were banned in Pakistan were trying to thrive through the NAP”[২]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর রাত ১০.৩০ মিনিটে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় মালিক ফিরোজ খানের সংসদীয় সরকারকে উৎখাত করে সামরিক শাসন জারি করেন।[৩] তিনি উক্ত ৭ অক্টোবরের ফরমান বলে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। একই ফরমান বলে ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করা হয়, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহকে বরখাস্ত করা হয়। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়, রাজনৈতিক দলসমূহ বিলুপ্ত করা হয়, মৌলিক অধিকারসমূহ কেড়ে নেওয়া হয়।[৫] পরদিন ৮ অক্টোবর জাতির উদ্দেশে দেওয়া বেতার ভাষণে আইয়ুব খান দাবি করেন রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার কোন ইচ্ছাই কখনো তার নিজের বা সেনাবাহিনীর ছিল না। কিন্তু ২৮ অক্টোবর আইয়ুব খান এক সরকারি আদেশ জারির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত করে নিজে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করা হয়। এভাবে পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রের অপমৃত্যু হয়। আইয়ুব খান তার ক্ষমতা গ্রহণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য অন্যান্য দেশের সামরিক জান্তাদের মত গণতন্ত্রের মুখোশ পরতে সচেষ্ট হন এবং বলেন যে, দেশের রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার লড়াই, দুর্নীতি ও দলীয় পৃষ্ঠপোষকতার কারণে দেশের গঠনমূলক উন্নতি হয়নি।[৫(ক)] তিনি বিভিন্ন সংস্কারমূলক ও দমনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বস্তুত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপসমূহ ছিল তার একনায়তান্ত্রিক সামরিক শাসনের বৈধতা প্রমাণ ও ক্ষমতা সংহত করার কৌশল মাত্র। সামরিক আইন জারির কয়েক মাসের মধ্যেই রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করা হয় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালের ৭ অক্টোবর নির্বাচিত সংস্থাসমূহ অযোগ্যতা আদেশ ১৯৫৯ - এবডো (Elective Bodies Disqualification Order 1959- EBDO) এবং সরকারি পদ লাভে অযোগ্যতা সংক্রান্ত আদেশ – পোডো (Public Office Disqualification Order – PODO) নামে দুটো আদেশ জারি করেন।[৬] এবডোর আওতায় সামরিক সরকার ৮৭ জন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদকে অভিযুক্ত করেন যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খান আব্দুল গাফফার খান প্রমুখ। কেবল রাজনীতিবিদদেরই আইয়ুব খান হেয় প্রতিপন্ন করেননি, কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের অনেক সদস্যকেও তিনি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেছেন।[৭]

আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর 'মৌলিক গণতন্ত্র' অধ্যাদেশ জারি করেন, উদ্দেশ্য সামরিক শাসনে জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হয়েছে সেটি তুলে ধরা।[৮] মৌলিক গণতন্ত্র বলতে ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে সৃষ্ট চারস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে বুঝায়।[৯] আইয়ুব খানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তৃণমূল পর্যায়ে সমর্থক গোষ্ঠী তৈরি করা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রাদেশিক পরিষদে সদস্য নির্বাচনের ভোটাধিকার মৌলিক গণতন্ত্রীদের দেওয়ার ফলে জনগণ বঞ্চিত হয়। সীমিত সংখ্যক মৌলিক গণতন্ত্রীদের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালের ১১ জানুয়ারি সারা দেশে 'মৌলিক গণতন্ত্রী' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে ৪০,০০০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৪০,০০০ সহ মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সালের ১৩ জানুয়ারি তিনি 'The Presidential (Election and Constitutional) Order-1960' জারি করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল মৌলিক গণতন্ত্রীরা তাকে গণভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে একটি সংবিধান রচনার অধিকার প্রদান করবে। এভাবে আইয়ুব খান সামরিক শাসনকে আইনসিদ্ধ করার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীরা ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি গোপন ব্যালটে হ্যাঁ-না ভোট দিয়ে আইয়ুবকে পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেন।[১০] পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে আইয়ুব খান সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি এগারো সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। কমিশন পাকিস্তানের উভয় অংশ সফর করে প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা সম্পর্কে জনমত যাচাইয়ে সচেষ্ট হন। এ সুযোগ গ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তানের ১১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ১৩ টি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ স্বায়ত্তশাসন, সংসদীয় গণতন্ত্র, ফেডারেল শাসনতন্ত্র, যুক্তনির্বাচন এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধানের পক্ষে তাদের মত প্রদান করেন।[১১] কমিশন ৬২৬৯ কপি প্রশ্নমালার উত্তর লাভ করে। এছাড়া সর্বমোট ৫৬৫ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এসবের ভিত্তিতে কমিশন একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করে এবং তা ১৯৬১ সালের ৬ মে প্রেসিডেন্টের কাছে জমা দেয়। কমিশন তার রিপোর্টে পাকিস্তানে সংসদীয় পদ্ধতি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে বলে উল্লেখ করার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ সংবিধান বিষয়ে কিছু সুপারিশ পেশ করে। সুপারিশমালায় পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র করার এবং একই সাথে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়া কমিশন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার পদ্ধতির, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের ক্ষমতা ও এখতিয়ার ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ন্যায় করার এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য দেশে ইসলামি অর্থনীতি প্রবর্তনের সুপারিশ করে।[১২] কিন্তু প্রেসিডেন্টের মনঃপূত না হওয়ায় তিনি এই রিপোর্ট শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেননি। ১৯৬১ সালের ৩১ অক্টোবর তিনি খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি নতুন কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি 'জনগণ কী চায়' সেটিকে প্রাধান্য না দিয়ে 'জনগণের জন্য কী মঙ্গলজনক' – এই নীতির ভিত্তিতে সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করে। ১৯৬২ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট সংবিধান ঘোষণা করেন এবং সেটি ১৯৬২ সালের ৮ জুন কার্যকর করা হয়।[১৩] এই সংবিধানে

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি জনগণের অধিকার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার খর্ব করে মৌলিক গণতন্ত্রী নামে একটি তল্পিবাহক শ্রেণি সৃষ্টি করা হয়।

আইয়ুব খান বিভিন্নভাবে বাঙালি চেতনা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত করেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, খাজা নাজিমউদ্দীন প্রমুখের মত আইয়ুব খান নিজেও বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করে রোমান হরফে বাংলা বর্ণমালা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেন। বাংলা একাডেমির তৎকালীন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের সভাপতিত্বে একটি কমিটি স্থাপন করা হয়। এছাড়া বাংলা ভাষাকে পরিবর্তন করে 'মুসলমানিত্ব' প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। যেমন – নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'চল চল চল'- এর একটি লাইন ছিল – "নব নবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান"। কিন্তু পাঠ্য বইতে সেটি সংশোধন করে লেখা হয় – "সজীব করিব গোরস্থান"।[১৪]

এরই ধারাবাহিকতায় **১৯৬৭** সালের মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ওসমান গনি বাংলা বিভাগের ড. কাজী দীন মুহাম্মদের নেতৃত্বে ভাষা ও বানান সংস্কারের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটির সুপারিশ একাডেমিক কাউন্সিলে গৃহীত হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে তা চাপা পরে যায়। আইয়ুব খান এবং তার অনুচরবৃন্দ রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করে **১৯৬১** সালে বিশ্বকবির জন্মশতবার্ষিকী পালনে বাধা প্রদান করে। বাংলা একাডেমি যেন এই জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন না করে সরকার সেই ব্যবস্থা নেয়।[১৫] **১৯৬৭** সালের জুন মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে পুনরায় বিতর্ক শুরু হয়। এ সময় পরিষদের সদস্য খান এ সবুর পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন ও রবীন্দ্র সংগীতকে হিন্দু সংস্কৃতির অংশ বলে মন্তব্য করেন।[১৬]

১৯৬১ সালের শেষের দিকে শেখ মুজিবুর রহমান, তফাজ্জল হোসেন, মনি সিংহ এবং খোকা রায়ের মধ্যে এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের বিষয়ে ঐকমত্য হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, আইয়ুব খান নতুন সংবিধান ঘোষণার সাথে সাথে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করবে। এরপর ক্রমে ক্রমে সেটি সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। ঐ বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন একসাথে কাজ করবে।[১৭] **১৯৬২** সালে ছাত্ররা তিনটি ইস্যুতে তিনবার আন্দোলনে নামে – সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতারের প্রতিবাদে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে, মার্চ মাসে সংবিধান বিরোধী আন্দোলনে এবং আগস্ট-সেপ্টেম্বরে শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে। তবে এ সময় সামরিক শাসন উৎখাত করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের যে সম্ভাবনা ছিল রাজনৈতিক দল তথা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সে সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করেনি। তখনো প্রকাশ্য

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল – ছাত্রদের আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাড়া না দেওয়ার এটি একটি কারণ হতে পারে। আন্দোলনের সবচেয়ে বড় সাফল্য এই যে, ছাত্ররাই পরবর্তীকালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়।[১৮] ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের মাঝে জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ বপন করে আর ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনে এই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে জাতীয় চেতনার সাথে প্রগতিশীলতার স্ফুরণ ঘটায়।[১৯]

১৯৬৪ সালে একের পর এক অনেকগুলো আন্দোলন হয়। প্রথম আন্দোলন ছিল অবাঙালি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে। ১৯৬৪ সালের ৭ জানুয়ারি সরকারের ইঙ্গিতে অবাঙালি মুসলমানরা ঢাকা শহর ও তার আশেপাশে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করে। ঢাকার ছাত্র সমাজ বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়ন এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে সচেতন হয়। ১৯৬৪ সালে ছাত্রদের আরেকটি আন্দোলন গড়ে ওঠে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন। গভর্নর হয়েই তিনি ছাত্রদের দমনের কাজ শুরু করেন এবং এনএসএফ (ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন) নামে একটি ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর ছাত্র সমাজের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে কাজ করছিল। ১৬ মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ছাত্ররা প্যাণ্ডেলে কালো পতাকা টাঙিয়ে দেয় এবং ২২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে মোনেম খান প্রবেশ করা মাত্র ছাত্ররা আইয়ুব-মোনেম বিরোধী স্লোগান দিতে থাকে। এই আন্দোলনের আশু কোনো ফল লাভ না হলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্য ও আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ছাত্র আন্দোলনের চাপ আরও তীব্রতর হয়। এই প্রয়াসের ফলেই ১৯৬৪ সালের শেষের দিকে জন্ম নেয় সম্মিলিত বিরোধী দল ও তার নেতৃত্বে আন্দোলন।[২০]

আইয়ুব খান বিভিন্ন দমনমূলক নীতির পাশাপাশি বাঙালিদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতিও গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর পূর্ব পাকিস্তান তার অস্তিত্বের চব্বিশটি বছর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উপনিবেশ হিসেবে কাটিয়েছে। কেন্দ্রীয় রাজধানী এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ও সামরিক শক্তিকেন্দ্রসমূহ পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচার অনেক সহজ হয়ে যায়। ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। ১৭ দিনের এই যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের তত্ত্ব – "ডিফেন্স অব ইস্ট পাকিস্তান লাইজ ইন দ্যা ওয়েস্ট", যে মিথ্যা স্তোক বাক্য সেটি বাঙালিদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।[২১] ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি যা দেশভাগের সময় থেকেই উচ্চারিত হয়ে এসেছে, তা পাক-ভারত যুদ্ধের সময় আরও জোরদার হয়। স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে এগিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আসে আওয়ামী লীগ। স্বায়ত্তশাসন প্রবক্তাদের অন্যতম শেখ মুজিবুর রহমান দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ছয় দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের নেতৃবৃন্দের এক কনভেনশনে, ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। কনভেনশনে উপস্থিত ১৩৫ জন প্রতিনিধি তা তাৎক্ষণিকভাবে নাকচ করলে প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমান সম্মেলনস্থল ত্যাগ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন। কনভেনশনে উপস্থিত ৭৪০ জন প্রতিনিধির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ছিলেন ২১ জন। এই ২১ জনের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিব ও তাঁর দলের অপর ৪ জন নেতা। ছয় দফার প্রতি আওয়ামী লীগের তরুণ নেতৃবৃন্দের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। ফলে ওয়ার্কিং কমিটির কোনো সভা অনুষ্ঠানের আগেই ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ব্যানারে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নামে – "আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি" শীর্ষক একটি পুস্তিকা বিলি করা হয়। এখানে ছয় দফার দাবিগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়। পুস্তিকাটি আওয়ামী লীগের কার্যালয় ৫১ পুরানা পল্টন থেকে প্রকাশিত এবং দলের প্রচার সম্পাদক আব্দুল মমিন কর্তৃক প্রচারিত।[২১(ক)]

ছয় দফা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে আইয়ুব খানের সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ছয় দফার প্রচারণার এক পর্যায়ে ১৯৬৬ সালের ৮ মে শেখ মুজিবুর রহমান দেশ রক্ষা আইনে গ্রেফতার হন। এর আগে ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ থেকে ৮ মে পর্যন্ত ৫০ দিনে তিনি ৩২ টি জনসভায় ভাষণ দেন। শেখ মুজিবুর রহমানের পাশাপাশি ১৯৬৬ সালের ১০ মে-এর মধ্যে প্রায় ৩৫,০০০ নেতা-কর্মী গ্রেফতার হন।[২২] প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ গোটা প্রদেশ জুড়ে ৭ জুন একটি সফল হরতাল পালন করে। প্রতিক্রিয়ায় সরকার আরও কঠোর হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী নিজে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবি করলেও তিনি ছয় দফার কঠোর সমালোচনা করে ১৯৬৬ সালের ১৪ জুন পাল্টা ১৪-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ফলে আওয়ামী লীগের সাথে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এর সম্পর্ক খারাপ হওয়ার সাথে সাথে দলটির অভ্যন্তরেও কোন্দল শুরু হয়। এই অবস্থায় আইয়ুব বিরোধী সব রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ১৯৬৭ সালের ২ মে ঢাকায় আতাউর রহমানের বাসায় মিলিত হন। এখানে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) নামে ঐক্যজোট গঠন করা হয়।[২৩] পিডিএম আট দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে যা ছিল ছয় দফার বর্ধিত সংস্করণ। এখানে অনেক পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা থাকায় এই জোট একটি সম্মিলিত বিরোধী দলীয় জোটে পরিণত হয় এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবি একটি জাতীয় দাবির রূপ পায়।

Dhaka University Institutional Repository

ছয় দফা ভিত্তিক পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসহ বাঙালির সকল ন্যায্য দাবি বানচাল করার নতুন ষড়যন্ত্র হিসেবে শাসক গোষ্ঠী ১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে ছয় দফার অন্যতম প্রণেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৪ জনের (পরবর্তী সময়ে ৩৫ জনে উন্নীত হয়) বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে তাদের গ্রেফতার করে।[২৪] ১৯৬৯ সলের জানুয়ারি মাসের শুরুতে গঠিত হয় 'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। আন্দোলনের অংশ হিসেবে এই কমিটি এগারো দফা দাবি পেশ করে যার মধ্যে আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবি অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া ১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি – ডাক) গঠিত হয়।[২৫] ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি ডাক ৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। এর মূল বক্তব্য ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার। কিন্তু এতে ছয় দফার প্রতিফলন ঘটেনি। ফলে আইয়ুব বিরোধী গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে 'ডাক' ব্যর্থ হয়। ডাক-এর কর্মসূচিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি না থাকায় শহরগুলোতে মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র সমাজ উদ্বুদ্ধ হতে পারেনি। বিপরীতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফা দাবির মধ্যে আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবির সাথে সাথে বাঙালি মধ্যবিত্ত এবং কৃষক শ্রমিকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে এগারো দফা বাঙালি জনগণের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে এবং আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে আসে ছাত্র সমাজের হাতে। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে এই আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ নেয়। ২০ জানুয়ারি ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে নিহত হলে আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুদ্দোহা প্রক্টরের দায়িত্ব পালন করার সময় পুলিশের বেয়নেট চার্জে ১৮ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। এর আগে ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হককে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি করে বন্দি অবস্থায় কুর্মিটোলায় গুলি করে হত্যা করা হয়। এসব হত্যাকাণ্ড আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের গতি সঞ্চার করে। গণ-অভ্যুত্থানের মুখে সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পাওয়ার পর বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়। এ সময়ের পর থেকেই বাঙালি জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার পর আন্দোলনের ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি পায়। ইতোমধ্যে ২১ মার্চ (১৯৬৬) বঙ্গবন্ধু ছয় দফা ও এগারো দফার আলোকে পাকিস্তানের সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর খসড়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কাছে পেশ করেন। উক্ত খসড়ানীতি পশ্চিম পাকিস্তানের অনগ্রসর অঞ্চলগুলির সমর্থনের ফলে পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকার ও সেনাবাহিনীর ক্ষমতা সংকুচিত হওয়ার আশংকা তৈরি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙ্গে ৪টি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবি জনপ্রিয়তা পায়। ফলে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন

Dhaka University Institutional Repository

কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ থাকে না, পশ্চিম পাকিস্তানেও ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আইয়ুব খানের ক্ষমতায় থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পরিবর্তে সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরকে শ্রেয় মনে করলেন। ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ পাকিস্তানের তৎকালীন সেনা প্রধান ইয়াহিয়া খানের কাছে একটি চিঠি দিয়ে তিনি তাকে ক্ষমতা গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ পাকিস্তানে দ্বিতীয় বারের মত সামরিক শাসন জারি করেন।

সংবাদপত্রের ভূমিকা

দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর সংবাদপত্রের বিকাশ ও সাংবাদিকতার স্বাধীন মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি অনেকাংশে নির্ভরশীল। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ স্থবির হয়ে পড়ার সাথে সাথে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার অঙ্গনও নির্জীব হয়ে পড়ে। তবে ১৯৬২ সালের ৮ জুন সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর ধীরে ধীরে বিগত চার বছরের রাজনৈতিক আন্দোলন ও প্রতিবাদ দানা বাঁধতে থাকে। ফলে সংবাদপত্র অঙ্গনেও গতিশীলতা আসে। নিম্নে আইয়ুব আমলে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হলো –

১. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ

সামরিক আমলে রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ থাকায় জনগণের দুঃখ দুর্দশা ও সমস্যা তুলে ধরার মাধ্যম ছিল সংবাদপত্র। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করার পর এমনকি ১৯৬২ সালের ৮ জুন সামরিক শাসন তুলে নেয়ার পরও বিভিন্নভাবে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আইয়ুব খান তার ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ রাখার স্বার্থে সংবাদপত্রগুলোকে একটি কঠোর আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। তাছাড়া সংবাদপত্রের প্রতি আইয়ুব খানের এক প্রকার নেতিবাচক মনোভাব কাজ করত। তার *Friends not Masters: A Political Autobiography* – গ্রন্থে তিনি এমন কথাও লিখেছেন যে অনেক সংবাদপত্র মালিক ব্ল্যাকমেইলের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করতেন।[২৬]

৭ অক্টোবর সংবিধান বাতিলের সাথে সাথে সংবাদপত্রগুলোর জন্য সামরিক সরকারের সমালোচনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। ৪ নং সামরিক আইন রেগুলেশনের মাধ্যমে সকল প্রকার প্রচার মাধ্যমের ওপর প্রি-সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়। এর কোনো বরখেলাপ হলেই সেটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং

Dhaka University Institutional Repository

সেই শাস্তির মেয়াদ হবে ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।[২৭] ৮ অক্টোবর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল ওমরাও খান সামরিক আইন বিধির ৩৫ ধারা ঘোষণা করেন। এতে বলা হয় যে, কোনো ব্যক্তি লিখিত বা মৌখিক ভাবে জনগণের মধ্যে হতাশা, আতঙ্ক এবং সেনাবাহিনী বা পুলিশ বাহিনীর প্রতি অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা করলে তাকে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ড দেওয়া হবে।[২৮]

এই প্রাদেশিক সামরিক আইনবিধি রহিত হয় ১৯৫৮ সালের ১১ অক্টোবর যখন আইয়ুব খান সারা পাকিস্তানের জন্য জারি করেন সামরিক আইন বিধি নং ২৪। এই বিধি মূলত ৩৫ নং সামরিক আইন বিধির-ই অনুরূপ। এছাড়াও ৩৪ নং সামরিক আইনবিধিতে বলা হয়, "যে কোনো ব্যক্তি মুখের কথায় অথবা লিখিতভাবে অথবা যে কোনোভাবে প্রাদেশিকতা, শ্রেণিগত ভিত্তিতে এইরূপ গুজব বা বিবরণ প্রচার করিবে – যাহার দ্বারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অথবা শাসনকার্যের ব্যাপারে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিতে পারে, সেক্ষেত্রে তাহার ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হইতে পারে।"[২৯]

সামরিক আইনের কঠোর অনুশাসনের মধ্যেই ১৯৬০ সালের ২৬ এপ্রিল জারি করা হয় প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন অধ্যাদেশ। পূর্বতন প্রেস এ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুকস অ্যাক্ট – ১৮৬৭ এবং সংবাদপত্র (জরুরি ক্ষমতা) আইন, ১৯৩১ একত্রিত করে তৈরি করা হয় এই অধ্যাদেশ। এই অধ্যাদেশের ৬৩ ধারা অনুযায়ী পূর্বোক্ত দুটো আইনকে সুসংহত করার পাশাপাশি সংবাদপত্রের সাথে সামান্য সম্পর্কে সম্পর্কিত আইনের বিভিন্ন বিধিনিষেধও কার্যকর করা হয়। সরকারের দৃষ্টিতে সন্দেহযোগ্য প্রেসমালিক ও প্রকাশকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা জামানতি অর্থ দাবি এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত সংবাদপত্রের সন্ধানে যেকোনো স্থানে তল্লাশি চালানোর অধিকার দেওয়া হয় সরকারকে।[৩০]

১৯৬৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর জারি করা হয় প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬৩। এই অধ্যাদেশ বলে সরকারি প্রেস নোট ও তথ্য বিবরণী অনুপুঙ্খ মুদ্রণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। এর ব্যত্যয় হলে প্রেস ও সংবাদপত্রের কপি বাজেয়াপ্ত করা ও সর্বোচ্চ ১ বছর কারাদণ্ড বা ১০ হাজার টাকা জারিমানা বা উভয়বিধ দণ্ডের বিধান রাখা হয়। প্রেস মালিকদের জামানতের পরিমাণ ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ হাজার টাকা এবং মালিক–সাংবাদিক–কর্মচারী বিরোধের মত অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য কমিশন নিয়োগের অধিকার দেওয়া হয়। এই কমিশনকে সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ রাখা বা অন্য কারও ওপর দায়িত্ব অর্পণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ সংবাদপত্রের ওপর যখন-তখন হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করতেই সরকার এই অধ্যাদেশ জারি করে।[৩১] ফলে পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগণ লক্ষ্য করে সাংবাদিকরা সামরিক শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা বলতে গিয়ে বন্দী হচ্ছেন, দমিত হচ্ছেন, কিন্তু প্রয়োজনে রিট জারি করে সাংবাদিকদের রক্ষা করতে এ সময় বিচার বিভাগও এগিয়ে আসেনি। সামরিক শাসন জারি করার পর *সংবাদ*-এর তৎকালীন বার্তা সম্পাদক কে. জি. মুস্তাফা তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন:

> সামরিক আইন জারি করার খবর পেলাম রাত ২ টার সময়। সংবাদ অফিস থেকে পিয়ন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমার বাসায়। ... তখন অফিসে গেলাম। দেখলাম চার মিলিটারী অফিসার সেখানে। তাদের হাতে সামরিক আইনের অর্ডার এবং রেগুলেশন। ... তারা বললেন – এগুলো ছাপতে হবে আপনাদের ... হিয়ার ইজ এ বাঞ্চ অব রুলস ... পড়তে গিয়ে দেখি প্রতিটি অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।[৩২]

আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করার পর ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রায় প্রতিটি সংবাদই সেন্সর করা হতো। সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, প্রতিবেদন, সহ-সম্পাদকদের অনুবাদ করা সংবাদ পাঠাতে হতো তথ্য মন্ত্রণালয়ে 'সেন্সর' কর্তৃপক্ষের কাছে। প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পর 'Censored and Passed' এই সিল ও অফিসারের স্বাক্ষরের পর এগুলো দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। সামগ্রিক বিষয়গুলো পর্যালোচনা এবং বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার লক্ষ্যে চিফ সেক্রেটারিকে সভাপতি করেও সমস্ত দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের সমন্বয়ে গঠন করা হয় 'প্রেস কনসালটেটিভ কমিটি'।[৩৩] তবে সামরিক শাসন জারির বছর খানেকের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশে কোনো ব্যত্যয় না হওয়ায় 'সেন্সর' পদ্ধতি প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু কেবল সেন্সর পদ্ধতি বাতিলের বিরোধিতা করে মানিক মিয়া এর সাথে সামরিক আইনে ১৪ বছর কারাদণ্ডের বিধানও প্রত্যাহারের দাবি জানান। *পাকিস্তান অবজারভার*-এর আবদুস সালাম, *আজাদ*-এর মজিবর রহমান খাঁ, *সংবাদ*-এর জহুর হোসেন চৌধুরী প্রমুখ প্রবীণ সম্পাদকেরা মানিক মিয়াকে সমর্থন করেন।[৩৪]

স্বাভাবিকভাবেই সামরিক শাসন এমনকি সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর কড়া বিধি-নিষেধের চাপে সংবাদপত্রগুলো কিছুটা দমে যায়। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবরের পরবর্তী কয়েকদিন *আজাদ, ইত্তেফাক, সংবাদ* প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামে যেসব বক্তব্য এসেছে তার মূলকথা ছিল দেশের রাজনীতির চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনী নিতান্ত অনিচ্ছায় ক্ষমতা গ্রহণ করেছে এবং এই নৈরাজ্যের অবসান একমাত্র সামরিক বাহিনীর পক্ষেই করা সম্ভব বলে এই ক্ষমতাগ্রহণ অভিনন্দনযোগ্য।[৩৫] উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, সামরিক শাসন জারির পরদিন ৯ অক্টোবর প্রকাশিত *পাকিস্তান অবজারভার* শিরোনাম করে "Martial

Dhaka University Institutional Repository

Law Rules Promulgated, Administration Divided into three Zones”[৩৬] পাশাপাশি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ওমরাও খানের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয় যে এর মাধ্যমে সাধারণ জীবন প্রভাবিত হবে না। পরদিন রাজনৈতিক দলগুলোর পরিণতির খবর দিয়ে পত্রিকাটি মন্তব্য করে, “Office of all political parties situated in Dacca have been sealed and singe boards removed”[৩৭]

এ পরিস্থিতিতে *ইত্তেফাক*-এর ভূমিকা ছিল কিছুতা ব্যতিক্রমী। পত্রিকাটির সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন সামরিক শাসনের বিরোধী। তিনি তাঁর আত্মজীবনী -*পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর* এ উল্লেখ করেছেন:

> মাথা ব্যাথা হইলে মাথা কাটিয়া যেমন মাথা ব্যাথার নিরাময় করা বুদ্ধিমত্তা নয়, তেমনি সামরিক আইন প্রবর্তন রাজনৈতিক কোন্দল নিরসনের সঠিক পন্থা নয়। ... কতিপয় রাজনীতিকের হঠকারিতা, অবিমৃশ্যকারিতা অথবা রাজনৈতিক কোন্দলের জন্য সমগ্র দেশবাসীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া, সেই অভিযোগে সাড়া জাতির রাজনৈতিক অধিকার ছিনাইয়া লওয়াও একটি জঘন্য অপরাধ এবং ন্যায়নীতির পরিপন্থী ব্যবস্থা।[৩৮]

সামরিক শাসন নিয়ে মানিক মিয়া (মোসাফির) ‘রঙ্গমঞ্চ’ তে ১৯৫৮ সালের ১৭ অক্টোবর মন্তব্য করেন:

> যে কোনো দেশের সামরিক বাহিনীকে স্থায়ীভাবে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হইলে তাদের নিজস্ব দায়িত্ব পালনে অর্থাৎ দেশরক্ষা ব্যবস্থায় শৈথিল্যের ভাব দেখা দিতে পারে। ... দেশের সংহতি ও শাসনকার্য পরিচালনা বিপন্ন হইয়া পরায় বর্তমানে সামরিক বাহিনী শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। ... স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলেই যে তাহারা সামরিক শাসন প্রত্যাহার করিয়া লইবেন তাহাও নিঃসন্দেহ।[৩৯]

তবে অন্যান্য অনেক সাংবাদিক ও সংবাদপত্র সুবিধাবাদী অবস্থান গ্রহণ করেন। সামরিক শাসন জারির পরপরই সরকারের পক্ষ থেকে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা (Bureau of National Reconstruction – BNR) গঠন করা হয়। এটি ছিল তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীন।[৪০] প্রতিষ্ঠানটি সুপরিকল্পিতভাবে সামরিক সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের পক্ষে এবং অতীত রাজনৈতিক সরকারগুলোর দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা নিয়ে প্রচার প্রচারণা শুরু করে। রেডিও, চলচ্চিত্র, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি মাধ্যমের সহায়তায় সারা দেশে লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী ও সমাজকর্মীদের একাংশকে এই কাজে ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, *সংবাদ* পত্রিকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদুল কবির সামরিক শাসনের সুবিধাভোগী অংশে পরিণত হন এবং গভর্নর জাকির হোসেনের মাধ্যমে গঠিত শিল্প উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। একইভাবে লক্ষণীয় যে, সামরিক শাসনামলে ১৯৬০ সালে প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স এর মত একটি কঠোর অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে তখন কোনো আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। প্রতিবাদ

Dhaka University Institutional Repository

জানানোর সুযোগ ও সাহস কম থাকায় একটিমাত্র প্রতিবাদমূলক বিবৃতিই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৯৬০ সালের ২৯ মে পাকিস্তান সংবাদপত্র পরিষদ এক বিবৃতিতে জানায় এই আইন মত প্রকাশের এবং সংবাদ পরিবেশনের স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে।[৪১]

আইয়ুব খানের সরকার বিভিন্ন ভাবে সামরিক শাসন বিরোধী সাংবাদিক ও সংবাদপত্রকে হয়রানি করতে থাকে। সামরিক শাসন বিরোধী সাংবাদিকদের বিদেশ গমনে বাধা দেওয়া হয় এবং অনেককে গ্রেফতার করা হয়। *ইত্তেফাক* সম্পাদক মানিক মিয়া ১৯৫৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হন। সামরিক আদালতের সংক্ষিপ্ত বিচারে তাকে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে লেখনীতে সতর্ক হবেন এই মর্মে লিখিত আশ্বাসের পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের নির্দেশে সে বছরই অক্টোবরের শেষে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।[৪২] কিন্তু কারা মুক্তির পর তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের পক্ষে তার লেখনী অব্যাহত রাখেন। মানিক মিয়ার মূল্যায়ন করতে গিয়ে অলি আহাদ মন্তব্য করেন, "... ছদ্মনাম 'মোসাফির' লিখিত পোস্ট এডিটোরিয়েল 'রাজনৈতিক মঞ্চ' জেল রাজবন্দীদের জন্য সঞ্জীবনী সুধাবৎ ছিল। ইহা স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কত্ববাদের বিরুদ্ধে মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার সংগ্রামের অন্যতম দৃষ্টান্ত ছিল। উক্ত প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য প্রেরণার উৎস হইয়া থাকিবে।"[৪৩]

আইয়ুব আমলে বিভিন্ন ভাবে সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে সংবাদপত্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের কথা বেশি প্রকাশিত হতো *ইত্তেফাক*, *সংবাদ* ও *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকায়। ১৯৬১ সালে ঢাকায় সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সাথে এক বৈঠকে আইয়ুব খান মন্তব্য করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে উপযুক্ত নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি। *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার সম্পাদক আবদুস সালাম উত্তেজিত কণ্ঠে বিষয়টির প্রতিবাদ করেন।[৪৪] ১৯৬২ সালের শেষের দিকে সরকারি তথ্য বিভাগের সাথে পূর্ব বাংলার এই তিনটি বহুল প্রচারিত পত্রিকার বিরোধ তৈরি হয় কিছু কিছু সংবাদ পরিবেশনকে কেন্দ্র করে। সরকারি ভাষ্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে যথাযথ আচরণ না করার অভিযোগ তুলে পত্রিকাগুলোকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ সরকারি এবং আধা সরকারি বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির সকল সুযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় পত্রিকাগুলো থেকে। এই তিনটি পত্রিকা মাসে চল্লিশ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন পেতো মাত্র। অন্যদিকে এমন পত্রিকাও ছিল, প্রচারসংখ্যা যার দু'হাজার বা তার বেশি, পেতে লাগলো সরকারি বিজ্ঞাপন। কারণ এসব পত্রিকা সরকারি বিভিন্ন নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতো।[৪৫] জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে সরকার দলীয় মন্ত্রীরা ঘোষণা দেন যে, সরকারের প্রতি আনুগত্যের মাত্রার ওপর নির্ভর করেই সরকারি

Dhaka University Institutional Repository

ও আধা সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী ফজলুল কাদের চৌধুরী সরাসরি ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের পত্রিকাগুলোকে কমিউনিস্টদের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা তাঁর দায়িত্ব। প্রাথমিক পর্যায়ে পত্রিকাগুলো অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও ১৯৬২ সালের অক্টোবর থেকে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়। এ সময় বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পত্রিকা তিনটিতে অধিক হারে বিজ্ঞাপন দিতে থাকে। এতে করে একদিকে পত্রিকাগুলোর আর্থিক অবস্থা ভাল হতে থাকে কিন্তু অন্যদিকে সরকারের সাথে তাদের সম্পর্ক আরও খারাপ হয়।[৪৬]

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় তথ্য দফতরের সচিব করা হয় আলতাফ গওহরকে। আইয়ুব আমলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য যাদেরকে অন্য সার্ভিস থেকে সিভিল সার্ভিসে অধিষ্ঠিত করা হয় আলতাফ গওহর ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। বহুজনকে ডিঙিয়ে সচিবের দায়িত্ব পাওয়া এই ব্যক্তি সব সম্পাদকের সাথেই সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। কিন্তু যখন বিভিন্ন ভাবে সংবাদপত্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয় হয়রানির উদ্দেশ্যে তখন তিনি থাকতেন নির্বাক এবং নিজস্ব দায়িত্ব এড়িয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দিকে নির্দেশ করতেন। আইয়ুব খান - *Friends not Masters: A Political Autobiography* গ্রন্থে বিভিন্ন ভাবে বাঙালি জাতির চরিত্র হরণ করার চেষ্টা করেন। আলতাফ গহরের নেতৃত্বে সরকারি পর্যায়ে বাঙালি বিরোধী এই বইটির ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। *পাকিস্তান অবজারভার* সম্পাদক আবদুস সালাম এই পুস্তকের সমালোচনা করে নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এ সময় আলতাফ গওহর প্রেসিডেন্টের আক্রোশের কথা সরাসরি আবদুস সালামকে জানিয়ে দেন। এছাড়া নির্বাচনকালীন বিরোধী দলের বিরুদ্ধে প্রচার ও প্রয়োজনে সেন্সরের দায়িত্ব ছিল তার ওপর।[৪৭]

সামরিক আমলে সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের একটি তাৎক্ষণিক ফল ছিল সংবাদপত্রের সংখ্যা হ্রাস। ১৯৫৮ সালের শেষ দিকে সামরিক শাসন জারির পর ১৯৫৯ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সংবাদপত্রের সংখ্যা ক্রমশ কমে যেতে থাকে। ১৯৫৯ সালে দৈনিক পত্রিকা ছিল ১৪ টি যা ১৯৬১ সালে কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১২ টি। তবে ১৯৬২ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহার করার পর থেকে সংবাদপত্রের সংখ্যা আবারও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬২ সালে পূর্ব বাংলায় দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬ তে।[৪৮]

সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর সংবাদপত্রের বিভিন্ন বিধিনিষেধের বিপক্ষে প্রতিবাদের ভাষাও পরিবর্তিত হয়। ১৯৬৩ সালে সংশোধিত প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অধ্যাদেশ জারির পর সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়। *আজাদ* বিষয়টির প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রতিদিন কালো বর্ডার দিয়ে দুটো স্লোগান ছাপায়:

Dhaka University Institutional Repository

প্রেস অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার কর

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা চলবে না[৪৯]

কখনো কখনো তালা আঁটা মুখের ছবি ছাপানো হতো প্রথম পৃষ্ঠার ওপরের দিকে। সরকারি প্রেসনোট অনুপুঙ্খ মুদ্রণের বিষয়টিকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করার জন্য ঢাকার সংবাদপত্রগুলো (একমাত্র *মর্নিং নিউজ* ছাড়া) – 'গভর্নমেন্ট হ্যাণ্ড-আউট' বা 'সরকারি প্রেসনোট' শিরোনামে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জনসংযোগ বিভাগের ডিরেক্টরের অভিবাদন সহ হ্যাণ্ড-আউট নম্বর, টাইপিস্টের নাম – ইত্যাদি সব কিছুই ছাপতে শুরু করে।[৫০] ১৯৬৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর *আজাদ* 'প্রেস অর্ডিন্যান্স' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে সংবাদপত্রের অচলাবস্থার বিবরণ তুলে ধরে।[৫১] এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর *আজাদ* 'গণতন্ত্র ও সংবাদপত্র' শিরোনামে অপর একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়টিতে সংবাদপত্র ও গণতন্ত্রের ওপর আঘাত প্রতিরোধে দেশবাসীর প্রতি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়:

> সংবাদপত্রে স্বাধীনতা হরণ যে জনগণেরই স্বাধীনতা হরণ এবং আজিকার সাংবাদিকদের দাবী যে জনগণেরই দাবী, একথা ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। ... বুঝা গিয়াছে যে, প্রেস ও পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সটি জারী হওয়ায় কেবল সাংবাদিকরাই বিক্ষুব্ধ নন, সারা দেশই ইহার বিরুদ্ধে সমান ভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ... দেশবাসীকে গণতন্ত্র দেওয়ার নাম করিয়া বর্ত্তমান সরকার মানুষের সকল অধিকার সংকুচিত করিতে করিতে আজ এক শ্বাসরোধকারী এবং নজীরবিহীন পরিবেশ দেশে সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছেন। ... দেশে যখন মানুষের মৌলিক অধিকার আদালতের এখতিয়ার ভুক্তি, স্বাধীন বিচার বিভাগ, আইন সভার সার্ব্বভৌমত্ব, মত ও পথের অবাধ অধিকারের দাবী প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে, সে সময় এই প্রেস ও পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সটির প্রবর্ত্তনকে হিতে বিপরীত বুদ্ধির খেলা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। ... এ ব্যাপারে পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলির মধ্যে যে ঐক্য পরিলক্ষিত হইতেছে তাহাও খুব উৎসাহজনক।[৫২]

ইত্তেফাক ১৯৬৩ সালে সংশোধিত প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন অধ্যাদেশের প্রতিবাদে প্রায় প্রতিদিনই সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৯৬৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর পত্রিকাটির প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনাম ছিল, "অগণতান্ত্রিক ও বাক্ স্বাধীনতা হরণকারী অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহারের দাবী, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহলের তীব্র ক্ষোভ।"[৫৩] পরদিন ৫ সেপ্টেম্বর 'একটি প্রতিবাদ' শীর্ষক সম্পাদকীয় কলামে জনগণের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করায় সরকারের সমালোচনা করা হয়।[৫৪] এছাড়া পত্রিকাটি ৮ সেপ্টেম্বর সম্পাদকীয় কলামে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপের কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের শতাব্দী প্রাচীন পত্রিকা *সিভিল এ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট* এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ করে।

Dhaka University Institutional Repository

নতুন অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের আন্দোলন রাজনৈতিক মাত্রা পায়। ৪-৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত *ইত্তেফাক*, *আজাদ*, *সংবাদ* এবং *পাকিস্তান অবজারভার* প্রথম পৃষ্ঠায় এনডিএফ-এর[৫৫] উদ্যোগে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিতব্য একটি জনসভার বিজ্ঞাপন প্রচার করে। পরদিন ঢাকার সব কয়টি দৈনিক পল্টনের জনসভার সচিত্র প্রতিবেদন তুলে ধরে। এখানে বক্তারা প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন অধ্যাদেশের তীব্র সমালোচনা করলে ৭ সেপ্টেম্বর *আজাদ* শিরোনাম করে, "সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণকারী প্রেস অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার কর : পল্টনে ঐতিহাসিক সমাবেশে ঢাকার জনসাধারণের সর্বসম্মত রায়।"[৫৬] সামরিক শাসনের মধ্যে সরাসরি কোনো অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ সহজ ছিল না বলে *আজাদ* জনসভার সংবাদ প্রকাশের আড়ালে নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরে।

১৯৬৩ সালের সংশোধিত প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অধ্যাদেশের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের উদ্যোগে ৯ সেপ্টেম্বর প্রদেশব্যাপী সাংবাদিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট পালিত হয়। ঐ দিন সংবাদ সংস্থাগুলোর অফিসও বন্ধ ছিল, এমনকি বিদেশি কোন পত্রিকাও বিলি করা হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের উদ্যোগে ঢাকার প্রেসক্লাবে সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের একটি প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় অন্যদের মধ্যে *আজাদ* সম্পাদক মওলানা আকরম খাঁ, *ইত্তেফাক* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) এবং *পাকিস্তান অবজারভার* সম্পাদক আবদুস সালাম বক্তব্য দেন। আইয়ুব মন্ত্রিসভার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী বিচারপতি মোহাম্মাদ ইব্রাহিম বাহুতে কালো ব্যাজ পরে উপস্থিত হন এবং সাংবাদিকদের কর্মসূচির সাথে একাত্ম ঘোষণা করেন। আকরম খাঁ সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণকে সমগ্র জাতির ওপর আঘাত বলে উল্লেখ করেন।[৫৭] *ইত্তেফাক* সম্পাদক মানিক মিয়া ঘোষণা করেন, "... বর্তমানে যে সংগ্রাম শুরু হইয়াছে তাহা শুধু সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার জীবন–মরণের সংগ্রাম নয়, সেই সংগ্রামের সাথে একটি স্বাধীন জাতির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইও বিজড়িত।"[৫৮] সভা শেষে যে প্রতিবাদ মিছিল বের হয় তাতে নেতৃত্ব দেন আকরম খাঁ। মানিক মিয়া (মোসাফির) তাঁর 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের মাধ্যমেও প্রতিবাদের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখেন। ১৯৬৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর এই কলামে তিনি মন্তব্য করেন, "সাংবাদিকদের উপর হামলা শুধু কয়েকজন সাংবাদিক, সম্পাদক কিংবা সংবাদপত্র মালিকের উপর হামলা নয়, ইহা গোটা জাতির ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার উপরই চরম আঘাত।"[৫৯] ১০ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। ১১ সেপ্টেম্বর *পাকিস্তান অবজারভার* মন্তব্য করে, "Protest Cry Throughout Pakistan : Journalists Strike"[৬০]

Dhaka University Institutional Repository

প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনের ছবি পত্রিকাগুলো বিপুলভাবে প্রকাশ করে জনমত সৃষ্টি করতে থাকে। ১১ সেপ্টেম্বর *ইত্তেফাক* প্রথম পৃষ্ঠায় বড় আকারের ২ টি ছবি প্রকাশ করে - সাংবাদিক-জনতার নেতৃত্বে পরিচালিত মিছিলের ১টি ছবি এবং কালো পতাকা কাঁধে নিয়ে সংবাদ পত্রিকার জহুর হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে মানিক মিয়ার যুগল ছবি। ঐ দিন *আজাদ* সাংবাদিকদের ঐক্য কামনা করে মন্তব্য করে, "ভাই ভাই এক ঠাই, ভয় নাই ভয় নাই।"[৬১] প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রসমূহের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা বাঙালি জনগণকে সচেতন করে।

সাংবাদিকদের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে ১৯৬৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সরকার এক মাসের জন্য এই অধ্যাদেশের কার্যকারিতা স্থগিত করে। কিন্তু আইয়ুব খান অধ্যাদেশটির পক্ষে যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেন যে, সংবাদপত্রগুলো ক্রমাগত নিন্দনীয় ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করে যাওয়ায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন উপলব্ধি করে সরকারকে এ সম্পর্কে আদেশ জারি করতে হয়েছে। কার্যত সাংবাদিকরা কোনভাবেই নতুন অধ্যাদেশ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে না।[৬২] এর পরদিন ১৪ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে সকল অনুমোদিত সংবাদদাতা ও প্রেস ফটোগ্রাফারদের উদ্দেশে সার্কুলার জারি করে আগস্ট মাসে পরিবেশিত সংবাদ ও ফটোগ্রাফের পরিমাণ জানাতে বলা হয়। একই সাথে কর্মজীবন সম্পর্কে সংবাদকর্মীদের নির্দিষ্ট ফরমে লিখিতভাবে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়।[৬৩] অবশেষে ১৯৬৩ সালের ১০ অক্টোবর ঘোষিত হয় নতুন সংশোধিত প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স। এতে পূর্বতন সংশোধনীর অধিকাংশ সমালোচিত ধারাই রহিত বা পরিবর্তন করতে সরকার বাধ্য হয়।

জাতীয় পরিষদে 'প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স' সম্পর্কে পদ্ধতি ও অধিকার সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার দাবি বাতিল হয়ে গেলে বিষয়টির প্রতিবাদে *আজাদ* 'পরিষদের অধিকার' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৬৪ সালের ২৭ মার্চ প্রাকাশিত সম্পাদকীয়তে জনমতকে উপেক্ষা করার সমালোচনা করে *আজাদ* মন্তব্য করে:

> ... জাতীয় পরিষদের ঢাকা অধিবেশনে পরিষদের বহু সদস্য প্রেস এ্যান্ড পাব্লিকেশানস অর্ডিন্যানসের -এর বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ তুলিয়াছিল। সদস্যরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, অর্ডিন্যানসটি আপনা হইতেই গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ... প্রেস এ্যান্ড পাব্লিকেশানস অর্ডিন্যানসের বিরুদ্ধে জনমত অত্যন্ত সুস্পষ্ট ... জনমতকে এভাবে উপেক্ষা করার জেদটাও বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার।[৬৪]

সংবাদপত্রগুলোর ক্রমবর্ধমান সরকার বিরোধিতার ফলে একটি পর্যায়ে আইয়ুব খান সরকার সমর্থক কিছু পত্রিকা সৃষ্টির উদ্যোগ নেন। এরই ফল হিসেবে ১৯৬৪ সালে গঠন করা হয় – ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট। আজন্ম

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান সমর্থক পত্রিকা *মর্নিং নিউজ* এর সার্বিক দায়িত্ব নেয় ট্রাস্ট। পাশাপাশি ১৯৬৪ সালের ৬ নভেম্বর ট্রাস্ট মালিকানাধীন বাংলা সংবাদপত্র - *দৈনিক পাকিস্তান* বের করা হয়।

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তান সরকার কুখ্যাত 'প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স' জারি করে।[৬৫] সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্বের প্রতিবাদে ১৯৬৮ সালের ১ ডিসেম্বর ঢাকায় সাংবাদিকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্যদের মধ্যে অংশ নেন *ইত্তেফাক* সম্পাদক মানিক মিয়া। সভা থেকে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স বাতিলসহ সকল কালাকানুন বাতিল করার দাবি জানানো হয়। এছাড়া সভা শেষে মিছিল থেকে *ইত্তেফাক* এর ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করায় গভর্নর হাউজের সামনে বিক্ষোভ করা হয়।[৬৬]

২. ছাত্র রাজনীতি এবং ছাত্র আন্দোলন (১৯৬২ ও ১৯৬৪)

সামরিক শাসনের ভেতরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও বিভিন্ন হল সংসদের এবং সারা দেশে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৯ সালের ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংসদের এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ডাকসুর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর প্রতি যথাযথ মর্যাদায় একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেন। *মর্নিং নিউজ* ছাড়া ঢাকার অন্য সব পত্রিকাই বিবৃতিটি প্রকাশ করে। ১৯৬২ সালের শুরু থেকেই পূর্ব বাংলায় আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে। এ ক্ষেত্রে *ইত্তেফাক* সম্পাদক মানিক মিয়া নেপথ্যে থেকে ভূমিকা পালন করেন। আইয়ুব খানের নতুন সংবিধান প্রণয়নের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মানিক মিয়া ১৯৬১ সালের শেষের দিকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সাথে আলোচনায় বসার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকায় কমিউনিস্ট পার্টি তখন একটি গোপন সংগঠন হিসেবে কাজ করত। এ অবস্থায় মানিক মিয়া *সংবাদ* পত্রিকার সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর মাধ্যমে তখনকার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মনি সিংহের কাছে তার এই আগ্রহের কথা জানিয়ে বার্তা পাঠান।[৬৭] আলোচনা শেষে উভয় পক্ষ দুটি সিদ্ধান্ত নেয় –

ক. সামরিক শাসনের অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

খ. এসব দাবির ভিত্তিতে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের নেতৃত্বে যৌথ ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে আন্দোলন শুরু করা।[৬৮]

বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবিকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি মন্তব্য করেন, "ওদের সাথে আমাদের আর থাকা চলবে না। তাই এখন থেকেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।"।[৬৯] কমিউনিস্ট পার্টি নীতিগতভাবে একমত হলেও তৎকালীন বাস্তবতায় এটি সম্ভব নয় বলে মতামত দেয়।[৭০] কিন্তু ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীকে করাচি থেকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। এই সংবাদ পূর্ব পাকিস্তানে পৌছাতেই ছাত্ররা প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। প্রতিবাদ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। কিন্তু সরকারের নিষেধাজ্ঞা থাকায় সেই ধর্মঘটের খবর পরদিন ঢাকার কোনো সংবাদপত্র প্রকাশ করেনি।[৭১] এ সময় বিদেশি সাংবাদিকদের ওপর সংবাদ পরিবেশনে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। তবে দেয়ালে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে পোস্টার লাগানো হয় – 'সামরিক শাসন নিপাত যাক'। এছাড়া সরকার সমর্থক *মর্নিং নিউজ* পত্রিকায় আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে।[৭২] ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রেস ক্লাবের সামনে ঐ দিন প্রকাশিত সংবাদপত্রে অগ্নি সংযোগ করে প্রতিবাদ জানায়।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পূর্বাঞ্চল সফরে আসেন ১৯৬২ সালের ৩১ জানুয়ারি। তাঁর উপস্থিতিতেই ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ এবং মিছিলকারীদের ওপর কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে শেখ মুজিবুর রহমান, মানিক মিয়া, আবদুর রব সেরনিয়াবাদ এবং আরও কয়েকজনকে আটক করা হয়।[৭৩] কিন্তু এ সংক্রান্ত প্রেসনোট ছাড়া আর কোনো সংবাদই পূর্ব বাংলার সংবাদপত্রগুলোতে ছাপতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু প্রেসনোটের মাধ্যমেই পরোক্ষভাবে আন্দোলনের খবর প্রকাশিত হয়ে পরে। ১৯৬২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রেসনোটে বলা হয়:

> Some students absented themselves from the classes on February 1, and incited others. On February 3 they staged an unruly demonstration against a Central Minister who was invited to talk to them at Dacca University. This morning a number of students of the Dacca University again abstained from attending their classes and about 500 of them gathered at the University premises. At 11 am they came out in a procession shouting slogans.[৭৪]

Dhaka University Institutional Repository

ইত্তেফাক এক্ষেত্রে কিছুটা সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করার চেষ্টা করলেও সেটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ৬ ফেব্রুয়ারি পত্রিকাটিতে মুদ্রিতব্য সমস্ত সংবাদের ওপর প্রি-সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর ছিল। ৬ ফেব্রুয়ারি অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সাথে গ্রেফতার হওয়ার পর ১৯৬২ সালের মে মাসে *ইত্তেফাক* সম্পাদক মানিক মিয়া মুক্তি পান।[৭৫]

১৯৬২ সালের ৮ জুন থেকে কার্যকর হওয়া পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান আইয়ুব খান তার নিজের স্বার্থে প্রণয়ন করেন। এই সংবিধানে ভোটাধিকারসহ বাঙালিদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হলে ছাত্ররাও আন্দোলনে অংশ নেয়। সংবিধান ঘোষিত হওয়ার পর বাঙালি ছাত্র সমাজ বিক্ষোভ সমাবেশ এবং ক্লাস বর্জন শুরু করে। ছাত্ররা পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের সদস্যদের রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিতব্য অধিবেশনে যোগদান করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানায়। কিন্তু ৫ জুন ৫৯ জনের একটি সংসদীয় দল রাওয়ালপিণ্ডির উদ্দেশে তেজগাঁও বিমানবন্দরে উপস্থিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাঁদের ঘেরাও করে। তবে সেখানে উপস্থিত রাওয়ালপিণ্ডির যাত্রী *ইত্তেফাক* সম্পাদক মানিক মিয়া ও *সংবাদ* সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। *পাকিস্তান অবজারভার*-এর ৯ জুনের (১৯৬২) প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে সরকার ৮ জুন একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে ছাত্রদের রাজনীতির সাথে জড়িত হওয়ার যে কোনো প্রচেষ্টাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করে। সরকারের এই নীতির প্রতিফলন ঘটে *আজাদ*-এ। নতুন সংবিধান নিয়ে ছাত্রদের আন্দোলনের সমালোচনা করে *আজাদ*। ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে ১৯৬২ সালের ২ আগস্ট 'ছাত্র রাজনীতি' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটি মন্তব্য করে:

> ... নয়া শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার কিছু আগে থেকেই একদল ছাত্র উগ্র ও সক্রিয় রাজনীতি লইয়া হইয়া উঠিয়াছেন। সম্প্রতি ছাত্রদের উগ্র ও সক্রিয় রাজনীতির খবর ঘন ঘনই পাওয়া যাইতেছে। ... ছাত্রদের রাজনৈতিক সভা, শোভাযাত্রা, বক্তৃতা, বিবৃতি প্রদান ও প্রকাশ নিষিদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপক ও সুস্পষ্ট বিধিব্যবস্থা রচনা এবং প্রয়োগ আজ আমরা দরকার মনে করি।[৭৬]

তবে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পরপরই ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্র একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রাখতে থাকে। হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টকে কেন্দ্র করে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ছাত্র আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। ১৭ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে হতাহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। *আজাদ* পরপর কয়েকদিন গুলিবর্ষণ ও নিহত হওয়ার ঘটনা নিয়ে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এর আগে ছাত্র রাজনীতির বিরোধিতা করলেও ১৯ সেপ্টেম্বর 'নেতৃত্ব ও দায়িত্ব' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বিদ্যমান পরিস্থিতির জন্য রাজনৈতিক শূন্যতাকে দায়ী করে পত্রিকাটি

Dhaka University Institutional Repository

মন্তব্য করে, "... দেশে সুষ্ঠু বলিষ্ঠ এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল আজ গঠন করিতে হইবে। দেশে রাজনীতি চলিবে, কিন্তু রাজনৈতিক দল থাকিবে না, এ অবস্থা চলিতে পারে না। ... এরূপ পরিবেশে রাজনীতি করিতে যাওয়া আর নৈরাজ্য এবং উশৃঙ্খলা ডাকিয়া আনা একই কথা।"[৭৭]

১৭ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভ মিছিলে গুলিবর্ষণ ও নিহতের ঘটনায় পরদিন ১৮ সেপ্টেম্বর *পাকিস্তান অবজারভার* প্রধান শিরোনামসহ বেশ কয়েকটি সংবাদ ও ছবি প্রকাশ করে ঘটনার ওপর। *মর্নিং নিউজ* পত্রিকাও একই বিষয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর সংবাদ প্রকাশ করে। একই সাথে পত্রিকাটি সরকারি প্রেসনোটও প্রকাশ করে। তবে *মর্নিং নিউজ* বিষয়টি নিয়ে কোনো সম্পাদকীয় প্রকাশ করেনি। পত্রিকাটির সংবাদ প্রকাশের মধ্যে সরকারি প্রেসনোটের প্রতিফলন পাওয়া যায়।

গভর্নর হিসেবে পদাধিকার বলে মোনায়েম খান প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্য ছিলেন। ১৯৬৪ সালের ২২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের কার্জন হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও ছাত্ররা তার হাত থেকে সনদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ছাত্রদের প্রতি দমননীতি গ্রহণ এবং ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এনএসএফ) নামে সরকারের পেটোয়া বাহিনী গঠনের জন্য তিনি আগে থেকেই কুখ্যাত ছিলেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আগে ডাকসু কার্যালয়ে সর্বদলীয় ছাত্রসমাজের সভায় এনএসএফ কর্মীদের উপস্থিতি উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। এছাড়া সমাবর্তনের আগে থেকেই বিভিন্ন ভাবে ছাত্রদের হয়রানি ও গ্রেফতার করা হয়। এই অবস্থায় মোনায়েম খান সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেও ছাত্রদের প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে পুলিশ পাহারায় সভাস্থল ত্যাগ করেন। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে তার ভাষণটি রেকর্ড করে পরে রেডিওতে প্রচার করা হয়। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ শুরু হয়। অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং আত্মগোপনকারী ছাত্রদের অনেকের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়। অনেক ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার এবং অনেককে মুচলেকা প্রদানের শর্তে অব্যাহতি দেওয়া হয়।[৭৮]

ছাত্রদের বিরুদ্ধে এসব নিবর্তনমূলক ব্যবস্থার খবর ঢাকার পত্রিকাগুলোতে উঠে আসে। বিশেষ করে *ইত্তেফাক*, *সংবাদ* ও *আজাদ* ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে ভূমিকা রাখে; যদিও এর আগে *আজাদ* ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পক্ষে সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছিল। *আজাদ* বিষয়টি নিয়ে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে দেখা যায় যে, ১৯৬৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২২ জুন পর্যন্ত গড়ে প্রতি ৪৮ ঘণ্টায় একজন করে ছাত্র বা রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।[৭৯] ১৯৬৪ সালের ৫ মে *আজাদ*-এর অন্য আরেকটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে আন্দোলন দমনের কৌশল হিসেবে সরকার স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে ৭৪ টি কলেজ ও

Dhaka University Institutional Repository

১৪০০ হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বন্ধ হয়ে যায়।[৮০] এর বাইরে *ইত্তেফাক* ও *সংবাদ* ছাত্র আন্দোলন নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে। ফলে বড়-বড় শহরসহ অনেক এলাকায় ছাত্র জনতার মধ্যে সরকার বিরোধী প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। ছাত্রদের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক ব্যবস্থার খবর প্রকাশ এবং ছাত্র জনতার মধ্যে বিভ্রান্তি ও উত্তেজনা সৃষ্টির দায়ে *ইত্তেফাক*, *আজাদ* ও *সংবাদ* এই তিনটি পত্রিকার বিরুদ্ধে ১৯৬৪ সালের ২ এপ্রিল প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্সের আওতায় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি এবং ৩০ হাজার টাকা জামানত তলব করা হয়।[৮১] পাশাপাশি সরকার ১৯৬৪ সালের ২৭ এপ্রিল থেকে ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারে কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করে। ঢাকার পত্রিকাগুলো দুই ভাবে বিষয়টি মোকাবেলা করে –

প্রথমত, পাতা খালি রেখে এর প্রতিবাদ করে।

দ্বিতীয়ত, সরকারি আদেশ চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করা হয়। শেষ পর্যন্ত বিচারপতি এস.এম. মুর্শিদের দেওয়া রায়ে সরকার পক্ষ পরাজিত হয়।[৮২]

নিষেধাজ্ঞার ফলে প্রায় একমাস পত্রিকাগুলো ছাত্র আন্দোলনের কোনো খবর প্রকাশ করতে পারেনি। নিষেধাজ্ঞা অবসানের পর ২৮ মে (১৯৬৪) বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রতিবাদ হিসেবে বিগত ৩০ দিনের ছাত্র নির্যাতনের খবর প্রকাশ করে। *আজাদ* ২৮ মে 'পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র নির্যাতনের গত ৩০ দিনের মোটামুটি খাতিয়ান' শীর্ষক বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এখানে সংবাদ প্রকাশ করতে না পারার 'বিশেষ' কারণের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়, "কোনো বিশেষ কারণে গত একমাস যাবৎ ছাত্রদের সম্পর্কে কোনো সংবাদ আজাদে প্রকাশ করা হয় নাই। এমনকি গত ৩রা এপ্রিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্রের এম, এ ডিগ্রী প্রত্যাহার, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ৫ বৎসরের জন্য ৪ জন, ৩ বৎসরের ৬ জন এবং ২ বৎসরের জন্য ১৪ জনকে রাষ্টিকেট করার সংবাদও আজাদে প্রকাশ করা যায় নাই।"[৮৩]

বিভিন্ন দমনমূলক ব্যবস্থার পরও আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ১৯৬৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক সভায় মিলিত হয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ২২ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে। ১৯৬৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসকে উপলক্ষ করে এই ২২ দফা দাবির ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলন বিস্তৃতির সম্ভাবনা দেখা দিলে সরকার ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে প্রদেশের সব স্কুল কলেজ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে রাজশাহী ও ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। একইসাথে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশের ওপর পুনরায় কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। এভাবে তখনকার মত ছাত্র আন্দোলন দমন করা সম্ভব হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩. প্রকাশ্য রাজনীতির ওপর বিধিনিষেধ

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে বিভিন্নভাবে প্রকাশ্য রাজনীতির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে রাজনীতিবিদদের হয়রানি করা হয়। রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকদের ওপর গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান পুলিশের তৎকালীন উপপরিদর্শক এ. এম. এ. কবিরের লেখা একটি গোপন প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, *সংবাদ* পত্রিকার সহকারি সম্পাদক কমিউনিস্ট পার্টির রণেশ দাশগুপ্তের গতিবিধির ওপর নজরদারি করা হতো।[৮৪] ব্যাপকহারে রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দ গ্রেফতারের কারণ হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে মূলত দুই ধরনের অভিযোগ আনা হয় – যে সব রাজনৈতিক নেতা ইতোপূর্বে ক্ষমতাসীন ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে আনা হয় দুর্নীতির অভিযোগ। অপরদিকে যাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ আনা সম্ভব ছিল না, তাদের পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার জন্য হুমকি বলে ঘোষণা করা হয়।[৮৫]

আজাদ প্রথম থেকেই আইয়ুব খানের সামরিক শাসন ও মৌলিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান নেয়। ১৯৫৯ সালের ৫ জুলাই 'মৌলিক গণতন্ত্র ও ভাবী শাসনতন্ত্র' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে মৌলিক গণতন্ত্রকে সমর্থন জানিয়ে বলা হয়:

> ... বর্ত্তমান সরকারের কথা ও কার্য্যকলাপ হইতে একথা বেশ পরিস্কার হইয়া যাইতেছে, তারা দেশকে ঢালিয়া সাজিতে চাহিতেছেন এবং নয়া শাসনতন্ত্র কায়েম করার জন্যই তার পশ্চাৎভূমি রচনা করিতেছেন। ... মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই তৎপরতার উদ্দেশ্যেও তাই। ... আগের দিনে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল উপর তলায়। এখন তা ইউনিয়ন, পঞ্চায়েত, জেলা, কাউন্সিল প্রভৃতির মধ্য দিয়া দেশবাসীর হাতে যাইতেছে। এক কথায় একে বলা যাইতে পারে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন। ... আমরা ইহার সাফল্য কামনা করি।[৮৬]

এই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৯ সালের ৪ অক্টোবর 'মৌলিক গণতন্ত্র' শিরোনামে প্রকাশিত আরেকটি সম্পাদকীয়তে মৌলিক গণতন্ত্রের প্রতি জনসমর্থনের আশাবাদ ব্যক্ত করে বলা হয়:

> ... একথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, জনগণের আজ উৎসাহিত হওয়ার অধিকতর কারণ আছে। কারণ তারা নিজেদের কাজের মালিক মোখতার নিজেরাই আজ হইতে যাইতেছে। ... দেশবাসী বিশেষ করিয়া মাটির সাথে যুক্ত জনগণ যে সাগ্রহে সাড়া দিবে, সে বিশ্বাস আমাদের রহিয়াছে।[৮৭]

মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর *আজাদ*, আইয়ুব খানের বিজয়কে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'আস্থা ভোট' শিরোনামে ১৯৬০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মাদ আইয়ুব খাঁর এ সাফল্য সামরিক বিপ্লব। তার সমাপ্ত এবং আবদ্ধ কার্য্যকলাপ, দেশের নবজাগ্রত গণতান্ত্রিক শক্তি ও দেশের সামরিক ও বেসামরিক সহযোগিতার

Dhaka University Institutional Repository

কল্যাণকর পরিণতির প্রতীক বলিয়া আমরা গ্রহণ করিব।"[৮৮] আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারিকে বিপ্লব আখ্যায়িত করে *আজাদ* এটিকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করে মন্তব্য করে:

> পাকিস্তানে যেদিন সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইল, তখন দেশের বাহিরে কোথায়ও কোথায়ও মৃদু গুঞ্জন শুনা গিয়াছিল যে, পাকিস্তানে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটিল। ... সামরিক বিপ্লবের পশ্চাতে যে জনগণের সমর্থন ছিল এবং পাকিস্তান যে দৃঢ় পদক্ষেপে গণতান্ত্রিক পথেই অগ্রসর হইতেছে, ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁ সদর নির্ব্বাচিত হইয়া তাহা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখাইলেন।[৮৯]

এ সময় যেসব রাজনৈতিক নেতাকর্মী গ্রেফতার হন তাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম ১৯৫৮ সালের ১৩ অক্টোবর *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে ছিলেন ৪ জন প্রাক্তন মন্ত্রী, ৩ জন প্রাক্তন প্রাদেশিক সদস্য এবং ৩ জন উচ্চপদস্থ বাঙালি কর্মকর্তা।[৯০] *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরীও এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সামরিক সরকার দেশের কল্যাণে কাজ করছে সেটি প্রমাণ করতে পত্রিকায় রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির কথা প্রচার করা হয়। ১৯৫৯ সালের ১১ আগস্ট *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ১৫০ জন সাবেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি এবং প্রায় ৬০০ জন সাবেক জাতীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তদন্ত করে দেখা হয়।[৯১]

সামরিক শাসনের মধ্যেই ১৯৬২ সালের ২৮ এপ্রিল জাতীয় এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে নতুন সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্তানে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সামরিক আইনের অধীনে রাজনৈতিক সভা সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় প্রার্থীরা নিজেরা কোনো সভা করতে পারেনি। সরকারি উদ্যোগে মূলত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সভাপতিত্বে স্থানীয় পর্যায়ে প্রার্থী পরিচিতি সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত হয়ে মৌলিক গণতন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে নির্বাচনের প্রার্থীগণ তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের বেশিরভাগ প্রার্থী এবং ঢাকার সংবাদপত্র এসব সভা বর্জন করে। কেবলমাত্র সরকার সমর্থক *মর্নিং নিউজ* এসব খবর প্রকাশ করত। নির্বাচনের পর ৩০ এপ্রিল ও ৭ মে *পাকিস্তান অবজারভার* প্রার্থীদের পরিচিতি সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ছাত্ররা এই নির্বাচনের বিরোধিতা করে এতে অংশ না নেওয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানালেও পত্রিকাটির প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, জাতীয় পরিষদের ১৫৬ জন সদস্যদের মধ্যে ১৩৬ জন এর আগে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত ছিলেন।[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২ সালের মে মাসের ১০ তারিখে “The Political Organisation (Prohibition of Unregulated Activities) Ordinance of 1962” নামে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। এতে বলা হয় যে, আসন্ন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত দেশের যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ থাকবে। ১৯৬২ সালের ১৭ জুন তারিখে প্রাদেশিক পরিষদে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি সম্বলিত একটি বিল পাশ হয় এবং ১৮ জুন তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়া হয়। এছাড়া তাজউদ্দীন আহমেদ, আবুল মনসুর আহমদ, কে. জি. মুস্তফাসহ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিককে মুক্তি দেওয়া হয়।[৯৩] *ইত্তেফাক* এ সময় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের দাবিতে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করতে থাকে। ১৯৬২ সালের ২৫ জুন নয়জন রাজনীতিবিদ সংবিধান প্রশ্নে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলনে সরকারের দমনপীড়নের প্রতিবাদে একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতি উদ্ধৃত করে পত্রিকাটি মন্তব্য করে:

> সরকারের উপর জনগণের আস্থা যাহাতে ফিরিয়া আসে তাহার জন্য বিনা বিচারে আটক সব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে। তাহাদের বিরুদ্ধে গৃহীত যাবতীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিতে হইবে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণবায়ু। দেশে অবাধে রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠার পথে যত কিছু বাধা অন্তরায় আছে তাহার অবসান ঘটাইতে হইবে।[৯৪]

বিরোধী রাজনৈতিক দলকে দমন করার জন্য ১৯৬২ সালের ৩০ জুন রাজনৈতিক দল গঠন সম্পর্কে - Political Parties Bill (1961) নামে একটি বিল জাতীয় পরিষদে উত্থাপন করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয় যে, ইসলামি আদর্শ ও পাকিস্তানের সংহতি বিরোধী মতামত প্রচার ও কার্যকলাপ চালানোর উদ্দেশে কোনো দল গঠন করা যাবে না।[৯৫] তবে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এতে বিচলিত না হয়ে ৮ জুলাই পল্টন ময়দানে একটি জনসভা আয়োজন করে। সামরিক শাসন অবসানের পর এই রাজনৈতিক কর্মসূচি ঢাকার বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে অভিনন্দিত হয়েছিল। *পাকিস্তান অবজারভার, আজাদ, ইত্তেফাক* ছবিসহ রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য প্রাধান্য দিয়ে এই জনসভার খবর প্রকাশ করে। শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্ধৃতি দিয়ে *ইত্তেফাক* মন্তব্য করে, “স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যাহারা ইংরেজ প্রভুদের গোলামী করেছিল, তাহারাই আজ দেশের ভাগ্য বিধাতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।”[৯৬] ৮ জুলাই প্রায় দুই লক্ষ লোকের ঐ জনসভায় নয় নেতার বিবৃতি ঘোষণা করা হয়। এরপর পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে আরও অসংখ্য জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। *আজাদ* বিভিন্ন সময়ে সামরিক শাসনের পক্ষে অবস্থান নিলেও দীর্ঘদিন পর রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়ে মন্তব্য করে, “প্রায় চার বছর পর ... পল্টন ময়দান আবার বিপরীত নীতি ও মতবাদের সমর্থক বিভিন্ন সাবেক রাজনৈতিক যৌথ সমাবেশে বক্তৃতার শব্দে মুখরিত হইয়া উঠে।”[৯৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২ সালে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন এই যুক্তিতে আইয়ুব খান তার প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদকাল ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত নির্ধারিত করেন। বিরোধী দলের বিরোধিতা ও দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় সরকার দমননীতি, তোষণনীতি ও রাজনৈতিক ঘুষ প্রদানের বিনিময়ে জাতীয় পরিষদে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ১৯৬২ সালের ১৪ জুলাই – রাজনৈতিক দল আইন (Political Parties Bill) পাশ করে। এই আইন অনুযায়ী 'এবডো'র আওতায় আযোগ্য ঘোষিত হয়ে থাকলে কোনো ব্যক্তি রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারতেন না।[৯৮] সোহরাওয়ার্দী ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে জেল থেকে বের হওয়ার পর বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগ, জামায়াত-ই-ইসলামি, নেজামে ইসলামি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক শ্রমিক পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নুরুল আমীনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের অংশ নিয়ে ১৯৬২ সালের ৪ অক্টোবর 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট – এনডিএফ' গঠন করে এটিকে রাজনৈতিক দলের পরিবর্তে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করেন।[৯৯] এ সময় পত্রিকাগুলো এনডিএফ-কে সমর্থন করে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে। *পাকিস্তান অবজারভার* ও *আজাদ* এক্ষেত্রে ভুমিকা রাখে। ফলে আইয়ুব খান ২১ নভেম্বর নতুন কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে এনডিএফ সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশে বাঁধা সৃষ্টি করেন। পাশাপাশি তিনি পুনরায় 'রাজনৈতিক দল আইন' সংশোধন করেন এবং ১৯৬৩ সালের ৭ জানুয়ারি 'রাজনৈতিক দল' কথাটির ব্যাখ্যা দিয়ে দুটি অধ্যাদেশ জারি করেন। এতে বলা হয় একই উদ্দেশ্য নিয়ে একাধিক ব্যক্তি কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হলে তা রাজনৈতিক দলের অনুরূপ হিসেবে বিবেচিত হবে।[১০০]

একটি পর্যায়ে আইয়ুব খান নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। আগে থেকেই মুসলিম লীগ নামে একটি দল থাকায় ১৯৬২ সালের ৩-৪ সেপ্টেম্বর করাচিতে একটি কনভেনশনের মাধ্যমে কনভেনশন মুসলিম লীগ গঠিত হয়। আইয়ুব খান প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি উদ্যোগে গঠিত এই দলে যোগদান না করলেও কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এই দলের পক্ষে প্রচার প্রচারণায় অবতীর্ণ হন। ১৯৬৩ সালের মে মাসে প্রধান সংগঠক এবং ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে পার্টির প্রেসিডেন্টের পদ লাভ করেন। অপরদিকে আগে থেকেই থাকা মুসলিম লীগ, 'কাউন্সিল মুসলিম লীগ' নামে সংঘবদ্ধ হয়।[১০১] ১৯৬৪ সালের জুন মাসে 'সংবিধান আইন (সংশোধনী), ১৯৬৪' পাশ করে পাকিস্তানে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া হয়। বলা হয়, ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং এরপর যথাক্রমে মার্চ ও এপ্রিল মাসে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন বিভিন্ন বিরোধী দলকে আইয়ুব বিরোধী মঞ্চে সমবেত হওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ তৈরি করে দেয়। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াত-ই-ইসলামি, নেজামে ইসলামি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি – 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (Combined Opposition Party – COP) নামে জোট গঠন করে। জোটের পক্ষ থেকে মিস ফাতিমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়। কনভেনশন মুসলিম লীগের পক্ষে আইয়ুব খান নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানে ৫৩% এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৭৪% ভোট পান। অপর পক্ষে ফাতিমা জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে ৪৭% এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২৬% ভোট পান।[১০২]

এই ফলাফল পূর্ব পাকিস্তানে বিরোধী দলের জনপ্রিয়তা এবং একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। এক্ষেত্রে ঢাকার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। *আজাদ*, *সংবাদ*, *ইত্তেফাক* এবং *পাকিস্তান অবজারভার* ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষ অবলম্বন করে। মূলত এনডিএফ–এ কাউন্সিল মুসলিম লীগ যোগদান করার পর থেকেই *আজাদ*-এর নীতিতে পরিবর্তন আসে। এর আগে ১৯৬২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর 'মোছলেম লীগের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে কনভেনশন মুসলীম লীগের সমালোচনা করে পত্রিকাটি। সরকারের আইন প্রয়োগের মাধ্যমে রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টার প্রতিবাদ করে *আজাদ*। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালের ১২ অক্টোবর 'রাজনীতি ও শাসনতন্ত্র' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটি মন্তব্য করে:

> পাকিস্তানের রাজনীতি আইন-নীতিতে রূপান্তরিত হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে যদি কৃতিত্বের কিছু থাকে তবে তার ষোল আনার মধ্যে আঠার আনাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র উজীর ও সাবেক বিচারপতি হাবিবুল্লাহ খানের প্রাপ্য। কারণ, তিনিই পাকিস্তানের রাজনীতিকে কোনো উপায়ে তার বশে আনিতে না পারিয়া সোজাসুজি আইনের দণ্ড হস্তে আজ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছেন।

আজাদ এতদিন সোহরাওয়ার্দীর বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করলেও এ পর্যায়ে তাঁর প্রশংসা করে মন্তব্য করে:

> জনাব এইচ এস সোহরাওয়ারর্দ্দী জেল হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানে আসিলেন এবং জাতীয় ফ্রন্টের প্রস্তাব লইয়া সারা পশ্চিম পাকিস্তান চষিয়া ফেলিলেন। আর এতদিন পর খান হাবিবুল্লাহ খান জন ফ্রন্টের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গের অভিযোগ আনিলেন এবং এবডোগ্রস্থ নেতাদের কাজে অপরাধ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। ... অত্যন্ত সুখের কথা, জনাব এইচ এস সোহরাওয়ারর্দ্দী খান হাবিবুল্লাহ খানের বিবৃতির একটি জোরাল জবাব দিয়াছেন। তিনি খান হাবিবুল্লাহ খানের বিবৃতিকে বেআইনী বলিয়াছেন। ... আইনে এমন কোনো নির্দেশ নাই যার বলে পাকিস্তানের কোনো নাগরিককে তার রাজনৈতিক মতামত প্রদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে।[১০৩]

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম লীগ ভেঙ্গে কনভেনশন ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া আগে থেকে শুরু হলেও ১৯৬৩ সালের মে মাসে আইয়ুব খান কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রধান সংগঠক হিসেবে যোগদান করার পর *আজাদ* পরোক্ষ ভাবে বিষয়টি সমালোচনা করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৬৩ সালের ১৭ মে মুসলিম লীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করে 'আমাদের রাজনীতি' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়:

> পরিষদের বাহিরের রাজনীতিতে স্বচ্ছতা না আসার কারণের মূলে রহিয়াছে মোছলেম লীগের ভিতরে ভাঙ্গন ও দলাদলি। ... যখন দলীয় রাজনীতি পুনর্গঠনের প্রস্তাব হইল তখন মোছলেম লীগকে তাহার স্বাভাবিক পুনরুত্থানের সুযোগ দেওয়াই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু একদলের আর তর সহিল না। তাহারা রাতারাতি তাড়াহুড়া করিয়া একটি লীগকে মনোনীত করিয়া লইলেন। এভাবেই কনভেনশনপন্থী লীগের জন্ম হইল।[১০৪]

১৯৬৪-৬৫ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনসমূহ বিভিন্ন বিরোধী দলকে আইয়ুব বিরোধী মঞ্চে সমবেত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিলে *আজাদ* বিষয়টির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে 'বিরোধী দলের ঐক্য' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এখানে ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে পত্রিকাটি মন্তব্য করে:

> বিরোধীদলগুলি অতি গুরুতর রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইতেছে। ... ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও নেতৃত্বাভিলাষের ক্ষতিকে বিরোধীদলগুলির মাঝখানে আর বড় হইয়া উঠিতে না দিয়া সংহত ঐক্যজাট গঠন এবং বিরোধীদলগুলিকে দায়িত্ব সম্পাদনে সক্ষম করিয়া তোলার আন্তরিকতা প্রদর্শনের যে চ্যালেঞ্জ আসিয়াছে, নেতাদিগকে সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে হইবে।[১০৫]

এরপর কয়েকদিন আজাদ নির্বাচন নিয়ে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্মিলিত বিরোধীদলের পক্ষ অবলম্বন করে *আজাদ* সরকারের দমনপীড়ন ও মৌলিক গণতন্ত্রের সমালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৯৬৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 'নির্ব্বাচন ও নির্য্যাতন' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বিরোধী দলের ওপর সরকারের নির্যাতনের সমালোচনা এবং আটক রাজনৈতিক নেতাকর্মী সাংবাদিকদের মুক্তি দাবি করে বলা হয়:

> অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধানের একমাত্র পথ হইতেছে নির্ব্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে অংশগ্রহণে বিরোধী দলকে অবাধ সুযোগ দেওয়া। ... সরকারের নিকট যে সব বক্তব্য মধুর শুধু সেসব শোনার অধিকারই যদি জনসাধারণের থাকে তাহা হইলে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের কোন অর্থই হয় না।[১০৬]

১৯৬৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট পার্থী হিসেবে সম্মিলিত বিরোধী দল মিস ফাতিমা জিন্নাহর নাম ঘোষণা করলে পরদিন ১৮ সেপ্টেম্বর *আজাদ* এ সম্পর্কিত যে সংবাদ প্রকাশ করে সেটি ছিল অনেকটা নির্বাচনি পোস্টারের মতই। ঐ দিন পত্রিকাটির শিরোনাম ছিল, "সম্মিলিত বিরোধী দলের ঐক্য-জিন্দাবাদ, গণতন্ত্রের ঐক্য জিন্দাবাদ, পাকিস্তান পায়েনদাবাদ, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী হিসেবে মিস ফাতেমা জিন্নাহর প্রতিদ্বন্দ্বিতা" আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার পর থেকে *আজাদ* বিভিন্ন ভাবে মৌলিক গণতন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

এবং আইয়ুব খানের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে সংবাদ পরিবেশন করলেও এ পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে *আজাদ* তার নীতিতে পরিবর্তন আনে। ১৯৬৪ সালের ৩ অক্টোবর 'গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে মৌলিক গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের সমালোচনা করা হয়। জনগণের প্রকৃত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে পত্রিকাটি মন্তব্য করে:

> মৌলিক গণতন্ত্র আদৌ মৌলিক কিনা এবং গণতন্ত্রের ছিটেফোটা ইহাতে আছে কি, এই প্রশ্ন পাশ কাটাইয়া গিয়া নামের নিশান উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, পাকিস্তানীদিগকে গণতন্ত্র দেওয়া হইয়াছে, দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইতে দেওয়া হইয়াছে। ... গণতন্ত্র যদি না থাকে তাহা হইলে সেখানে থাকিতে পারে স্বৈরতন্ত্র, ফ্যাসিজম বা কম্যুনিজম। হাল আমলে গণতান্ত্রিক আদর্শের জোরালো যুক্তির ধার যাহারা আগ্রাহ্য করিতে পারেন না, অথচ নিজেরা গণতন্ত্র চাহেন না, তাহাদের কাহারো কাহারো মুখে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের কথা শোনা যায়।[১০৭]

এখানেও *আজাদ* ধর্মকে সামনে নিয়ে আসে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের উদাহরণ টেনে *আজাদ* স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে, জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলে যে, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য ও জনগণকে নিয়ে সরকার গঠনের পক্ষে একবাক্যে রায় দেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়।[১০৮] ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষ অবলম্বন করে *আজাদ* আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপন করে, এটিই ছিল প্রথমবারের মত আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পত্রিকাটির কোন সংবাদ। *আজাদ* অভিযোগ করে যে, আইয়ুব খান তার নির্বাচনি ইশতাহারের বঙ্গানুবাদ পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি প্রেসে মুদ্রণ করে সেটি সরকারি দফতরের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে বিতরণ করেছেন।[১০৯] এরই ধারাবাহিকতায় *আজাদ* ১৯৬৪ সালের ২১ নভেম্বর 'নির্ব্বাচন, সরকার ও বিরোধীদল' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বিরোধী দলের আস্থা অর্জনের মাধ্যমেই সরকারকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

আজাদ অধিকাংশ সময় সাম্প্রদায়িক ধারার প্রতিনিধিত্ব করলেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে পত্রিকাটি অবস্থান পরিবর্তন করে।। 'ইসলামী রাষ্ট্রে মহিলা রাষ্ট্র প্রধান নাজায়েজ'- সরকারি দলের এ ধরনের প্রচারণার জবাবে ১৯৬৪ সালের ৭ ও ১৫ ডিসেম্বরের সংখ্যায় পত্রিকাটি বিশিষ্ট আলেম ওলামাদের ব্যাখ্যা ও বিবৃতি প্রকাশ করে। *আজাদ* মূলত বলার চেষ্টা করে যে, অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রপ্রধান পদে মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে ইসলামি আইনে কোনো বাধা নেই।

ইত্তেফাক একই ভাবে নির্বাচনের আগে ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে সংবাদ, সম্পাদকীয়, সচিত্র জীবনী, জেলা ও থানা পর্যায়ে কর্মতৎপরতার খবর প্রকাশ করে। ১৯৬৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ৮ কলাম জুড়ে *ইত্তেফাক*-এর শিরোনাম ছিল, "সরকারী লীগের প্রার্থী ফিল্ড মার্শাল আয়ুবের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মিস

Dhaka University Institutional Repository

ফাতেমা জিন্নাহ মনোনীত"। ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে জনমত গড়ে তোলার কৌশল হিসেবে ১৯৬৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর সম্মিলিত বিরোধী দল 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালন উপলক্ষ্যে প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। হরতাল পালনের সফলতার বর্ণনা দিয়ে পত্রিকাগুলো বিষয়টিকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা হিসেবে প্রচার করে। ৩০ সেপ্টেম্বর *ইত্তেফাক* শিরোনাম করে, "সর্বত্র হরতাল সভা ও বিক্ষোভ মিছিল, প্রেসিডেন্ট আয়ুবের প্রতি অনাস্থা"। একই দিন পত্রিকাটি 'ভীমরুল' ছদ্মনামে 'মিঠেকড়া'-তে "এই জন-তরঙ্গ রুখিবে কে?" শিরোনামে উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

এ সময় *ইত্তেফাক* প্রায় প্রতিদিন নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করতে থাকে। ১৯৬৪ সালের অক্টোবরে 'মিঠেকড়া' উপ-সম্পাদকীয়তে ১৩ টি নিবন্ধের মধ্যে ১০টিতেই আইয়ুব খানের সমালোচনা করা হয়েছে বা ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে ভোট চাওয়া হয়েছে।[১১০] ক্ষমতাসীন দল থেকে সম্মিলিত বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দকে ভাড়াটিয়া খচ্চর, বন্য বিড়াল ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হলেও *ইত্তেফাক* কৌশলে ও যুক্তি প্রদর্শন করে জনমত তৈরির চেষ্টা করে। ১৯৬৪ সালের ৪ অক্টোবর 'মিঠেকড়া' উপ-সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়, "... প্রেসিডেন্ট আয়ুব কর্তৃক রাজনৈতিক দলগুলোকে গালিগালাজ করা তাহাদের 'বন্য বিড়াল' আখ্যায়িত করা, সর্বোপরি মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহর দেশ প্রেমের উপর কটাক্ষ করা ভবিষ্যতে পরাজয়েরই লক্ষণ।" নির্বাচনের দিন 'মিঠেকড়া' উপ-সম্পাদকীয়তে একজন দিকভ্রান্ত উচ্চাভিলাষী মানুষের ক্ষমতালিপ্সার কাছে মাথানত না করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জনানো হয়।

ট্রাস্ট মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো আইয়ুব খানের পক্ষে প্রচারণা চালায়। ২৯ সেপ্টেম্বরের হরতালে প্রধান প্রধান শহরের জীবনযাত্রা কার্যত অচল হয়ে পরলেও ট্রাস্ট মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো এই সম্পর্কিত কোন সংবাদ বা ছবি প্রকাশ করেনি।

নির্বাচনে ফাতিমা জিন্নাহ পরাজিত হওয়ার পরও বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে *ইত্তেফাক* সংবাদ প্রকাশ অব্যাহত রাখে। ১৯৬৫ সালের ৫ জানুয়ারি *ইত্তেফাক* সিকান্দার আবু জাফরের বিখ্যাত কবিতা 'সংগ্রাম চলবেই' প্রকাশ করে। কবিতাটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি –

জনতার সংগ্রাম চলবেই

আমাদের সংগ্রাম চলবেই

হতমানে অপমানে নয় – সুখ সম্মানে

বাঁচাবার অধিকার কাড়তে

দাস্যের নির্মোক ছাড়তে

Dhaka University Institutional Repository

অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ

চলবেই চলবেই

আমাদের সংগ্রাম চলবেই।[১১১]

ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়া আইয়ুব খানের সমালোচনা করে বলেন, "১৯৬৫ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট বিজয়ী হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই বিজয়ের পেছনে যে ব্যাপক অসাধুতা ছিল তা নিশ্চয়ই তার অজ্ঞাত ছিল না"[১১২] নির্বাচনে ফাতিমা জিন্নাহকে সমর্থনের মূল্যও দিতে হয় পত্রিকাগুলোকে। ঢাকায় অবাঙালি জনগোষ্ঠীর কিছু লোক আইয়ুব খানের বিজয় উপলক্ষে একটি মিছিল বের করে। এই মিছিল থেকে *আজাদ* ও *সংবাদ* অফিসে হামলা চালানো হয়। ফলে আইয়ুব খান নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর *আজাদ* পুনরায় তার নীতিতে পরিবর্তন আনে। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর দিনটিকে 'বিপ্লব দিবস' হিসেবে অভিহিত করে *আজাদ* আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের প্রশংসা করে। আইয়ুব খান বিভিন্ন ভাবে রাজনীতিবিদ ও গণমাধ্যমের ওপর দমন পীড়ন এবং মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করলেও *আজাদ* বিষয়গুলো এড়িয়ে যায়। নতুন শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রশংসা করে পত্রিকাটি মন্তব্য করে:

> ... ১৯৫৮ সালের ২৭ শে অক্টোবর তারিখে জনাব এস্কান্দার মির্জ্জা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব হইতে বিদায় গ্রহণ করেন এবং মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর ও প্রেসিডেন্টের যৌথ দায়িত্ব ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের উপর ন্যাস্ত হয়। পাকিস্তানের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।[১১৩]

পাশাপাশি *আজাদ* সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে নতুন সংবিধান প্রণয়ন এবং এর ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রশংসা করে।

৪. ১৯৬২ সালের সংবিধান

আইয়ুব খান পাকিস্তানের নতুন সংবিধান প্রণয়নে একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশন চল্লিশটি প্রশ্নমালা সংবলিত ত্রিশ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা মুদ্রণ করে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও উপযুক্ত সংগঠনের কাছে বিলি করে। অনেকে কমিশনের সামনে উপস্থিত হয়ে আবার কেউ কেউ লিখিতভাবেও তাদের মতামত দেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ এক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। পত্রিকা সম্পাদকদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

যারা মতামত প্রদান করেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন - আবদুস সালাম (*পাকিস্তান অবজারভার*), তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া (*ইত্তেফাক*), আবুল কালাম শামসুদ্দিন (*আজাদ*) এবং জহুর হোসেন চৌধুরী (*সংবাদ*) প্রমুখ।[১১৪] কমিশনের কাছে এসে অথবা লিখিতভাবে মতামত প্রদানকারীদের সম্পর্কেও পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

পাকিস্তান অবজারভার ১৯৬০ সালের ৩০ জুন সংখ্যায় উল্লেখ করে যে, রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান ১৪ পৃষ্ঠার একটি লিখিত বক্তব্য কমিশনে পেশ করেছেন।[১১৫] অপরদিকে শাসনতন্ত্র কমিশন নিয়োগের বিষয়টি *আজাদ* সমর্থন করে। ১৯৬০ সালের ১০ জুন 'শাসনতন্ত্র কমিশনের বৈঠক' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে কমিশন নিয়োগের প্রশংসা করে বলা হয়:

> ... ফলে যাহারা কমিশনের নিকট মতামত পেশ করিবেন, তাঁহাদের অখণ্ডনীয় যুক্তি কমিশনকে প্রভাবিত করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। ... বস্তুত: ইহাতে স্বাধীন ও সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ ও প্রচারে কমিশনের পক্ষ হইতে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে এবং সুষ্ঠভাবে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের রূপ নির্দ্ধারনের দায়িত্ব পালনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কমিশন অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গতভাবেই ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন।[১১৬]

তবে শাসনতন্ত্র কমিশনের সামনে দেওয়া সাক্ষাৎকারের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর সামরিক সরকার সাক্ষাৎকার গ্রহণ পর্বে সাংবাদিকদের থাকার অনুমতি প্রত্যাহার করে নেয়। কারণ সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের মূল বক্তব্য ছিল সামরিক শাসনের বিলুপ্তি এবং সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন। এমনকি সংবাদপত্রে আইয়ুব বিরোধী কিছু যেন প্রচার করা না হয় সে বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।[১১৭]

১৯৬২ সালের ১ মার্চ আইয়ুব খান তার নতুন সংবিধান অনুমোদন ও প্রকাশ করেন। সংবিধান ঘোষণা উপলক্ষে আগের দিন করাচিতে সারা দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এখানে সংবিধানের কপি বিতরণ করা হয়। তবে দু-একটি ছাড়া ঢাকার সংবাদপত্রগুলো সংবিধানের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো মন্তব্য করেনি।[১১৮] সরকারের দমননীতি এ পরিস্থিতি তৈরি করে। সংবিধান বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনার অভিযোগে *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকায় কর্মরত কে. জি. মুস্তফাসহ কয়েকজন সাংবাদিককে আটক করা হয়। *পাকিস্তান অবজারভার* সম্পাদক আবদুস সালাম সংবিধান সম্পর্কে সমালোচনা না করার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, "If I cannot report unfavorable reaction, I shall not report anything." [১১৯]

আইয়ুব খান রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ খরচ করে বিদেশ থেকে সাংবাদিক, রাজনীতিক, কূটনীতিক ও পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করে এনে দেশের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়ে প্রশংসাসূচক সনদ গ্রহণ করেন। এসব পণ্ডিত ব্যক্তিদের

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম ছিলেন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি, রাশব্রুক উইলিয়ামস, স্যার পার্সিভাল গ্রিফিথস প্রমুখ।[১২০] ঢাকার পত্রিকাগুলো বিষয়টি নিয়ে তেমন প্রতিক্রিয়া না দেখালেও *ইত্তেফাক* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) বিদেশিদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে মন্তব্য করেন:

> ...আমরা অশিক্ষিত, দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ। তাই আমরা দেশ শাসনের অযোগ্য। ... এই যুক্তিগুলি দর্শাইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই দেশে শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখিয়াছেন। ... এই দেশের অজ্ঞ নিরক্ষর জনসাধারণের সুচিন্তিত বিচার বুদ্ধির ফলে যে বৃটিশকে একদিন পাক-ভারত ত্যাগ করিতে হইয়াছে, তাঁহাদের কাহারও সার্টিফিকেটকে যাঁহারা কাজে লাগাইতে চাহেন, তাঁহাদের বিচার বুদ্ধি সম্পর্কেই আজ প্রশ্ন ওঠা কি স্বাভাবিক নয়? [১২১]

মানিক মিয়া ব্যক্তিগতভাবে মৌলিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন এবং এটিকে কায়েমী স্বার্থ তৈরির একটি প্রচেষ্টা হিসেবে অভিহিত করেন।[১২২]

১৯৬২ সালের ৮ জুন থেকে কার্যকর হওয়া পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধানে বাঙালিদের অধিকার ও দাবি দাওয়া উপেক্ষিত হলে সেটির প্রতিবাদ করে ২৫ জুন ৯ জন রাজনীতিবিদ একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে জনগণ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি গণপরিষদ নির্বাচনের দাবি করা হয়।[১২৩] ১৯৬২ সালের ২৫ জুন বিবৃতিটি *ইত্তেফাক* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিবৃতির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে *ইত্তেফাক* মন্তব্য করে:

> সত্যিকার গণ প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কোন ব্যক্তি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার অধিকারী নয়। করিলে তাহা স্থায়ী, সহজ ও কার্যকরী হইতে পারে না। ... শাসনতন্ত্রকে স্থায়িত্বে বিশিষ্ট্যমণ্ডিত ও গুণসম্পন্ন হইতে হইলে সমগ্র জাতির ইচ্ছা ও বিচার বুদ্ধির প্রতিফলন অবশ্যই থাকিতে হইবে। ... বর্তমান শাসনতন্ত্রে এই গুণাবলী না থাকায় এটা অন্তঃসারশূন্য। যতই প্রচার করা হউক না কেন, জনমতের প্রতি উপেক্ষা ও অনাস্থাই হইতেছে এই নয়া শাসনতন্ত্রের ভিত্তিভূমি।[১২৪]

তবে *ইত্তেফাক*-এর বিপরীত অবস্থান নেয় *আজাদ*। পত্রিকাটি নয় নেতার বিবৃতিকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে নয় নেতাকে সাবেক এবং তাদের বক্তব্যকে অনাবশ্যক বলে উল্লেখ করে। পাশাপাশি সোহরাওয়ার্দীর কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে পত্রিকাটি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই *আজাদ* তার নীতিতে আবারও পরিবর্তন আনে এবং এবডো চিহ্নিত রাজনীতিবিদদের পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় সোহরাওয়ার্দীর প্রশংসা করে।[১২৫] অন্যদিকে সরকারি মুখপত্র *মর্নিং নিউজ* নয় নেতার বিবৃতির সমালোচনা করে এর বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।[১২৬]

কারামুক্তির পর পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে সোহরাওয়ার্দী ১৯৬২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর লাহোরে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) গঠনের ঘোষণা দেন। ২৭ সেপ্টেম্বর লাহোরে *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সোহরাওয়ার্দী নিজে এই জোট গঠনের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। পশ্চিম

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানে এই জোট গঠনের ঘোষণা দেওয়া হলেও এর ভিত্তি স্থাপিত হয় পূর্ব পাকিস্তানে নয় নেতার বিবৃতির মাধ্যমে।

আইয়ুব খান নতুন সংবিধান রচনার আগে থেকেই *আজাদ* ভবিষ্যৎ সংবিধানের ইসলামি দিকটিকে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এর আগে ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ইসলামি দিকটিকেও *আজাদ* সমর্থন দিয়েছিল। ১৯৫৮ সালের ২৪ অক্টোবর 'জাতীয় ঐক্য' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে *আজাদ* পত্রিকার সাম্প্রদায়িক চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্পাদকীয়টিতে আইয়ুব খানের প্রশংসা করে বলা হয়:

> জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান এই জাতীয় ঐক্যের উপরই জোর দিয়াছেন এবং আঞ্চলিক, স্থানীয় ও অন্যান্য সর্ব্ব প্রকারের বৈষম্য ভুলিয়া সকলকে একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ... কিন্তু এসবের উপর রহিয়াছে তাদের পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের ঐক্য। অত্যন্ত দু:খের বিষয়, এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্যকে বলিষ্ঠ বুনিয়াদের উপর গড়িয়া তোলার কোন আন্তরিক চেষ্টা এ পর্যন্ত হয় নাই। ... কিন্তু এছলামকে বাস্তব জীবনে রুপায়িত করার কোন আন্তরিক ও সুষ্ঠ পরিকল্পনা অতীতের কোন সরকার গ্রহণ করে নাই। ... নয়া শাসন ব্যবস্থার নিকট এ দিক থেকে দেশ ও জাতি আজ অনেক কিছুই আশা করে।[১২৭]

পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির প্রাথমিক পর্যায়ে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রদান করার পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেও *আজাদ* সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৫৮ সালের ৪ ডিসেম্বর 'পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে *আজাদ* এই তোষণমূলক চরিত্রের প্রকাশ ঘটায়। এতে বিবিসি প্রচারিত আইয়ুব খানের টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের সূত্র ধরে বলা হয়:

> ... তিনি বলিয়াছেন যে, আইন যারা প্রণয়ন করিবেন, দেশের শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তাঁদের পক্ষে উচিত হইবে না। ... প্রেসিডেন্টের উপরিউক্ত উক্তির যৌক্তিকতা অস্বীকার করা অসম্ভব। পাকিস্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল যার আন্তরিক ভাবে কাম্য, তিনিই মাত্র এরূপ উক্তি করিতে পারেন।

আইয়ুব খান সাম্প্রদায়িক নীতি গ্রহণ করে পাকিস্তানের নতুন সংবিধানকে ইসলামিক আদর্শের ভিত্তিতে রচনার উদ্যোগ নেন। বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো আজাদ স্বাভাবিক ভাবেই বিষয়টিকে অভিনন্দন জানায়। আইয়ুব খানের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে *আজাদ* চরম সাম্প্রয়ায়িক নীতি অবলম্বন করে। ১৯৫৯ সালের ১৬ মার্চ, 'শাসনতন্ত্র ও জনমত' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে "পাকিস্তান মোটামুটি মুছলমানের দখলে" উল্লেখ করে মন্তব্য করা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

> ... এছলামী আদর্শের প্রতি বর্তমান সরকার যে শ্রদ্ধাশীল এর প্রমাণ যথেষ্ট পাইয়া এছলামের মহান আদর্শের লক্ষ্য রাখিয়া জাতি গঠন করার দায়িত্ব সম্পর্কে সরকারি মুখপাত্রদের অনেকেই উপদেশ দিয়াছেন। ... বর্তমান সরকার যে এছলামী শাসনতন্ত্রের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন না, এ কথা জোর করিয়াই বলা যায়।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬০ সালের ২৭ জানুয়ারি 'শাসনতন্ত্র ও রাজনীতি' শিরোনামে প্রকাশিত অপর একটি সম্পাদকীয়তেও এই সাম্প্রদায়িক চরিত্রের প্রকাশ ঘটে। ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে ইসলামি আদর্শের প্রতিফলন ঘটনোর ঘোষণা দেওয়ায় সম্পাদকীয়টিতে আইয়ুব খানের প্রসংশা করা হয়। কিন্তু এ সময় আইয়ুব খানের সরকার রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকদের প্রতি বিভিন্ন দমনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও আজাদ এগুলোর প্রতিবাদে কোনো প্রতিবেদন বা সম্পাদকীয় প্রকাশ করেনি। তবে একটি পর্যায়ে বিশেষত সরকারপন্থিদের সহায়তায় মুসলিম লীগ ভেঙ্গে কনভেনশন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর *আজাদ* তার নীতিতে পরিবর্তন আনে। ১৯৬২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর 'মোছলেম লীগের ভবিষ্যৎ' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে সংবিধানের 'অগণতান্ত্রিক' চরিত্রের সমালোচনা এবং কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলা হয়:

> ... দেশে আজ শাসনতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক করিয়া তোলার জন্য একটি আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এ আন্দোলন সকল গণতন্ত্রধর্মী দল ও প্রতিষ্ঠানের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করিতেছে। মোছলেম লীগের কনভেনশনপন্থীদের সাথে এ আন্দোলনের বিরোধ আছে এবং থাকাও বিচিত্র নয়। তবে মোছলেম লীগের কাউন্সিলপন্থীদের সাথে এরূপ আন্দোলনের কোনো বিরোধ নাই।

সামরিক শাসনের পক্ষ অবলম্বন করলেও এ পর্যায়ে *আজাদ* মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি গুরুত্ব দেয়। ১৯৬২ সালের ১ অক্টোবর 'গণতান্ত্রিক রাজনীতি' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে নতুন সংবিধানে মানুষের মৌলিক অধিকারের বিষয়টি আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত হওয়ায় এর সমালোচনা করা হয়।

সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) – এ কাউন্সিল মুসলিম লীগ যোগদান করার পর *আজাদ*-এর এই অবস্থান আরও তীব্র হয়। প্রথম থেকেই সংবিধানের প্রশংসা করলেও *আজাদ* এ পর্যায়ে সংবিধানকে 'গোঁজামিল' হিসেবে উল্লেখ করে। ১৯৬৩ সালের ১৭ মে 'আমাদের রাজনীতি' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে *আজাদ* মন্তব্য করে:

Dhaka University Institutional Repository

> ... নয়া শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের সময় হইতেই দেশে একটা এলোমেলো অবস্থা দেখা দিয়াছিল। ... আমাদের পরিষদীয় ও বাইরের রাজনীতির বিশৃঙ্খলার পশ্চাতে হয়ত অনেক কারণ রহিয়াছে। তবে প্রধানতঃ তার কারণ দুইটি। একটি হইল আমাদের শাসনতান্ত্রিক গোঁজামিল এবং আর একটি হইল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ঘরোয়া কোন্দল।

তবে আইয়ুব খানের সরকার প্রণীত সংবিধানের সমালোচনা করলেও *আজাদ* সাম্প্রদায়িক নীতি থেকে বের হতে পারেনি। সংবিধানকে প্রকৃত ইসলামি চরিত্র দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে পত্রিকাটি ১৯৬৩ সালের ২৮ এপ্রিল 'পাঁচ দফা কর্মসূচী' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে শাসনতন্ত্রের ইসলামি চরিত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে মন্তব্য করে:

> বর্ত্তমান সরকারও এছলামী শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনে আগ্রহশীল। এ সম্পর্কেও এখানে কোনরূপ বিতর্কে না নামিয়া শুধু আমরা জানাইয়া রাখিতে চাই যে, সত্যিকারের এছলামী শাসনতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠিত হোক। রাষ্ট্রের নাম ও কাজের ভিতর দিয়া ইহা অভিন্ন হইয়া সত্যিকারের সার্থকতা লাভ করুক।

এভাবে ১৯৬২ সালের সংবিধানকে ভিত্তি করে *আজাদ* সাম্প্রদায়িক চরিত্র নিয়ে আবির্ভূত হয় যা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিপন্থি।

৫. সাম্প্রদায়িক সংঘাত

১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানেও একটি দাঙ্গা সৃস্টি করা হয়। দাঙ্গার অভিযোগের বিষয় ছিল কাশ্মীরের একটি মসজিদে রক্ষিত হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর কেশ আকস্মিক চুরি হয়ে যাওয়া। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এটিকে 'হিন্দুদের কাজ' বলে অভিযোগ আনে এবং দেশবাসী মুসলমানদের এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উসকানি দিতে থাকে। এই উসকানির ফলে পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। মূলত রাজনৈতিক কারণে সরকার দাঙ্গায় উৎসাহ দেয়। সরকার বিরোধী ক্রমবর্ধমান গণবিক্ষোভ একটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই অবাঙালি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে ছাত্ররা আন্দোলন গড়ে তোলে। ১০ জানুয়ারি এই দাঙ্গা ভায়াবহ আকার ধারণ করে এবং তা বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গায় পরিণত হয়। এই দাঙ্গায় হিন্দুদের রক্ষা করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরামের সভাপতি কবি আমির হোসেন চৌধুরী এবং ১৬ জানুয়ারি ঢাকার নটরডেম কলেজের অধ্যাপক ফাদার নোভাক নিহত হন। মোহাম্মদপুরের বিহারিরা ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের মেয়েদের হোস্টেলে আক্রমণ চালায়।[১২৮] এই দাঙ্গা শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী প্রবণতা বৃদ্ধি করে যার ভিত্তি অসাম্প্রদায়িকতা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতি মোকাবেলায় ঢাকার সাংবাদিক ও সংবাদপত্র একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৪ সালের ১৪ জানুয়ারি *ইত্তেফাক* দেশবাসীকে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা ও ধর্মান্ধতার শিকারে পরিণত না হওয়ার জন্য বারবার আহ্বান জানিয়ে মন্তব্য করে:

> ... সীমান্ত পারের ঘটনার নামে দেশ, জাতি ও মানবতার চির দুশমন এবং সভ্যতার কলঙ্ক সমাজদ্রোহীরা নারায়ণগঞ্জের শিল্প এলাকা ও ঢাকায় যেভাবে মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে তাহা সর্বশক্তি দিয়া প্রতিরোধের জন্য শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন দেশবাসীর কাছে আকুল আবেদন জানাইতেছি।

পরদিন ১৫ জানুয়ারি সম্পাদকীয় কলামে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছাড়ানোর জন্য সরকারের তীব্র নিন্দা করার পাশাপাশি দাঙ্গা প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে *ইত্তেফাক* মন্তব্য করে, "সীমান্তের অপর পারে যাহাই ঘটুক, আমাদের স্বদেশভূমিকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ও আত্মঘাতী রক্তপাত হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য এ দেশের কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত, ছাত্র বুদ্ধিজীবী সকলের প্রতি আমরা পুনর্বার আহ্বান জানাইতেছি।" সর্বদলীয় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠনের জন্য জাতীয় প্রেস ক্লাবের উত্তরে সাইদুল হাসান নামে এক ব্যবসায়ীর অফিসে বৈঠক বসে। বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এবং প্রগতিশীল ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা যোগ দেন। সাংবাদিকদের মধ্যে মানিক মিয়া (*ইত্তেফাক*), আবদুস সালাম (*পাকিস্তান অবজারভার*), জহুর হোসেন চৌধুরী (*সংবাদ*) সহ বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক ও নেতৃস্থানীয় সাংবাদিকরা দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এই কাজে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণে এগিয়ে আসেন সিরাজুল হোসেন খান, ওয়াহিদুল হক, আহমেদুর রহমান এবং আনোয়ার জাহিদ।[১২৯] ঘোষণাপত্র লেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় তবে মূল দায়িত্ব পড়ে সিরাজুদ্দিন হোসেন ও আবদুল গাফফার চৌধুরীর ওপর।[১৩০] *ইত্তেফাক* সম্পাদক মানিক মিয়ার নেতৃত্বে সমাজের সর্বস্তরের নাগরিকদের নিয়ে ১৯৬৪ সালের ১৬ জানুয়ারি গঠিত হয় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমটি। ১৭ জানুয়ারি *ইত্তেফাক* ও *সংবাদ* পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে একটি আবেদনপত্র প্রকাশ করা হয়। এই আবেদনপত্রটি থেকে দাঙ্গার একটি প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায়। এতে বলা হয়:

> সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তদের ঘৃন্য ছুরি আজ ঢাকা, নারায়াঙ্গঞ্জ ও অন্যান্য স্থানের শান্ত ও পবিত্র পরিবেশ কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। ... হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষের ঘরবাড়ী পোড়ান হইতেছে ... এই সর্বনাশা জাতীয় দুর্দিনে আমরা মানবতার নামে দেশবাসীর কাছে আকুল আবেদন জানাইতেছি, আসুন সর্বশক্তি লইয়া গুণ্ডাদের রুখিয়া দাঁড়াই। শহরে শক্তি ও পবিত্র পরিবেশ ফিরাইয়া আনি। ... প্রতি মহল্লায় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করুন; গুণ্ডাদের সায়েস্তা করুন নির্মূল করুন; পূর্ব পাকিস্তানের মা বোনের ইজ্জত ও নিজেদের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করুন।[১৩১]

এই আবেদনে বলা হয়, "এই দুশমনদের আজ রুখিতে না পারিলে ভবিষ্যতে এই ঘাতক শ্রেণির ছুরি আমাদের সকলের জীবন ও সম্পত্তির উপর উদ্যত হইবে। আমাদের চোখের সামনে আমাদের মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠিত

Dhaka University Institutional Repository

হইবে, পূর্ববঙ্গের মানুষ নিজগৃহে পরবাসী হইবে।" ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য প্রমাণিত হয়।

পাকিস্তান অবজারভার এই আবেদনটি সংবাদ আকারে প্রকাশ করে। তবে সাম্প্রদায়িক নীতির সমর্থক *মর্নিং নিউজ* ও *পয়গাম* এই আবেদনপত্র প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। দাঙ্গা বিরোধী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করার জন্য *ইত্তেফাক, সংবাদ* ও *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকাকে দুষ্কৃতকারীরা হুমকি প্রদান করে।[১৩২] *ইত্তেফাক* পত্রিকার তৎকালীন সাংবাদিক রোকনুজ্জামান খান (দাদা ভাই) ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। কাপ্তান বাজার এলাকায় কিছু গুণ্ডা শ্রেণির লোক লোহার বড় ছুরি ইত্যাদি নিয়ে *ইত্তেফাক* অফিসে হামলা করতে এলে সম্পাদক মানিক মিয়াসহ অন্যান্য সাংবাদিকরা হাতের কাছে যা পান, যেমন - ভাঙ্গা চেয়ার বা টেবিলের অংশ, ইটের টুকরা নিয়ে দুষ্কৃতকারীদের প্রতিরোধ করতে এগিয়ে যান।[১৩৩]

অসাম্প্রদায়িক নীতি প্রকাশের কারণে এ তিনটি পত্রিকা তৎকালীন সরকারের রুদ্ররোষে পরিণত হয়। ১৭ জানুয়ারি *ইত্তেফাক*-এ 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক যে আবেদনপত্রটি প্রচার করা হয় তাতে মুদ্রাকর ও প্রকাশকের কোনো নাম ঠিকানা উল্লেখ ছিল না। আবেদনপত্রটির নিচে শুধু 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' লেখা ছিল। মূলত সরকারের দমনপীড়ন থেকে রক্ষা পেতেই এই কৌশল নেওয়া হয়। কিন্তু প্রচারপত্র মুদ্রণের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের কারণে *পাকিস্তান অবজারভার* সম্পাদক আব্দুস সালাম, *ইত্তেফাক* সম্পাদক মানিক মিয়া এবং *সংবাদ* সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রাদেশিক সরকার ১৯৬০ সালের প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অধ্যাদেশের ২ ধারার 'গ' উপ-ধারার ৫০, ৫২(১) (২) ধারা বলে মামলা করে।[১৩৪] মামলাটি সংবাদপত্রে 'প্রচারপত্র মামলা' নামে খ্যাতি পায়। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁদের শাস্তি পেতে হয়নি। দীর্ঘ পাঁচ বছর মামলাটি চলার পর ১৯৬৯ সালের ৫ এপ্রিল সরকার মামলাটি প্রত্যাহার করে।[১৩৫] দাঙ্গা প্রতিরোধে *ইত্তেফাক* সবচেয়ে সাহসী ভূমিকা পালন করায় পত্রিকাটিকে সরকারি পীড়নের শিকার হতে হয়। ১৭ জানুয়ারি *ইত্তেফাক* আবেদনপত্র প্রকাশ করা ছাড়াও 'দুর্বৃত্তদের দৌরাত্মে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বিভীষিকা অব্যাহত', 'মুসলিম দরদীদের আক্রমণে তৃতীয় দিনেও বহু মুসলমান হতাহত', পশুশক্তি রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য সাধারণ নাগরিকদের দৃঢ় মনোভাব' ইত্যাদি শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। এছাড়া 'প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলুন' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। উক্ত শিরোনামে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশের দায়ে ১৯৬৪ সালের ২৮ মার্চ প্রাদেশিক সরকার ১৯৬০ সালের প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অধ্যাদেশ বলে পত্রিকাটির সম্পাদক মানিক মিয়ার কাছে ২৫ হাজার টাকা জামানত তলব করেন।[১৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে সরকারি দমনপীড়ন উপেক্ষা করে ঢাকার পত্রিকাগুলো অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশে ভূমিকা রাখে।

৬. বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত

হাজার মাইলেরও বেশি ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন দুই ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত পাকিস্তানে ধর্ম ছাড়া বস্তুত আর কোন ঐক্যসূত্র ছিল না। পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই নাজুক বাস্তবতা সম্পর্কে দেশটির শাসকরা আগা গোড়াই সচেতন ছিলেন। তারা জানতেন ভাষা ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যই পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাতন্ত্র্যবোধের এক বড় উৎস যেটি অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। এটিকে অবলম্বন করে ভবিষ্যতে যেন বিচ্ছিন্নতাবাদ গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য পাকিস্তানের জন্ম থেকেই তাদের লক্ষ্য ছিল এই স্বাতন্ত্র্যবোধ লোপ করা। আইয়ুব খানের শাসনামল এর ব্যতিক্রম ছিল না। বাঙালি জনগণ রক্তের বিনিময়ে ভাষার দাবি অর্জন করার পর পাকিস্তানি শাসকরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। কখনও উর্দু, আরবি বা রোমান হরফে বাংলা লেখা আবার কখনও বানান ও লিপি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। আইয়ুব খান তার আত্মজীবনীতে পাকিস্তানকে একটি একজাতিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে দুই প্রদেশের মধ্যে একটি যোগাযোগের ভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।[১৩৭]

৬.১ রোমান হরফ প্রবর্তন প্রয়াস

আইয়ুব খানের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে ক্ষমতা দখলের পরপরই সরকারি উদ্যোগে 'রোমান হরফ প্রবর্তন' প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনকে বিষয়টির সম্ভাব্যতা যাচাই করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ *আজাদ* পত্রিকার মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁকে সভাপতি করে গঠিত পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটির সুপারিশ যা ১৯৫০ সালের ৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত করে সরকারের কাছে দাখিল করা হয়েছিল এবং তৎকালীন সরকার যে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা থেকে বিরত ছিল ১৯৫৮ সালে সেটি প্রকাশ করা হয়।[১৩৮] ভাষা কমিটি উক্ত প্রতিবেদনে 'সহজ বাংলা' প্রচলনের সুপারিশ করতে গিয়ে কিছু নমুনা তুলে ধরেছিল।[১৩৯] পাশাপাশি *আজাদ* এ সময় পাকিস্তানি ভাবাদর্শের বিভিন্ন সাহিত্য সংস্থা সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করতে থেকে। যেমন – ১৯৫৮ সালের ১১ মে কবি গোলাম মোস্তফার বাড়িতে 'রওনক সাহিত্য সংস্থা'র প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গোলাম মোস্তফা 'পাক-বাংলা ভাষা' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এতে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষাকে 'পাক-বাংলা' ভাষা হিসেবে উল্লেখ করে এতে অধিক পরিমাণে আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দ যোগ করার ওপর গুরুত্ব দেন। *আজাদ* এই সভা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করে মন্তব্য করে:

> অতীতের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলা ভাষা হইতে হিন্দু ভাবধারার বাহক সংস্কৃত শব্দগুলো বর্জন করিয়া আমাদের রাষ্ট্রগত আদর্শের ভিত্তিতে ইহার সংস্কার সাধন সময়-সাপেক্ষ হইলেও পাক-বাংলা ভাষার রূপান্তর অবধারিত এবং ভাষার রূপান্তর স্বাভাবিকভাবে আসিলেও আমাদের লেখক সমাজের এ বিষয়ে সচেতন দৃষ্টির এবং জাতীয় সাহিত্যকে বেগময়ী ও সমৃদ্ধ করিতে আমাদের মুখের ভাষাকেই অবলম্বন করা উচিত।[১৪০]

দ্বিতীয় সভায় 'পাক-বাংলা ভাষার অভিধান' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী। সভায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ত্যাগ করে বাংলা ভাষার সংস্কারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং *আজাদ* ১৯৫৮ সালের ২০ জুলাই বিষয়টি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এভাবে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ও রক্ষণশীল আদর্শের ভাবধারার ভিত্তিতে গঠিত রওনক সাহিত্য সংস্থার বিভিন্ন তৎপরতা ও বাংলা ভাষার সংস্কার প্রস্তাব *আজাদ*-এ প্রচার পায়।

সামরিক শাসনের মধ্যে প্রতিবাদের সব পথ রুদ্ধ থাকলেও দু-একটি পত্রিকা সাথে সাথেই বাংলা ভাষা সংস্কার প্রয়াসের সমালোচনা করে। *ইত্তেফাক* ১৯৫৯ সালের ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি 'হরফ পরিবর্তন প্রসঙ্গে' শীর্ষক দুটো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এছাড়া *ইত্তেফাক* হরফ পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিভিন্ন প্রতিবাদ সমাবেশের সংবাদ প্রকাশ করেও জনমত সংগঠনে ভূমিকা পালন করে। যেমন – ১৯৫৯ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির একটি অনুষ্ঠানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষা সংস্কারের প্রতিবাদের সংবাদ *ইত্তেফাক* পত্রিকায় উঠে আসে।[১৪১] কিন্তু সমালোচনা উপেক্ষা করে শিক্ষা কমিশন ১৯৫৯ সালের ২৬ আগস্ট সরকারের কাছে দাখিল করা তাদের সুপারিশে বাংলা ও উর্দু ভাষার উন্নয়ন সাপেক্ষে রোমান হরফ প্রবর্তনের পক্ষে মত দেয়।[১৪২] এর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের উভয় অংশে প্রতিবাদ সমাবেশ শুরু হয়। ১৯৬০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সকল প্রতিবাদ সমাবেশে এবং ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে ছাত্রদের প্রতিবাদ বিক্ষোভের অন্যতম বিষয় ছিল সরকারের এই রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রয়াস। প্রতিবাদের মুখে সরকার এই বিষয়ে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণে বিরত থাকলেও ১৯৬২ সালের ১ মার্চ নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন উপলক্ষে সংবাদপত্র সম্পাদকদের সাথে এক বৈঠকে আইয়ুব খান রোমান হরফ প্রবর্তনের বিষয়টি আবারও সামনে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, "কলকাতার সাংস্কৃতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে হলে পূর্ব পাকিস্তানিদের তাদের ভাষার হরফ বদলাতে হবে।"[১৪৩] আইয়ুব খানের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় *আজাদ*– এর প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয়তে। এ পরিপ্রেক্ষিতে *আজাদ* বাংলা ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গের প্রভাব মুক্ত করার ওপর জোর দেয়। ১৯৬২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি 'বাংলা ভাষার

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটি মন্তব্য করে, "বাংলা ভাষা হইতে পশ্চিম বঙ্গের অন্ধ অনুকরণের ছাপ মুছিয়া দেওয়া এবং দুর্বোধ্য দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃতি শব্দ বর্জন করা হইলে ইহা সহজ ও স্বভাবিক হইয়া উঠিবে।"[১৪৪] কলকাতা থেকে প্রকাশিত গল্প উপন্যাসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর অভিযোগ তুলে *আজাদ*, কলকাতার বই নিষিদ্ধ করার দাবি জানায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালের ৫ জুন 'সাহিত্য ও তমদ্দুন' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে *আজাদ* মন্তব্য করে:

> ... এখানকার বইয়ে আল্লা, পানি প্রভৃতি শব্দ থাকে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিক্রেতা ও প্রকাশকরা এসব বই জাত যাওয়ার ভয়ে ছুইতে চায় না। পশ্চিমবঙ্গের এমন কোন গল্প উপন্যাসের বই নাই যাহাতে পৌত্তলিকতা ও পাকিস্তান বিদ্বেষ নাই। অথচ পশ্চিমবঙ্গের বই আসা এখানে বন্ধ হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের বইয়ের বাজার এখানে কায়েম রাখার জন্য ভারতীয় হাই কমিশন কেমন পাইকারী হারে বই বিলাইতে শুরু করিয়াছিলেন সেটা আমরা দেখিয়াছি ... অর্থনৈতিক দিক হইতে এখানকার বই শিল্পকে পঙ্গু করিয়া রাখা এবং রাজনৈতিক দিক হইতে সুকৌশলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিরামহীন প্রচারকার্য্য চালাইয়া যাওয়া - পশ্চিমবঙ্গের বইয়ের মারফৎ এখানে দুইটি কাজই হইতেছে।

আজাদ কলকাতার গল্প উপন্যাস এখানে আসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা এবং এখানে কলকাতার ছাপা হওয়া বইয়ের কপি বাজার থেকে তুলে নেয়ার প্রস্তাব করে। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' আয়োজন করলে *আজাদ* সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলা ভাষা সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করে। 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটি মন্তব্য করে:

> ... বাংলা ভাষা যখন আমরা গ্রহণ করিব, তখন আমরা আমাদের বাংলা জবানকেই গ্রহণ করিব, অন্যের বাংলা ভাষাকে আমাদের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিব না। ... পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতিধর্মী, বিগত দিনের অভিধান ভিত্তিক এবং জীবনে অপ্রচলিত বাংলা পাক-বাংলা হইবে না, ইহাই আমরা বলিতে চাই। ... মুসলমানের ভাষা আরবী ফারসীবহুল। কারণ আমাদের ধর্ম্ম, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের চাপে ও প্রভাবে তাহা সম্পদশালী।[১৪৫]

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলা ভাষার সংস্কারের কথা বললেও *আজাদ* একই সাথে রেডিও পাকিস্তানে উর্দুর সাথে সাথে বাংলা ভাষার প্রচারের ওপর জোর দেয়। ১৯৬৩ সালের ২৮ নভেম্বর 'বাংলা ভাষা ও রেডিও পাকিস্তান' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে *আজাদ* মন্তব্য করে, "বাংলা ও উর্দুকে পাশাপাশি রাখিয়াই পাকিস্তানকে অগ্রসর হইতে হইবে। এ সম্পর্কে কোথাও কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকাই দেশের পক্ষে সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর হইবে।"

১৯৬৮ সালে রোমান হরফ প্রবর্তনের বিষয়টি আবারও সামনে চলে আসে। ১৯৬৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানে এক জনসভায় আইয়ুব খানের পুত্র গওহর আইয়ুব পাকিস্তানের বৃহত্তর সংহতির স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানে বাধ্যতামূলক উর্দু এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বাধ্যতামূলক বাংলা শিক্ষার সুপারিশ করেন। জনসভার

Dhaka University Institutional Repository

বক্তব্যটি তিনি একটি চিঠির মাধ্যমে ১৯৬৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি *দৈনিক পাকিস্তান* ও *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এরপর পূর্ব পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন পেশাজীবী পত্রিকায় চিঠির মাধ্যমে বাংলা ও উর্দু ভাষাকে রোমান হরফে লেখার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। আবার অনেকে পাল্টা যুক্তি দিয়ে বিষয়টির বিরোধিতাও করেন।[১৪৬]

৬.২ লেখক সাহিত্যকদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা

সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাকিস্তানি আদর্শ ও ভাবধারার প্রতিফলনের পাশাপাশি সামরিক শাসনের পক্ষে লেখকদের সমর্থন আদায় করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'পাকিস্তান লেখক সংঘ'। লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার সাধারণ সম্পাদক হন ড. কাজী মোতাহার হোসেন। এর মুখপত্র হিসেবে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয় যার নাম ছিল *'পূরবী'* (১৯৬০) পরে নাম রাখা হয় *'লেখক সংঘ পত্রিকা'* (১৯৬১-৬২)। *পূরবী* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন গোলাম মোস্তফা, সহ সম্পাদক মুহম্মদ আবদুল হাই, প্রকাশক মুহম্মদ এনামুল হক। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার বিষয়বস্তু থেকেই এর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। গোলাম মোস্তফাকৃত ইকবালের – 'শিকওয়া ও জবাব-ই-শিকওয়া'র অনুবাদ, সৈয়দ মুর্তজা আলীর 'কায়কোবাদ' নিয়ে একটি প্রবন্ধ ইত্যাদি ছিল প্রথম সংখ্যার বিষয়বস্তু।[১৪৭] পরে গোলাম মোস্তফার সম্পাদনায় 'লেখক সংঘ পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার মূল রচনাটি ছিল ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর – 'ফারসীর বাংলা দখল'।[১৪৮] এই সংখ্যাটিতেও ইকবালের একটি কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। লেখক সংঘের উদ্যোগে কিছু গ্রন্থও প্রকাশিত হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফররুখ আহমেদের *নৌফেল ও হাতেম*।[১৪৯]

এভাবে সামরিক শাসন জারির পর দেশের রাজনীতিবিদদের ওপর যখন অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু হয়, তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয় এবং রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা হয়, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয় এবং একজন প্রধান সম্পাদককে (তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া) কারাভোগ করতে হয় তখন মত বা দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিশেষে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান লেখকদের অনেকেই সামরিক সরকার পৃষ্ঠপোষিত সভা সেমিনারে যোগ দিয়ে, পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে প্রকারান্তরে সামরিক সরকারকেই সাহায্য করেছেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করার পর ১৯৭১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি শিল্পীদের উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিষয়টি তুলে ধরেন। পরের দিন ২৫ ফেব্রুয়ারি বিষয়টি নিয়ে *ইত্তেফাক, আজাদ* এমনকি *সংগ্রাম* ও *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকা প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[১৫০]

Dhaka University Institutional Repository

তবে এর বিরুদ্ধস্রোতেও অনেকে ছিলেন। লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখার উদ্যোগে ১৯৬৮ সালের ৫-৯ জুলাই পাঁচদিনব্যাপী মহাকবি স্মরণোৎসব আয়োজন করা হয়। প্রথম দিনের আয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর। আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সভার মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ড. আনিসুজ্জামান। তিনি উল্লেখ করেন যে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের নির্মাতা এবং সে কথার গুরুত্ব কারও পক্ষেই বিস্মৃত হওয়া সম্ভব না।[১৫১] স্বাভাবিক ভাবেই পাকিস্তানপন্থি পত্রিকাগুলো এটিকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। অনুষ্ঠানের পরদিন *পয়গাম* পত্রিকায় বিষয়টির সমালোচনা করে দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখা হয়। 'সীমাহীন ধৃষ্টতা' শীর্ষক ঐ সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়,

> পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া রবীন্দ্র প্রশ্নের কবর বা শ্মশান রচিত হইয়া গিয়াছে। ... রবীন্দ্র দিবস পালনের মধ্য দিয়ে যেভাবে রবীন্দ্র অধিকার প্রতিষ্ঠার দিবস পালিত হইয়াছে তা তৌহিদবাদী পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর হামলা বিশেষ এবং পাকিস্তানবাদী মানুষ মাত্রকেই আজ এই হামলা রুখিবার জন্য দাঁড়াইতে হইবে।[১৫২]

তবে ট্রাস্ট মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো এই উৎসবকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

৬.৩ রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের বিরোধিতা

১৯৬১ সাল ছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ। তবে বাঙালিদের মধ্যে যারা পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী, কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে তাঁদের সকলেই শুরু থেকে এখানে রবীন্দ্র - জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন বা নিরুৎসাহী ভূমিকা পালন করেন। তারা এর মধ্যে পাকিস্তানের আদর্শ ও ইসলামি তমদ্দুন বিরোধী এবং অখণ্ড বাঙালি সংস্কৃতি অনুপ্রবেশের ষড়যন্ত্র দেখতে পান।[১৫৩] ঢাকার পত্রিকাগুলোও রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের পক্ষে ও বিপক্ষে ভূমিকা গ্রহণ করে।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের বিরোধিতায় সবচেয়ে এগিয়ে ছিল *আজাদ*। পত্রিকাটি এ সময় তীব্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আবির্ভূত হয়। ১৯৬১ সালের এপ্রিল-মে (বৈশাখ ১৩৬৮) মাসে *আজাদ* পত্রিকার প্রায় বারটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু এবং তার সাহিত্যকে পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থি বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ১৯৬১ সালের ১৫ এপ্রিল সংখ্যায় পত্রিকাটি 'রবীন্দ্রনাথ ও মওলানা আজাদ' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এখানে মন্তব্য করা হয়, "... একদল লোক পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের অন্ধ অনুসারি ও ভক্ত। তাঁদের রবীন্দ্রভক্তি বিপদের কারণ হইতে পারে এবং বাইরের যারা পাকিস্তানকে দ্বিধাহীন মনে গ্রহণ করে নাই, তারা এই সুযোগে তামদ্দুনিক অনুপ্রবেশের খেলায় নামিতে পারে।"

Dhaka University Institutional Repository

এরপর ২৬ এপ্রিল থেকে পরপর কয়েকদিন পত্রিকাটিতে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের বিরোধিতা করে কোনো না কোনো সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, পৃথক প্রবন্ধ, চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়। এসব রচনার মূল বক্তব্য ছিল অনেকটা একই – রবীন্দ্র সাহিত্য ইসলামি আদর্শ ও পাকিস্তানের মূল চেতনা বিরোধী, তিনি হিন্দু ভারতের প্রবক্তা, রবীন্দ্র রচনায় মুসলিম জীবন উপেক্ষিত ইত্যাদি। এসব অভিযোগ তুলে যে কথাটি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয় সেটি হলো - পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালনের কোনো যৌক্তিকতা নেই এবং এই ব্যাপারে যারা আগ্রহী হয়েছেন তাদের আগ্রহের পেছনে পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী চেতনা কাজ করেছে। ১৯৬১ সালের ২৬ এপ্রিল 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তান' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে *আজাদ* মন্তব্য করে যে, মুসলমানদের কাছে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালন কোহেনদার ডাকের সমান আর এ ডাকে সাড়া দেয়ার অর্থ হল নিশ্চিত মৃত্যু।[১৫৪] একইদিন 'রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী' শিরোনামে প্রকাশিত উপ-সম্পাদকীয়তে কাগমারী সম্মেলনের প্রসঙ্গ টেনে বলা হয় যে, কাগমারীর ব্যর্থতার পরে রবীন্দ্রজয়ন্তীর ছদ্মবেশে পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের ওপর একটি নতুন হামলার সুপরিকল্পিত আয়োজন হচ্ছে।[১৫৫] ১২ মে *আজাদ*–এ মওলানা আকরম খাঁ 'রবীন্দ্রনাথের হোরিখেলা' প্রবন্ধে রবিন্দ্রনাথের বিপক্ষে অভিযোগ করেন যে, তিনি মুসলমানদের মমতার চোখে দেখেননি।

আজাদ পত্রিকার এই রবীন্দ্র বিরোধী প্রচারণার ক্ষেত্রে পাল্টা যুক্তি নিয়ে এগিয়ে আসে *ইত্তেফাক* ও *সংবাদ*। *সংবাদ* সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী। ১৯৬১ সালে ঢাকায় আইয়ুব খানের সাথে পত্রিকা সম্পাদকদের একটি বৈঠকে তিনি মন্তব্য করেন, "... আমাদের ইহাই বড় দুর্ভাগ্য যে, কি আমলা, কি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, যারাই পূর্ব পাকিস্তানে কার্যোপলক্ষে আসিয়াছেন, তারাই এমন একটা ভাব দেখাইয়াছেন যে, আমাদের মুসলমান করা এবং ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেয়াই যেন তাঁদের পবিত্র দায়িত্ব।"[১৫৬] ফলে পত্রিকাটির নীতিতেও এই অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রভাব পাওয়া যায়। পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বেশ কিছু সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ ও পুনর্মুদ্রণ করে। এ রকম একটি পুনর্মুদ্রিত রচনা হলো কবি গোলাম মোস্তাফার 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ'। *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, শ্রাবণ ১৩২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধে বলা হয় যে, রবীন্দ্র রচনাবলির কোথাও ইসলাম বিদ্বেষ খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং তার কথায় এত ইসলামি ভাব ও আদর্শ আছে যে, তাকে অনায়াসে মুসলমান বলা যায়।[১৫৭] এছাড়া পত্রিকাটি আবুল কালাম শামসুদ্দিনের *দৃষ্টিকোণ* গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তিবাচক মন্তব্য উদ্ধৃত করে।[১৫৮] এসব উদ্ধৃতি পুনর্মুদ্রণের উদ্দেশ্য ছিল - রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নে উল্লিখিত লেখকদের স্ববিরোধিতাকে তুলে ধরা। ১৯৬১

Dhaka University Institutional Repository

সালের ৭ মে *সংবাদ* 'রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকী সংখ্যা' প্রকাশ করে। এখানে মোতাহার হোসেন চৌধুরী 'রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে তথাকথিত রাজনীতির ওপরে স্থান দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন:

> ... কবি কোন বিশেষ জাতির নয়, সমগ্র বিশ্বের ... দেশকে মুক্ত ও সমৃদ্ধ করতে হলে তথাকথিত রাজনৈতিক আন্দোলনই যথেষ্ট নয়, সংস্কারমূলক সামাজিক আন্দোলনও প্রয়োজন। এই সহজ সত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ... তার উচ্চ আদর্শ ও মনুষ্যত্ববোধ আমাদের জীবনকে আন্দোলিত ও নিয়ন্ত্রণ করুক।

সংবাদ-এর পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে এগিয়ে আসে *ইত্তেফাক*। 'ভীমরুল' ছদ্মনামে আহমেদুর রহমান *ইত্তেফাক* পত্রিকায় তার জনপ্রিয় কলাম 'মিঠেকড়া'-তে একটি দীর্ঘ নিবন্ধে অত্যন্ত ধারালো ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় এবং প্রচুর ব্যঙ্গ বিদ্রুপ সহকারে *আজাদ* এর রবীন্দ্রবিরোধী প্রচারণার জবাব দেন। তিনি মন্তব্য করেন:

> এতকাল জানিতাম, রবীন্দ্রনাথ কবি – এবং যেমন তেমন কবি নন, বিশ্বকবি। এখন শুনতে পাইতেছি, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু – এবং সেটাই তাহার বড় পরিচয়। নজরুলের কবিতার লাইন উদ্ধৃত করিয়া বলা যাইত, "হিন্দু না মুসলিম, ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন? ... বল, সন্তান মোর মা'র।" কিন্তু ঢাকেশ্বরী রোডের 'এছলাম ব্যবসায়ী' সহযোগী এক সময়ে নজরুলকেও কাফের বলিয়া গণ্য করিতেন। ... সারা জীবন ... রবীন্দ্র প্রতিভার মধ্যে এছলামের 'প্রধান মূলমন্ত্র ও বিশিষ্টতার' মহত্তম রুপায়ন দেখিয়া, রবীন্দ্র কাব্যে 'কোরানের প্রতিধ্বনি' শুনিয়া এবং রবীন্দ্রনাথকে প্রায় হাজী বানাইয়া অবশেষে এই বৃদ্ধ বয়সে সহযোগী আবিষ্কার করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ 'মুসলমান বিদ্বেষী'।[১৫৯]

পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের রচনাবলি থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান বিদ্বেষের অভিযোগ যে ভিত্তিহীন সেটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন আহমেদুর রহমান। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালন নিয়ে পত্রিকায় এই বিতর্কের পাশাপাশি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলতে থাকে। সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সরকার সাংবাদিক কে. জি. মুস্তফা, আলাউদ্দিন আজাদ প্রমুখ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তাছাড়া বাংলা একাডেমিতে যাতে কোনো অনুষ্ঠান না হয়, সে ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু বাঙালি জনগণ এতে দমে যায়নি। ঢাকায় উৎসব পালনে তিনটি কমিটি গঠন করা হয়। একটি হলো কেন্দ্রীয় উদ্যোগ – এর সভাপতি ছিলেন তৎকালীন ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এম. মাহবুব মুর্শেদ, অন্য দুটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এবং ঢাকা প্রেস ক্লাবের। ১৯৬১ সালের ৭ মে থেকে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স মিলনায়তনে চারদিনব্যাপী (২৪-২৭ বৈশাখ) আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাছাড়া ১১ ও ১২ বৈশাখ ডাকসু'র উদ্যোগে কার্জন হলে দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠান হয়।[১৬০]

ইত্তেফাক এসব অনুষ্ঠানের খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। যেমন – ডাকসুর অনুষ্ঠানে কবি সুফিয়া কামালের বক্তব্য উদ্ধৃত করে পত্রিকাটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সুফিয়া কামাল মন্তব্য করেন, "রবীন্দ্রনাথ পূর্ব ও উত্তর

Dhaka University Institutional Repository

বাংলারই কবি। তাহার সোনার তরী পূর্ব বাংলার পদ্মা ও মেঘনাতেই বাহিত হইয়াছিল। আজও কবির স্মৃতি নিয়া বাঁচিয়া আছে শিলাইদহ শাহজাদপুর প্রভৃতি স্থান।"[১৬১] *ইত্তেফাক*-এর প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, ব্যাপক লোক সমাগমের মাধ্যমে সফল ভাবে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এভাবে অনুষ্ঠানের ইতিবাচক সংবাদ প্রকাশ করার মাধ্যমে জনমত গঠনের প্রয়াস লক্ষণীয়।

ইত্তেফাক-এর পাশাপাশি *সংবাদ* রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনের অনুষ্ঠানে বক্তাদের মূল বক্তব্য ছিল দেশ, কাল ও জাতির ওপরে রবীন্দ্রনাথের মানবিক আদর্শ নিয়ে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে সংস্কৃতিকর্মীদের ঐক্য ও মূল্যবোধের বিষয়টি *সংবাদ*-এর প্রতিবেদনে উঠে আসে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাফল্য এটাই প্রমাণ করে যে বাঙালি জাতি একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ করে। বাঙালি জনগণের এই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়ে **১৯৬১** সালের ৮ মে সংবাদ তাঁদের সম্পাদকীয় কলামে মন্তব্য করে:

> ... পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র একান্ত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্তুতির মধ্য দিয়া ইতোমধ্যে যেখানে যেখানে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, সেখানেই এবারকার জন্মশতবার্ষিকীর বিশেষত্ব ও গুরুত্ব এবং অভিনবত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের চিন্তাবিদ, লেখক, শিল্পী ও গায়ক সমাজ এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানসমূহকে অভূতপূর্ব প্রাণস্পন্দনে ভরপুর করিয়া দিতেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথের আবেদন এত সার্বজনীন ও সর্বজনগ্রাহ্য যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মেহেনতি মানুষ, সাধারণ নরনারী শিশুকেও ওইসব অনুষ্ঠানের আয়োজনের উদ্যোগতাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে।

পরদিন ৯ মে পত্রিকাটি ২৫ বৈশাখের মূল অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে *সংবাদ* প্রকাশ করে। সাজ্জাদ হোসায়েন তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায় এই প্রশ্নটি এক কথায় খুব অদ্ভুত কারণ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে অবিসংবাদিতভাবে তিনি স্বীকৃত।[১৬২] ঢাকার মূল অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রকাশ করার পাশাপাশি *সংবাদ* সারা দেশে কিভাবে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে সেই বিষয়টিও তুলে ধরে। **১৯৬১** সালের **১২-১৬** মে পর্যন্ত *সংবাদ* এই বিষয়ে একাধিক সংবাদ প্রকাশ করে।

এর বিপরীতে রবীন্দ্রবিরোধী মহল জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের ব্যাপারে তাদের বিরোধিতার কথা প্রচার করতে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ফেনীতে আলোচনা সভার আয়োজন করে এবং বিষয়টি *আজাদ* পত্রিকায় প্রচারণা পায়। **১৯৬১** সালের মে মাসে (২৪ বৈশাখ) ঢাকা জেলা পরিষদ হলে আয়োজিত এ রকম একটি আলোচনা সভায় গৃহীত এক 'সর্বসম্মত' প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথকে 'অখণ্ড ভারতীয় রামরাজ্যের স্বপ্ন দ্রষ্টা' হিসেবে আখ্যায়িত করে

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তানে যারা তাকে 'জাতীয় কবি' হিসেবে চালু করার চেষ্টা করছেন সে সব 'তথাকথিত সংস্কৃতিসেবীর' 'সাংস্কৃতিক অপচেষ্টা'র তীব্র নিন্দা করা হয়।[১৬৩] বিষয়টি নিয়ে *আজাদ* ৮ মে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সভার সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করে *আজাদ* মন্তব্য করে:

> পাকিস্তানের বদৌলতে অকল্পিত সুখ সম্পদের অধিকারী হইয়াও যাহারা বিদেশী বিজাতীয় কৃষ্টি ও মতবাদের তল্পী বাহিয়া বেড়াইতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে ভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট বিকাইয়া দেওয়ার স্বপ্ন দেখিতেছে তাহাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য এই সভা প্রত্যেক দেশাত্মবোধ সম্পন্ন পাকিস্তানী ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইতেছে।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী পালনের সাফল্যকে স্থায়ী ভিত্তি প্রদানের জন্য কতিপয় সাংস্কৃতিক কর্মী একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং আত্মপ্রকাশ ঘটে ছায়ানট নামক সংগঠনটির। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। প্রতিষ্ঠাকালীন সহ-সভাপতি ছিলেন সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী। এছাড়া অন্যতম সদস্য ছিলেন *ইত্তেফাক* পত্রিকার আহমেদুর রহমান (ভীমরুল)। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে ১৯৬৩ সালের ২২-২৮ সেপ্টেম্বর 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠান পালনে বাংলা বিভাগকে অর্থ সহায়তা দিয়েছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী বিতর্কিত – ব্যুরো অফ ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন (বিএনআর)। তবে এই অনুষ্ঠানটির কর্মসূচিতে সাম্প্রদায়িক ভাবনা প্রতিফলিত হয়নি। বিগত শতকের ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে ধারা ক্রমে পুষ্টিলাভ করেছিল তাতে এই সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালার দান অনস্বীকার্য।[১৬৪] ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো এই অনুষ্ঠানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানায়। এমনকি ষাটের দশক জুড়ে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিতর্কিত ভূমিকা পালনকারী এবং বাঙালিত্বের গৌরব জাহির করার প্রবৃত্তি না থাকা সত্ত্বেও *আজাদ* ও *মর্নিং নিউজ* অনুষ্ঠানের প্রশংসা করে।[১৬৫] বিভাগ উত্তরকালে পূর্ব বাংলায় পহেলা বৈশাখের গুরুত্ব কম ছিল এবং এটিকে হিন্দু সংস্কৃতির অংশ বলে মনে করে হত। পাকিস্তান আমলে ঘরোয়া ভাবে বাংলা নববর্ষ পালনের রীতি ছিল। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবোধের বিকাশমান ধারা এবং সামরিক ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের ইতিবাচক শক্তি নতুনভাবে জাগতে উদ্বুদ্ধ করে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলা নববর্ষ পালনের আঙ্গিক ও সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। *পাকিস্তান অবজারভার* এবং *সংবাদ* বিভিন্ন স্থানে বাংলা নববর্ষ পালনের অনুষ্ঠানের খরব ও প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪ রবীন্দ্র সাহিত্য ও সাম্প্রদায়িকতা

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মধ্যে ভারত বিরোধী মনোভাব তৈরি হওয়া ছিল স্বাভাবিক। এই বোধকে তৎকালীন সরকার সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ব্যবহার করতে চায় যার মূল কথা ছিল – ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির পরিবর্তে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামি মূল্যবোধ ও আদর্শের আলোকে আত্মবিশ্বাসের আকাঙ্ক্ষাই ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের চেতনা। ১৯৬৬-৬৭ সালে রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে নতুন ভাবে বিতর্ক শুরু হয়। একদিকে পাকিস্তানের সরকারি প্রচার মাধ্যম রেডিওতে রবীন্দ্র সংগীতের প্রচার ছিল সীমিত। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় এটিও বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধ অবসানেও রবীন্দ্র সংগীতের ওপর এই অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকে। তবে ১৯৬৬ সালে টেলিভিশন এবং রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা ও অন্য কয়েকটি কেন্দ্র থেকে পুনরায় রবীন্দ্র সংগীতের প্রচার শুরু হয় যেটি সপ্তাহে দু-চারটি গান প্রচারেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়ে *ইত্তেফাক* সংবাদ প্রকাশ করে। ১৯৬৬ সালের ৯ মে *ইত্তেফাক* মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর 'সুরের মুক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। লেখক রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বলেন:

> ... এ কথা বলাই বাহুল্য যে, রবীন্দ্র সংগীত, রবীন্দ্র সাহিত্য তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্য ভারতের একার সম্পত্তি নয়। ... অন্যের প্রতি রাগ করে বাংলা বা হিন্দী – উর্দু সাহিত্যের যেকোনো অংশকে বর্জন করা মানে শুধুশুধি নিজেদের বঞ্চিত করা। আর যে যুক্তিতে রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করব সেই একই যুক্তিতেতো আরো অনেক কিছু বর্জন করতে হয় – যেমন নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির প্রমুখের রচিত সাহিত্য, কেননা বর্তমানে তারা ভারতীয় নাগরিক। ... রবীন্দ্র সংগীত এবং সাহিত্য যে বাংলা সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ প্রতিটি পূর্ব পাকিস্তানবাসীই এটা মর্মে মর্মে অনুভব করেন।

তবে বরাবরের মত *আজাদ* নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে। সরাসরি রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ না করে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে *আজাদ* দ্বিজাতিতত্ত্বের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। বাঙালি সংস্কৃতিকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করে পত্রিকাটি হিন্দু সংস্কৃতির অনুকরণ না করার আহ্বান জানিয়ে বলে:

> ...বাঙালী হিন্দু সংস্কৃতি এক সময় ইয়ং-বেঙ্গলদের বিজাতীয় আন্দোলনের ফলে জাতিচ্যুত হইতে বসিয়াছিল। কিন্তু সে উন্মাদনার অবসান ঘটিতে দেরী হয় নাই। বাঙালী হিন্দুদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব পথে সুবিশাল স্রোত বিস্তার করিয়া সমুদ্রগামী হইয়াছে। ... এখানে বাঙালী হিন্দু সংস্কৃতির অনুকরণের পরিবর্তে আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসের নিদর্শনটা লক্ষ্য করিলেই সবচেয়ে বেশী উপকার হইবে।... দ্বিজাতিতত্ত্ব নিছক মন্ত্রশক্তি ছিল এবং নির্বোধের মত গোটা মোছলেম সমাজ তাহা মানিয়া নিয়াছিল, তাহার কোনো ভিত্তি ছিল না, ইহা মনে করার কোনো কারণ নাই।[১৬৬]

Dhaka University Institutional Repository

একটি পর্যায়ে *আজাদ* আরও বেশি রক্ষণশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রীদের নৃত্য ও সংগীত পরিবেশনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবি জানায়। এ ক্ষেত্রে পত্রিকাটি পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্রীদের সব ধরনের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করার উদাহরণ তুলে ধরে। নৃত্য ও সংগীতকে ইসলাম বিরোধী আখ্যায়িত করে *আজাদ* মন্তব্য করে:

> পশ্চিম পাকিস্তান সরকার এ দিকে যথাসময়ে দৃষ্টিদান করিয়াছেন এবং সংস্কৃতির নামে অনুষ্ঠিত এছলাম বিরোধী কার্যকলাপ হইতে সমাজের ভাবী মাতৃসমাজকে উদ্ধারের পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগী হইয়াছেন। ... ছাত্রীদের নৃত্য সঙ্গীত পরিবেশন ও বিচিত্রানুষ্ঠানের কুফলও এখানে বহুবার পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের আবশ্যকতা স্বীকার না করার কোনো উপায় নাই। মেয়েরা তাহাদের শালীনতা ও নৈতিকতা রক্ষা করিয়া স্বাধীন ভাবে শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।[১৬৭]

তবে *আজাদ* পুনরায় তার বৈপরীত্যমূলক নীতির প্রকাশ ঘটিয়ে আরবি হরফে বাংলা লেখার বিরোধিতা করে। ১৯৬৭ সালের ২০ মার্চ 'আমাদের জাতীয় সংহতি' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বিষয়টির বিরোধিতা করে *আজাদ* মন্তব্য করে, "... কোনো কোনো মহল আরবী লিপির সাহায্যে বাংলা লেখার কথা বলিয়া থাকেন। এই মতের স্বপক্ষে যতই যুক্তি প্রদর্শন করা হউক না কেন – ইহা গ্রহণ করা হইলে যে কতগুলি জটিলতার সৃষ্টি হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এখন আর এ প্রশ্ন না উঠাই বাঞ্ছনীয়।"

এ অবস্থায় ১৯৬৭ সালের ২২ জুন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে বিরোধী দলীয় সদস্যদের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন বলেন যে, রেডিও পাকিস্তান থেকে 'পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পরিপন্থী' রবীন্দ্রনাথের গান প্রচার করা হবে না।[১৬৮] এর আগের দিন ২১ জুন পরিষদে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী খান এ সবুরও পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্র জয়ন্তী ও পহেলা বৈশাখ পালনের নামে 'বিদেশী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশে'র ওপর তার উদ্বেগ ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে এর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি না রাখলে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে।[১৬৯] খাজা শাহাবুদ্দীন ও খান এ সবুরের বক্তব্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে *পাকিস্তান অবজারভার* ২৩ জুন 'Broadcast ban on Tagore' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। খবরে বলা হয়, "... That the songs by poet Rabindranath Tagore which he termed as 'against Pakistan's cultural values' would not be broadcast in future and the use of other songs would songs would also be reduced."

এমনকি ট্রাস্ট মালিকানাধীন পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান* সংবাদটি প্রকাশ করে, 'রেডিও পাকিস্তান থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার করা হবে না' শিরোনামে। সংবাদে বলা হয়, "কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন গতকাল জাতীয় পরিষদে বলেন যে, ভবিষ্যতে রেডিও পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান প্রচার করা হবে না এবং এ ধরনের অন্যান্য গানের প্রচারও কমিয়ে দেওয়া হবে।"[১৭০] সরকারের তরফ থেকে এই *সংবাদ* প্রকাশের ব্যাপারে কোনো সংশোধনী বা প্রতিবাদ জানানো হয়নি। এ ঘটনাকে সামনে রেখে সংবাদপত্রে বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতির ঘটনা ঘটে। ২৫ জুন *ইত্তেফাক*-এ এক বিবৃতির মাধ্যমে ১৮ জন লেখক-শিল্পী-শিক্ষাবিদ-সাংবাদিক সরকারি সিদ্ধান্তকে 'অত্যন্ত দুঃখজনক' উল্লেখ করে মন্তব্য করেন, "... রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলাভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তার সংগীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও ভিন্নতা দান করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারি নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।"[১৭১] এই বিবৃতির পাল্টা আরেকটি বিবৃতি *দৈনিক পাকিস্তান*-এ ২৯ জুন ছাপা হয়। এতে স্বাক্ষর করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষক। তারা ১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতির সমালোচনা করে বলেন, "... বিবৃতির ভাষায় এই ধারণা জন্মে যে স্বাক্ষরকারীরা বাংলাভাষী পাকিস্তানী ও বাংলাভাষী সংস্কৃতির মধ্যে সত্যিকারের কোনো পার্থক্য রয়েছে বলে স্বীকার করেন না। ...এই ধারণার সঙ্গে আমরা একমত নই বলে এই বিবৃতি দিচ্ছি।"[১৭২]

একইদিন ৪০ জন বুদ্ধিজীবীর দ্বিতীয় আরেকটি বিবৃতি *দৈনিক পাকিস্তান*-এ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথই যে তার এক প্রবন্ধে উপমহাদেশের মুসলমানদের 'হিন্দু-মুসলমান' বলে অভিহিত করেছেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, "... যে তামুদ্দনিক স্বাতন্ত্রের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, উপরোক্ত বিবৃতি মেনে নিলে সে ভিত্তিই অস্বীকৃত হয়। এ কারণে উপরোক্ত বিবৃতিকে আমরা শুধু বিভ্রান্তিকর নয় অত্যন্ত মারাত্মক এবং পাকিস্তানের মূলনীতি বিরোধী বলেও মনে করি।"[১৭৩] ৪০ জন বিবৃতিদাতাদের অন্যতম ছিলেন *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন। তবে *আজাদ* বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু করে আরও একমাস আগে থেকে মে মাসে। রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে নজরুল ইসলামকে দাঁড় করানোর চেষ্টা থেকে *আজাদ* কবির পশ্চিম বাংলায় থাকার বিরোধিতা করে। সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পত্রিকাটি মন্তব্য করে, "... নজরুল ইসলাম পাকিস্তানের জাতীয় কবি না হইলেও তিনি নিঃসন্দেহে মুসলিম জাগরণের কবি এবং তাহার জীবন সাহিত্য সাধনা পাকিস্তানী পরিবেশেই বিশেষ ভাবে খাপ খাইতে পারে।"[১৭৪] একজন মানবতাবাদী কবির পরিবর্তে *আজাদ*

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ইসলামকে মুসলিম জাগরণের কবি হিসেবে প্রচার করে। বাঙালি জাতির জয়গানের পরিবর্তে নজরুল মুসলিম জাগরণের কথা প্রচার করেছেন এমনটি দাবি করে *আজাদ* মন্তব্য করে:

> এককালের অধ্যয়ন যদি তাঁহার থাকিত এবং রবীন্দ্রনাথের ন্যায় নিষ্ঠাবান যদি তিনি হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার দানের পাত্র পূর্ণতর হইয়া উঠিতে পারিত। এ ত্রুটির জন্যই পাকিস্তান তাহাকে হয়ত কোনদিনই জাতীয় কবি বলিয়া মানিয়া নিতে পারিবে না। তবে মোছলেম জাগরণের অবিসংবাদিত নকীব হিসাবে ... পাকিস্তানই তাঁহার জন্য উপযুক্ত স্থান।[১৭৫]

খাজা শাহাবুদ্দীনের ঘোষণার সমর্থনে *আজাদ* ১৯৬৭ সালের ৩০ জুন 'রবীন্দ্র সাহিত্য ও পূর্ব্ব পাকিস্তান' শীর্ষক একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মাত্র একাংশের কবি – বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়:

> বাংলা সাহিত্যের সেই চিরস্থায়ী ব্যবধান ভাঙ্গার কাজে রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রতিভাকে কখনো নিয়োজিত করেন নাই। ... বাংলার অধিকাংশ মানুষ সম্পর্কে তাঁহার ঔৎসুক্য ছিল না, বরং মুসলমানদের প্রতি উপেক্ষা ও ঘৃণা লইয়া যে একপেশে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার সীমানা ভাঙ্গার কিছুমাত্র আগ্রহও তিনি দেখান নাই। আজ তাহাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া সীমানার এপাশে লইয়া আসিয়া অতিভক্তি দেখাইবার পরিবর্তে, রবীন্দ্রনাথ নিজে যে সীমানা মানিয়া চলিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিয়া নেওয়াই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আরেকটি বিবৃতি *আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর নেতৃত্বে ৩০ জন মওলানা এই বিবৃতিতে বলেন, "... রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্গীতে মুসলিম তমদ্দুনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির জয়গান গাহিয়াছেন। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন হতেই এ সকল সঙ্গীতের আবর্জনা হইতে রেডিও টেলিভিশনকে পবিত্র রাখার প্রয়োজন ছিল।"[১৭৬] একই বিবৃতি *পয়গাম* পত্রিকায় কিছুটা আলাদাভাবে আসে। এখানে বলা হয়, "রবীন্দ্রনাথ বহু সংগীতে মুসলিম তমদ্দুনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির ও যৌন ভোগলালসার জয়গান গাহিয়াছেন"।[১৭৭] শিল্প-সংস্কৃতির সাথে সরকারিভাবে যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে দিয়ে জোর করে রবীন্দ্র সংগীতের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর আদায় করা হয়। বেতার শিল্পীদের ওপর যে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় *পাকিস্তান অভজারভার* পত্রিকার ১৯৬৭ সালের ২ জুলাইয়ের প্রতিবেদন থেকে। পত্রিকাটি এ বিষয়ে শিরোনাম করেছিল, "No Signature, No Programme – Radio Pakistan's Threat"[১৭৮]

শাহাবুদ্দীনের বক্তব্য নিয়ে দেশব্যাপী বিক্ষোভ প্রতিবাদ অব্যাহত থাকা অবস্থায় ১৯৬৭ সালের ২৮ জুন *মর্নিং নিউজ* পত্রিকায় তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয়। এতে 'Clarification'

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনামে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের বরাত দিয়ে বলা হয় যে, মন্ত্রী তার বিবৃতিতে কেবলমাত্র সেসব গানই প্রচার বন্ধ করার কথা বলেছেন, যেগুলো পাকিস্তানের সংস্কৃতির মূল্যবোধের পরিপন্থি।[১৭৯] ৫ জুলাই খাজা শাহাবুদ্দীন তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বলেন যে, তার বক্তব্য সংবাদপত্রে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়েছে।[১৮০] সমস্ত সরকারি তৎপরতা ও নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ঢাকার 'ছায়ানট', বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, ঐকতান এবং আরও কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠন সম্মিলিতভাবে ২২ শ্রাবণ ১৩৭৪ (৮ আগস্ট, ১৯৬৭) রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নেয়।

এর আগে থেকেই *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকায় কোনো কোনো নেতার পাকিস্তানের নিজস্ব সংস্কৃতির ওপর আক্রমণকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারিমূলক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানের কোনো সংবাদ পত্রিকাটি ছাপেনি। এমনকি পত্রিকাটির ৮ আগস্ট অর্থাৎ ২২ শ্রাবণের সংখ্যায় কোথাও রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ নেই। এ সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় পাকিস্তানের তামদ্দুনিক আন্দোলনের সম্পাদক বেনজীর আহমেদের 'বিদেশী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের চেষ্টা প্রতিরোধের আহ্বান' শিরোনামে একটি বিবৃতি ছাপা হয়। এ সংবাদটি থেকেই *দৈনিক পাকিস্তান*-এর পাতায় অনুষ্ঠানের উদ্যোগটির কথা জানা যায়।[১৮১] পরে ১০ আগস্ট (২৪ শ্রাবণ) *দৈনিক পাকিস্তানের* তৃতীয় ও শেষ পৃষ্ঠায় অনুষ্ঠানটির উদ্যোগের কথা জানা যায় ছোট এক কলামব্যাপী সংবাদের মাধ্যমে। এর দুই দিন পর ১৯৬৭ সালের ১২ আগস্ট 'জাতীয় সংস্কৃতির চরিত্র' শীর্ষক একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে পত্রিকাটি। এতে পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করে বলা হয়:

> বাইরের যা কিছু মহৎ এবং সুন্দর একাটা গতিশীল সংস্কৃতি তাকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করিয়া লইবে, নিজের রঙে তাকে রঞ্জিত করিবে। কিন্তু তার মধ্যে তলাইয়া গিয়া নিজের চরিত্র বিসর্জন দিবে না। এ ধরনের আত্মবিলুপ্তি বা আত্মহনন যে কোন সংস্কৃতির জন্যই অনিবার্য পতন ডাকিয়া আনে। একটা স্বাধীন ও সচেতন জাতি কখনো এ ধরনের সাংস্কৃতিক আত্মহত্যার সর্বনাশা পথে পা বাড়াইতে পারে না।

যদিও পুরো সম্পাদকীয়তে কোথাও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করা হয়নি কিন্তু যেটি লেখা হয়েছে সেটি ছিল *আজাদ* পত্রিকার মূল সুরের সমর্থক।

ন্যাপ সভাপতি মওলানা ভাসানী রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে সরকারি সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে একে চলমান রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান। ন্যাপ সমর্থিত *সংবাদ* ১৯৬৭ সালের ২ জুলাই সংখ্যায় খাজা শাহবুদ্দীনের বক্তব্যের সমালোচনার পাশাপাশি রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে বিতর্ককে দুর্ভাগ্যজনক বলে অভিহিত করে।[১৮২] *সংবাদ* বিভিন্ন সংগঠনের রবীন্দ্র সংগীত বিষয়ক অনুষ্ঠান পালনের সংবাদ গুরুত্ব দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করতে থাকে। ১৯৬৭ সালে অধ্যাপক অজিত গুহের উদ্যোগে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে 'চারণিক' নামে জগন্নাথ কলেজ ভিত্তিক একটি সংগঠন গঠিত হয়। চারণিক ১৯৬৮ সালের শেষ দিকে বাংলা একাডেমিতে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে। দু-একটি পত্রিকা এ বিষয়ে সামান্য সংবাদ প্রকাশ করলেও *সংবাদ* বিস্তারিত ভাবে অনুষ্ঠানের ছবিসহ সংবাদ প্রকাশ করে।[১৮৩]

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠান পালনের সংবাদ নিয়ে ইতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় *পাকিস্তান অবজারভার*। *আজাদ* পত্রিকার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতি অবলম্বন করে *পাকিস্তান অবজারভার* ৮-১১ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠান সংক্রান্ত প্রতিটি খবর গুরুত্ব ও প্রশংসার সাথে এবং বিরোধী বক্তব্য পরিহার করে প্রকাশ করে। তবে *পাকিস্তান অবজারভার* অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কোনো সম্পাদকীয় প্রকাশ করেনি। ট্রাস্ট মালিকানাধীন অপর পত্রিকা *মর্নিং নিউজ* ২২ শ্রাবণ (রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী) উপলক্ষে কোনো সংবাদ বা সম্পাদকীয় প্রকাশ করেনি।

৬.৫ বাংলা একাডেমির মাধ্যমে বানান সংস্কার

ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথ বর্জনের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি বাংলা ভাষার সংস্কারের মাধ্যমেও এখানকার সংস্কৃতির ওপর বেশ কয়েকবার আঘাত হানা হয়েছে। ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে বাংলা ভাষা সংস্কারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সৈয়দ আলী আহসানকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়।[১৮৪] কমিটি প্রচলিত অক্ষর ব্যবহার করে এবং যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব পরিহার করে একটি বর্ণমালা প্রণয়নে সচেষ্ট হন।[১৮৫] ১৯৬৩ সালের ৩১ মে *ইত্তেফাক* ও *আজাদ* বাংলা একাডেমির এই বানান সংস্কার প্রস্তাব বিস্তারিত প্রকাশ করে। তবে বাংলা একাডেমির এই প্রস্তাবিত বানান রীতি শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। এমনকি কমিটির অনেকেই এই রীতির সাথে একমত পোষণ করেননি।

৬.৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বর্ণমালা ও ভাষা সংস্কারের উদ্যোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল নতুন করে বাংলা বর্ণমালা ও ভাষা সংস্কারের জন্য ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে সভাপতি করে আরেকটি কমিটি তৈরি করেছিল।[১৮৬] ১৯৬৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি এই কমিটির সুপারিশ গৃহীত হয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ৩ আগস্ট ড. কাজী দীন মুহম্মদকে আহ্বায়ক করে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু কমিটির তিনজন সদস্য এনামুল হক, মুনীর চৌধুরী ও আবদুল হাই লিখিত ভাবে কমিটির বিভিন্ন সুপারিশের বিরোধিতা করে বলেন যে, ভাষা সংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তা নেই বরং এ কাজে হাত দিলে বিভ্রান্তি তৈরি হবে।[১৮৭] ফলে ভাষা সংস্কারের প্রশ্নে আবার বিতর্ক শুরু হয় এবং সংবাদপত্রগুলো দুই

Dhaka University Institutional Repository

বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে বিতর্কে অংশ নেয়। রবীন্দ্র সংগীতের বিরোধিতা করলেও ভাষা সংস্কারের বিষয়টি অত্যন্ত জোরালো ভাষায় সমালোচনা করে *আজাদ*। 'বাংলা বর্ণমালা সংস্কার প্রসঙ্গে' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয় যে, ভাষা বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই ভাষার সংস্কার ঘটে ফলে এর জন্য কোনো আইন করার প্রয়োজন নেই। বরং কৃত্রিম উপায়ে ভাষাকে সংস্কার করতে গেলে নতুন কিছু সমস্যার উদ্ভব ঘটে।বাংলা ভাষার সাথে উর্দুর তুলনামূলক বিচার করে *আজাদ* মন্তব্য করে,

> উর্দুতে উচ্চারণ পার্থক্য না থাকা সত্বেও ৫টি জ জাতীয় ধ্বনি যেমন জিম, জই, জোয়াদ, যে, জাল এবং ত জাতীয় দুইটি ধ্বনি রহিয়াছে। ইহা ছাড়া উর্দু লিখন পদ্ধতিও অত্যন্ত জটিল। এতদসত্বেও উর্দু ভাষার পণ্ডিত ও ভাষাতাত্ত্বিকেরা যদি উর্দু বর্ণমালা সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পূর্ব্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষার তাত্ত্বিকেরা কেন হঠাৎ এই সংস্কারের ছুরিতে ভাষাকে বহুখণ্ডিত করিতে চাহিতেছেন তাহা আমাদের বোধগম্য নহে।[১৮৮]

সংবাদ সরকারের ভাষা সংস্কারের উদ্যোগের সমালোচনা করে। পাশাপাশি পত্রিকাটি এর প্রতিবাদে বিভিন্ন সংঠনের কর্মসূচির খবরও প্রকাশ করতে থাকে। যেমন – ১৯৬৮ সালের ১২ আগস্ট সর্বদলীয় ছাত্র সমাজের মাধ্যমে ডাকসু সভা ও বিক্ষোভ মিছিল বের করলে ১৩ আগস্ট *সংবাদ* সেটি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[১৮৯] ট্রাষ্ট মালিকানাধীন পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান* এবং *মর্নিং নিউজ* বাংলা ভাষা সংস্কার প্রয়াসকে সমর্থন জানায়। ১৯৬৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর ৪২ জন সাহিত্যিক সাংবাদিক বাংলা লিখনরীতি ও বানান সংস্কারের সমালোচনা করে বিবৃতি দেন যা *দৈনিক পাকিস্তান, সংবাদ* ও অন্যান্য পত্রিকায় ছাপা হয়।[১৯০] ভাষা সংস্কার কমিটির সদস্য ড. এনামুল হক, অধ্যাপক আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী সংস্কার প্রয়াসের বিরোধিতা করলেও আবুল কালাম শামসুদ্দীন, তালিম হোসেন, আবুল মনসুর আহমেদ, মুজিবুর রহমান খাঁ, ড. মোহর আলী, গোবিন্দ চন্দ্র দেব প্রমূখ ৫৮ জন বুদ্ধিজীবী বিষয়টিকে সমর্থন করে বিবৃতি দেন যা ১৯৬৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১৯১] ভাষা সংস্কারের পক্ষে মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ লিখিত একটি প্রবন্ধ *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকায় প্রকাশিত হলে এর প্রতিবাদে আবদুল গাফফার চৌধুরী 'বর্ণমালা সংস্কারের ধূম্রজালের আড়ালে' শীর্ষক আরেকটি প্রবন্ধ *আজাদ* এর ১৯৬৮ সালের ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[১৯২] *দৈনিক পাকিস্তান*-এ ভাষা সংস্কারের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন লেখকের নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ সালের ৪ অক্টোবর মুনীর চৌধুরী লিখিত 'বাংলা বানান ও বর্ণমালা সংস্কারের সমস্যা' শীর্ষক নিবন্ধে বাংলা ভাষা সংস্কারের সমালোচনা করা হয়। এর পাল্টা আরেকটি নিবন্ধ ১২ অক্টোবর পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়।

১৯৬৮ সালের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠলে ভাষা সংস্কারের প্রয়াস আর সফল হয়নি। এভাবে আইয়ুব আমলে ভাষা সংস্কার ও রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক

Dhaka University Institutional Repository

এক বাঙালি জাতীয়তাবাদ লালিত ও বিকশিত হয়। এই জাতীয়তাবাদ বিকাশে এবং ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত মোকাবেলায় ঢাকার পত্রিকাগুলো তাদের নিজেদের অবস্থান থেকে ভূমিকা পালন করে।

৭. ছয় দফা আন্দোলন

ভাষা ও সংস্কৃতির পাশাপাশি বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অনীহা এবং উন্নয়নের প্রতি নানা ধরনের বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে বাঙালি জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উপাদানটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাথে জনগণের জীবনমরণের প্রশ্নটি জড়িয়ে দিয়েছিল।

পকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ব বাংলা প্রদেশের প্রতি স্বায়ত্তশাসন বিরোধী নীতি ও কার্যকলাপ প্রদর্শন করে। ১৯৪৭-৫৮ সময়কালে পাকিস্তানের ৪ জন রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে ১ জন ছিলেন পূর্ব বাংলার অধিবাসী কিন্তু উর্দুভাষী। একই সময় ৭ জন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ৩ জন ছিলেন পূর্ব বাংলার যাদের মধ্যে একজন ছিলেন উর্দুভাষী। আবার ১৯৪৭-৫৫ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলায় যে ৪ জন গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ১ জন ছিলেন বাঙালি। কেন্দ্রীয় সরকারের সবগুলো দফতর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৫০ এর দশকে যোগ্যতা থাকার পরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাঙালিদের চাকুরি ছিল সীমিত। যেমন – প্রশাসনের ৫৫১ টি পদের মধ্যে ২২৫ জন (৪১%), পররাষ্ট্র বিষয়ক চাকুরিতে ১৭৭ জনের মধ্যে ৭৩ জন (৪১%), পুলিশে ২১০ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৮২ জন (৩৯%), আয়কর বিভাগে ২২৭ জনের মধ্যে ৮৬ জন (৩৭%), রেলওয়েতে ১১৬ টি পদের মধ্যে ৪০ জন (৩৪%), অডিট এন্ড একাউন্টস- এ ১৩৯ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৪৪ জন (৩১.৬%)। মিলিটারি একাউন্টস-এ ৬৮ জনের মধ্যে ১৮ জন (২৭%), কেন্দ্রীয় তথ্য বিভাগে ৬৮ টি পদের মধ্যে ১৯ জন (২৭.৪%) ছিলেন বাঙালি।[১৯৩]

১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তানের জাতীয় আয়ের প্রায় ৫২.৬% ই ছিল পূর্ব বাংলার অবদান যদিও জনপ্রতি আয় পূর্ব বাংলায় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে ৮ শতাংশ কম। ১৯৪৯-৫০ সালে পাকিস্তানের মোট আয় ছিল ২৪৫০ কোটি টাকা (পূর্ব বাংলার ১৩১৩ কোটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ১১৮৩ কোটি)। ১৯৬৯-৭০ সালে পাকিস্তানের মোট আয় ছিল ৫৪২৭ কোটি টাকা, এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ২২৩৮ কোটি এবং পশ্চিম পকিস্তানে ৩১৮৮ কোটি টাকা। ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব বাংলার জনপ্রতি আয় যেখানে ছিল ৩০৫ টাকা সেটি ১৯৬৯-৭০

Dhaka University Institutional Repository

সালে বেড়ে হয় মাত্র ৩০৮ টাকা। অন্যদিকে একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রতি আয় ৩৩০ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৯৮ টাকায়।[১৯৪]

১৯৫০-৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে রাজস্ব ব্যয় ছিল বৈষম্যমূলক। ১৯৫০-৫৫ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৭২০০ মিলিয়ন টাকা আর পূর্ব বাংলার জন্য ছিল ১৭১০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৬৫-৭০ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ২২২৩০ মিলিয়ন আর পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৬৪৮০ মিলিয়ন টাকা।[১৯৫] অর্থাৎ বাঙালিদের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি পায়নি। ১৯৪৭-৪৮ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে মাইলের হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের রাস্তা ১০ গুণ বৃদ্ধি পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানের রাস্তার দৈঘ্য তখনও বেশি থাকে ২০ হাজার মাইল।[১৯৬]

শিক্ষাক্ষেত্রেও এই বৈষম্যের চিত্রটি লক্ষণীয়। ১৯৪৭ সালে শিক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা কিছুটা এগিয়ে থাকলেও সরকার অনুসৃত নীতির কারণে তা ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল ৭১.২৪% কিন্তু তা ১৯৬৫-৬৬ সালে কমে দাঁড়ায় ৩২.০৭% এ। একইভাবে ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে ১৯৬৬-৬৭ অর্থ বছরে পূর্ব বাংলা সরকার বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রে ৯.৮৪% বরাদ্দ করে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তখন শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয় ১৫.২৮%।[১৯৭] এভাবে ১৯৪৭ সালের পর থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাঙালি জনগণ বৈষম্যের শিকার হয়েছে।

আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ভিত্তিক নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের সূচনা হওয়ার পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট- এনডিএফ) গঠিত হলেও ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর অনেক নেতৃবৃন্দের মধ্যেই ফ্রন্ট সম্পর্কে উৎসাহে ভাটা পরে। কেবলমাত্র আইয়ুব খানের বিরোধিতা করা ছাড়া ফ্রন্টের কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) মনে করেছিল ব্যাপক মেহনতি মানুষ ও শ্রমিক কৃষককে ঐক্যবদ্ধ না করে আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলন জোরদার করা যাবে না। আওয়ামী লীগেরও একাংশ সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পক্ষে ছিলেন। তবে সোহরাওয়ার্দী সহ যেসব নেতাদের ওপর ‘এবডো’ আইনের নিষেধাজ্ঞা ছিল তারা রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবনের বিপক্ষে ছিলেন।[১৯৮] সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি পাকিস্তান আওয়ামী লীগ আত্মপ্রকাশ করে এবং শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। এর আগে ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৬৩ সালের ৩১ আগস্ট ন্যাপ আত্মপ্রকাশ করে। তবে পুনরুজ্জীবিত ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ দুটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামে। ন্যাপ পূর্ব পাকিস্তানের

Dhaka University Institutional Repository

স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে মুখ্য গণ্য করে ষাটের দশকে এসে পাকিস্তানের অন্যান্য জাতিগত সমস্যার সাথে বিষয়টিকে মিলিয়ে ফেলে, কিন্তু আওয়ামী লীগ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জোরালো অভিমত প্রকাশ করে।

১৯৬৪-৬৫ সালে ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা চালানোর সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জনগণের মধ্যে আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র ও সরকার বিরোধী মনোভাব এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটি একটি চূড়ান্ত রূপ পায় আওয়ামী লীগের ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে।[১৯৯] ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর স্বায়ত্তশাসন প্রবক্তাদের অন্যতম শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। তিনি এর মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান নেতায় পরিণত হন। আওয়ামী লীগের ছয় দফা আন্দোলন ক্রমশ হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ও মুক্তিসংগ্রামের সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রেরণা। এই আন্দোলনের মধ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়।

প্রথমদিকে অধিকাংশ সংবাদপত্র ছয় দফার পক্ষে নীতিগতভাবে দ্বিধাহীন সমর্থন জানিয়েছিল সেটি দলা যায় না। অনেক পত্রিকা দ্বৈতনীতিও অনুসরণ করে। তবে ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে ছয় দফা উত্থাপন করার আগে থেকেই ঢাকার বিভিন্ন সংবাদপত্র পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে ছয় দফার প্রেক্ষাপট তৈরিতে ভূমিকা পালন করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর উদাসীনতা ও বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ঢাকার সংবাদপত্রে বিবৃতি, সম্পাদকীয় ও নিবন্ধ ছাপা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করার পর আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতেও সেটি অনুমোদিত হয়। আওয়ামী লীগের পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসহ ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষিত হলে এখানকার রাজনৈতিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যেটির প্রভাব ঢাকার সংবাদপত্রগুলোতেও লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি ছয় দফা কর্মসূচির বিপক্ষে অবস্থান নেয়। মুসলিম লীগ এমনকি মওলানা ভাসানীও ছয় দফা কর্মসূচির বিরোধিতা করেন। মুসলিম লীগ সমর্থক *আজাদ* এবং ট্রাস্ট মালিকানাধীন *মর্নিং নিউজ* এবং *দৈনিক পাকিস্তান* এই দাবিকে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করে।

আজাদ অনেক আগে থেকেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী ছিল। ১৯৬০ সালের ২১ মার্চ *আজাদ* 'প্রেসিডেন্টভিত্তিক সরকার' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে যুক্তি দিয়ে মন্তব্য করে, "পাকিস্তানের মত সমস্যা জর্জরিত, অনগ্রসর এবং নূতন দেশের জন্য সব চাইতে বড়

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের।"[২০০] ছয় দফা প্রশ্নে *আজাদ* এর আচরণ ছিল অন্যান্য জাতীয় ইস্যুর মতই বৈপরীত্যমূলক। *আজাদ* ছয় দফার পক্ষে কোনো সম্পাদকীয় প্রকাশ করেনি। ছয় দফা কর্মসূচির বিরোধিতা করলেও *আজাদ* পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার আঞ্চলিক বৈষম্য নিয়ে সরব ভূমিকা রাখে। ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণার অনেক আগে থেকেই বৈষম্যের বিষয়টি নিয়ে *আজাদ* একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং কিভাবে এই বৈষম্য গড়ে উঠেছে সেটি ১৯৬৩ সালের ৮ মার্চ প্রকাশিত অপর একটি সম্পাদকীয়তে উঠে আসে। *আজাদ* দুই অঞ্চলের আর্থিক বৈষম্য দূর করতে একটি বাধ্যতামূলক ও সুনির্ধারিত আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আহ্বান জানায়।[২০১] ১৯৬৩ সালের ৮ জুলাই একটি সম্পাদকীয়তে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার আঞ্চলিক বৈষম্য থাকার কথা *আজাদ* স্বীকার করে নেয়। পাশাপাশি এ ধরনের বৈষম্য পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির পথে যে শুভ নয় সেটি সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করে পত্রিকাটি। 'আঞ্চলিক বৈষম্য' শিরোনামে প্রকাশিত ঐ সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়:

> ... দেশরক্ষা, চাকুরী, ব্যবসা – বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা স্বাস্থ্য এমনকি খেলার মাঠ পর্য্যন্ত জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে এই বৈষম্য আজ প্রকট হইয়া উঠিতেছে। কোন ক্ষেত্রে আজ পর্য্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান কি পরিমাণে তার ন্যায্য হিস্যা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহার খবর এদেশের সংবাদপত্রগুলিতে প্রায় প্রায়ই নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান সহ প্রকাশিত হইতেছে ... যখনই তাহারা মুখ খুলিতেছেন বৈষম্যের অস্তিত্ব অথবা অভিযোগ সম্পর্কে প্রতিবাদ কিংবা অস্বীকৃতি নয় বৈষম্যের একটি খোঁড়া যুক্তি এবং তাহা দূরীকরণে তাঁহাদের অক্ষমতার কথাটাই প্রকারন্তরে তাঁহারা প্রকাশ করিতেছেন। ... ফলে দেশবাসীর মনে একটা বঞ্চনার ভাব এবং চাপা অসন্তোষ ক্রমেই পুঞ্জিভূত হইয়া উঠিতেছে। ইহার ফল যে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে মোটেই শুভ হইতে পারে না, সভ্য দেশের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা যত শীঘ্র বুঝিবেন এবং সে অনুযায়ী সক্রিয় ও আশু তৎপরতা গ্রহণ করিবেন, ততই মঙ্গল।[২০২]

এরই ধারাবাহিকতায় *আজাদ* ১৯৬৩ সালের ৪ ডিসেম্বর 'আঞ্চলিক বৈষম্য' শিরোনামে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত দিয়ে দেখনো হয় কিভাবে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের বাজারে পরিণত করেছে। আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনের দাবি জানিয়ে *আজাদ* মন্তব্য করে:

> ... প্রত্যেক মানুষের প্রতি সুবিচারের নীতি মানিয়া লইলে পূর্ব্ব পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক অর্থ বরাদ্দ করিতেই হয়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাগমের যদি আরও একটি দিক আমরা দেখি, তাহা হইলেও পূর্ব্ব পাকিস্তানের অর্থপ্রাপ্তির সবলতর দাবীটি সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে।[২০৩]

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি ছয় দফা ঘোষণা করার পরও *আজাদ* বিভিন্ন সম্পাদকীয়তে এই বৈষম্যের কথা তুলে ধরে। জাতীয় সংহতি দৃঢ় করতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ১৯৬৭ সালের ২০ মার্চ *আজাদ* 'আমাদের জাতীয় সংহতি' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। *আজাদ* উভয় প্রদেশের বৈষম্য দূর করে সমতা আনা এবং জাতীয় সংহতি দৃঢ় করার ওপর জোর দেয়।[২০৪] ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য নিয়ে জাতীয় পরিষদে প্রতিবেদন প্রকাশ করলে *আজাদ* বিষয়টি নিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। *আজাদ* আবারও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার আহ্বান জানায়। *আজাদ* মন্তব্য করে:

> বর্ত্তমান অবস্থায় পাকিস্তানের দুই অংশের মাঝে অর্থনৈতিক ব্যবধান অনেক। ... বৈদেশিক বাণিজ্যের আঞ্চলিক হিসেবে পূর্ব্ব পাকিস্তান বরাবরের জন্যই উদ্বৃত্ত এবং পশ্চিম পাকিস্তান বরাবরই ঘাটতি। পূর্ব্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হওয়ার পরও পশ্চিম পাকিস্তান প্রায়ই ঘাটতি অঞ্চল হিসেবে থাকিয়া যাইতেছে। ... আঞ্চলিক সমতা কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন নয়, ইহা নাগরিকদের জীবন ও জীবিকার প্রশ্ন। এক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হইতেছে, পাকিস্তানে প্রতিটি পশ্চিম পাকিস্তানীর যে সুযোগ – সুবিধা থাকিবে প্রতিটি পূর্ব্ব পাকিস্তানীরও সেই সুযোগ – সুবিধা থাকিবে।[২০৫]

তবে বৈষম্যের বিষয়ে সরব ভূমিকা পালন করলেও *আজাদ* ছয় দফার বিরোধিতা করেও সম্পাদকীয় ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৯৬৬ সালের ১১ ফ্রব্রুয়ারি লাহোর থেকে ফিরে ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন। পরদিন ১২ ফেব্রুয়ারি *আজাদ* শিরোনাম করে, "লাহোর সম্মেলনের কোটারী বিশেষের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের অভিযোগ, পূর্ব-পাকিস্তানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী আলোচিত হয় নাই।"[২০৬] পূর্ব বাংলা সফর করার সময় ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজ ময়দানে আইয়ুব খান ছয় দফার বিরোধিতা করে বলেন যে, পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করার জন্য একদল বিচ্ছিন্নতাবাদী ছয় দফার নামে দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।[২০৭] একই সময় *আজাদ*-এর সকল সংবাদ ও সম্পাদকীয় হয়ে ওঠে আইয়ুব খানের বক্তব্যের সমর্থক। ১৯৬৬ সালের মার্চ-এপ্রিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আন্দোলন তীব্রতর হতে থাকলে *আজাদ* নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে 'রাজনৈতিক গোলকধাঁধা' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলনের সমালোচনা করে বলা হয়:

> অবস্থাকে এমনভাবে রূপ দেওয়া হইতেছে যে, মনে হইতেছে, কয়েকটি প্রশ্নের আশু মীমাংশা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। সে প্রশ্নগুলি হইতেছে : ১. পাকিস্তান অখণ্ড থাকিবে না, খণ্ডিত হইয়া পড়িবে, ২. পাকিস্তানের স্থায়িত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে না আঞ্চলিক বিচ্ছিনতার ফলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে, ৩. পাকিস্তান অগ্রগতির পথে আগাইয়া যাইবে, না

Dhaka University Institutional Repository

গৃহযুদ্ধের অশুভ পথে নামিয়া পড়িবে। যে কোন পক্ষ হইতে দেশের অবস্থা সম্পর্কে এ ধরনের প্রশ্ন তুলিয়া ধরা হইলে তাহা চরম বিপদজ্জনক অবস্থা বলিয়া বিবেচিত না হইয়া পারে না।[২০৮]

একই দিন ৯ এপ্রিল *আজাদ* মওলানা ভাসানীর 'ছয় দফা সম্পর্কে ভাসানী যাহা বলে' শিরোনামে মন্তব্য করে, "ন্যাপ প্রধান মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী অদ্য শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা বাতিল করিয়া দেন"[২০৯] ১৯৬৬ সালের ১৭ মে 'রাজনৈতিক ঐক্য' শিরোনামে প্রকাশিত অপর একটি সম্পাদকীয়তে ছয় দফাকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলোর মধ্যকার অনৈক্যের সমালোচনা করা হয়। অনৈক্যের কারণেই বিরোধী দল সরকারের দমনপীড়নের শিকার হচ্ছে বলে অভিযোগ করে পত্রিকাটি।

আজাদ-এর পাশাপাশি ট্রাস্ট মালিকানাধীন পত্রিকা *মর্নিং নিউজ* ছয় দফার বিপক্ষে অবস্থান নেয়। ছয় দফার পক্ষে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে ১৯৬৬ সালের ২১ এপ্রিল 'Time for Action' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়টিতে উল্লেখ করা হয়, "All right thinking persons will join President Ayub Khan in his call to fight against those who want to disrupt national unity for their personal ends"[২১০]

ইত্তেফাক ছয় দফাকে সমর্থন করে বিভিন্ন প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করতে থাকে। ব্যক্তিগতভাবে পত্রিকাটির সম্পাদক মানিক মিয়া ছয় দফার সবগুলো সমর্থন না করলেও একটি পর্যায়ে জাতীয় স্বার্থে তিনি এটি সমর্থন করেন। ছয় দফা বিরোধী প্রচারণার জবাব দিয়ে এবং ছয় দফার ইতি বাচক ব্যাখ্যা দিয়ে *ইত্তেফাক* ছয় দফার প্রধান মুখপত্রে পরিণত হয়। ছয় দফাকে সমর্থন করা সম্পর্কে মানিক মিয়া বলেন:

> ...৬ - দফার কোন কোন দফা আমি সমর্থন করি না সত্য, কিন্তু ৬ - দফা ভাল কি মন্দ, সেই প্রশ্ন মুলতবী রাখিয়াও আমি বলিতে চাই যে, এই কর্মসূচী সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার পূর্বে আমার সাথে কেহ কোন পরামর্শ করে নাই। ... পরবর্তীকালে অবশ্য ৬ - দফাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা ছাড়াও অহর্নিশ যে হুমকি, প্রদর্শিত হইতে থাকে এবং ক্ষমতাসীন মহল উত্তরোত্তর যে রণমূর্তি ধারণ করেন, এই অঞ্চলে তথা সমগ্র পাকিস্তানের বৃহত্তর স্বর্থে আমি তার প্রতিবাদ করিতে প্রয়াস পাই এবং ৬ দফা কর্মসূচী প্রণয়নের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করি। ... ৬ – দফা একটি রাজনৈতিক প্রোগ্রাম মাত্র এবং রাজনৈতিক পর্যায়েই ইহার মীমাংসা হওয়া উচিত। ... শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত নৈরাজ্য ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক বঞ্চনায় জনমনের বিক্ষোভই এই 'চরম' কর্মপন্থার মূল কারণ।[২১১]

১৯৬৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান তার ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করলে পরদিন *ইত্তেফাক* সেটি প্রকাশ করে।[২১২] তবে *ইত্তেফাক* এর অনেক আগে থেকেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বিভিন্ন বৈষম্যের

Dhaka University Institutional Repository

কথা তুলে ধরে এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রকাশ করে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে। মানিক মিয়া ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন ফোরামে এই বৈষম্যের কথা তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ভবনে সংবাদপত্র সম্পাদকদের সাথে এক সভায় আইয়ুব খানের কাছে এই বৈষম্যের কথা তিনি তুলে ধরেন। মানিক মিয়া মন্তব্য করেন, "ফেডারেল রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে থাকার দরুনই হোক কিংবা পুঁজি বিনিয়োগকারীদের ইচ্ছা অনিচ্ছার দরুনই হোক, পশ্চিম পাকিস্তান অধিকতর শিল্পায়িত হইয়াছে এবং দেশের মূলধন সেখানেই গড়িয়া উঠিয়াছে।"[২১৩] মানিক মিয়া তার 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে বিভিন্ন সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্যের তথ্য প্রকাশ করেন। ১৯৬৪ সালের ৮ অক্টোবর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য তুলে ধরে তিনি 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে মন্তব্য করেন:

> ... পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই পর্যন্ত যে অবস্থা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে পদে পদে প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যনীতি অনুসৃত হইয়াছে। ... ইহার পর আবার করাচী হইতে ফেডারেল রাজধানী অপসারণ করিবার কালে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানের কথা বিবেচনা না করিয়াই ইসলামাবাদে ফেডারেল রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া জাতীয় সম্পদ হইতে তথায় শত শত কোটি টাকা ব্যয় করা হইতেছে। এমতাবস্থায় পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানীদের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্তত তাঁহাদের সমানাধিকার রহিয়াছে।

আঞ্চলিক বৈষম্য নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বিবৃতি ১৯৬৪ সালের ৭ নভেম্বর *ইত্তেফাক*-এ প্রকাশিত হয়। কিভাবে পরিকল্পিত ভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করে গুটিকয়েক অবাঙালি পুঁজিপতির জন্ম দেওয়া হচ্ছে সেটি তার বিবৃতিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শেখ মুজিবুর রহমান আইয়ুব খানের সমালোচনা করে বলেন, "প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ব্যাপারটাই পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পায়ন ব্যাহত করার একটি সুচতুর ত্রিমুখী পরিকল্পনার শামিল। এই পরিকল্পনার সঙ্গে ৩ টি পক্ষ – যথা ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সরকার, পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদের একটি ক্ষুদ্র চক্র এবং বৈদেশিক ঋণদান সংস্থাসমূহ ও তাঁহাদের বিশেষজ্ঞগণ জড়িত রহিয়াছেন।"[২১৪] আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার 'প্রাদেশিকতা' বা 'আঞ্চলিকতা' শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। বিষয়টির সমালোচনা করে ১৯৬৫ সালের ২০ এপ্রিল *ইত্তেফাক* পত্রিকার 'মিঠে কড়া' শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়:

> ...অতীতে প্রথম যখন এসব বৈষম্য বঞ্চনার কথা তোলা হয়, তখন অপরাঞ্চলের কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্রগণ সরাসরি ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া 'প্রাদেশিকতা', 'আঞ্চলিকতা', 'দেশানুগত্যহীনতা' ইত্যাদি তিরস্কারের দ্বারা সমস্যাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। ক্ষমতাসীন মহলের রক্তচক্ষু এবং রাজনৈতিক নির্যাতনের চাপ সহ্য করিয়াও জনগণ বিষয়টি তুলিয়া ধরিয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানিদের একাধিপত্য ছিল বেশি। ফলে প্রশাসনের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঙালিরা শোষণের শিকার হয়। বিষয়টির সমালোচনা করে *ইত্তেফাক* 'মিঠে-কড়া' শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে:

> ... পকিস্তানের সরকারি রাজস্বের সিংহভাগ ব্যায়িত হয় দেশরক্ষা খাতে। দেশ রক্ষার পরেই যে খাতে অধিক রাজস্ব ব্যয়িত সেটা হইতেছে প্রশাসনিক বিভাগ। দেশরক্ষা বিভাগে পূর্ব পাকিস্তানীর সংখ্যা কত তার কোন সঠিক তথ্য জানা না থাকিলেও উহা যে তিন চার পার্সেন্টের বেশী নয় তাহা কোন কোন ভূতপূর্ব জতীয় পরিষদ সদস্যের বক্তৃতাদি হতে জানা গিয়াছে। প্রশাসনিক বিভাগে পূর্ব পাকিস্তানীর সংখ্যা অন্য অঞ্চলের চাইতে অনেক কম। ... জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুই বিভাগের খরচের যে প্রভাব, পুর্ব পাকিস্তানীরা তাহা হইতে প্রায় সম্পূর্ণ রূপেই বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছে।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে প্রচারণা চালানোর কৌশল হিসেবে *ইত্তেফাক* জাতীয় নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতিও গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতে থাকে। যেমন – ১৯৬৫ সালের ১৮ জুনের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের উপনেতা শাহ আজিজুর রহমান ১৯৬৫-৬৬ সালের জাতীয় বাজেট বক্তৃতায় বলেন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও দুই প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার মাধ্যমেই পাকিস্তানকে শক্তিশালী করা সম্ভব। আবার ১৯৬৫ সালের ২৩ জুন *ইত্তেফাক* পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের স্বারত্তশাসন সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করে। তিনি মন্তব্য করেন, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার একমাত্র উপায় হলো দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে দেশে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা। তার মতে, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় ও মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে রেখে অবশিষ্ট বিষয় প্রদেশসমূহকে প্রদান করতে হবে।[২১৫] এভাবে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে *ইত্তেফাক* প্রচারণা চালায়। ১৯৬৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ছয় দফা সম্পর্কে আওয়ামী লীগের সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতার ওপর ভিত্তি করে *ইত্তেফাক* প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উক্ত প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়:

> ... রাজনীতিতে মধ্যপন্থা বিশ্বাস করা চলে না। তাই দেশের বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়াই তিনি (শেখ মুজিবুর রহমান) জাতির সামনে ৬ – দফা সুপারিশ তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই ৬ – দফা কোনো রাজনৈতিক দর কষাকষি নয়, কোন রাজনৈতিক চালবাজীও নয়। এই ৬ – দফার সহিত পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ অধিবাসীর জীবন মরণের প্রশ্ন জড়িত।

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি এই প্রতিবেদনে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের পরিবর্তে রাজনীতিতে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচিকে সমর্থন করার আহ্বান জানানো হয়।[২১৬] পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সোচ্চার সমমনা রাজনৈতিক দল ন্যাপ প্রধান ভাসানী ছয় দফার বিরোধিতা করলে উভয় দলের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। ১০ এপ্রিল *ইত্তেফাক* 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে ভাসানীর সমর্থন আদায়ে বিষয়টির একাটি ব্যাখ্যা দিয়ে মন্তব্য করে, "আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত তাঁদের দাবি এক। ... মাওলানা সাহেব কার্যতঃ যাহাই করুন না কেন, তিনিও লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করিতেছিলেন।"

শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সারাদেশে ছয় দফার প্রচারণা শুরু করেন। ছয় দফার জনপ্রিয়তায় আতঙ্কিত হয়ে আইয়ুব খান বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন শুরু করেন। কিন্তু এসব ভয়ভীতি উপেক্ষা করে ছয় দফার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন জোরালো ভাষায় সমর্থন জানায় *ইত্তেফাক*। ১৯৬৬ সালের ২৪ এপ্রিল পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগ এক জনসভার ঘোষণা দিলে *ইত্তেফাক* ২১-২৪ এপ্রিল পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রথম পৃষ্ঠায় ঐ জনসভার সংবাদ প্রকাশ করে। ১৯৬৬ সালের ২৬ এপ্রিল 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে ছয় দফার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলা হয়:

> জনতার কাফেলা চলবেই। ... আজ দেশবাসী এমন নেতৃত্ব চায় যারা নির্যাতন ও হয়রানীতে হতোদ্যম হইবেন না এবং জন্তার অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে আগাইয়া নিতে পিছপাও হইবেন না। বরং জনদাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জেল জুলুম নির্যাতন হয়রানিকে দেশ সেবার সুযোগ বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

ছয় দফার প্রচারণার এক পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৮ মে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার হন। এর আগে পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফার পক্ষে তিনি যে অভাবনীয় জনমত তৈরি করেন সেটি সত্যিই অকল্পনীয়। নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদ করে *ইত্তেফাক* ১০ মে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে মন্তব্য করে:

> ৬ – দফার যে বিপুল জনসমর্থন রহিয়াছে সেই প্রশ্ন এখানে না তুলিয়াও বলা চলে যে, নির্যাতনের পথে কোন সমস্যার সমাধান হয় না, বরং জটিল হয়। যাহারা রাজনৈতিক করণে বিশেষত জনগণের দাবী দাওয়া তুলিতে গিয়া নির্যাতিত, নিগৃহীত হইতেছেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি রহিল। জাতির কোন ত্যাগই বৃথা যায় না, ইহাই আজিকার সান্ত্বনা ও প্রেরণা।

এ সময় *ইত্তেফাক* ছয় দফার পক্ষে জনমত তৈরিতে কিছুটা কৌশলগত ভূমিকা নেয়। ১৯৬৬ সালের ৬ জুন নুরুল আমীনসহ বিরোধী নেতৃবৃন্দের বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়ে পত্রিকাটি মন্তব্য করে, "শত অত্যাচারের মুখেও পর্বত দৃঢ় মনোবল লইয়া নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে শরীক হউন : দেশবাসীর প্রতি ঢাকার মৌলিক গণতন্ত্রীদের

Dhaka University Institutional Repository

আহ্বান। অদূরদর্শী নিপীড়ন নীতি বর্জন করিয়া ধৃত নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিন - নুরুল আমীন" ।[২১৭] নুরুল আমীনের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ছয় দফার পক্ষে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সমর্থন আদায় করা এবং পরদিন অর্থাৎ ৭ জুনের হরতাল সম্পর্কে জনমত তৈরি।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের কথা তুলে ধরার ক্ষেত্রে *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬১ সালের প্রথম দিকে *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার সম্পাদক আবদুস সালাম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের বিষয়টি তার পত্রিকায় তুলে ধরতে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশের উদ্যোগ নেন। ফলে প্রকাশিত হয় রেহমান সোবহানের 'Challenge of Disparity' এই প্রবন্ধে রেহমান সোবহান যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অধীনে দুই অর্থনীতির ধারণা প্রচারের কথা জানান। একই সিরিজে আবদুস সালামের বিষয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ড. কামাল হোসেনের 'Challenge of Democracy' এবং অধ্যাপক মোশাররফ হোসেনের 'Challenge of Education' শিরোনামে প্রবন্ধ *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২১৮] সামরিক শাসন বহাল থাকা অবস্থাতেই ১৯৬১ সালের ২৮ মে ঢাকায় ইসলামি একাডেমির এক আলোচনা সভায় এবং পরে সেপ্টেম্বর মাসে লাহোরে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এক সম্মেলনে অধ্যাপক রেহমান সোবহান 'How to build Pakistan into a well-knit Nation' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি পাকিস্তানের সংহতির স্বার্থেই দুই প্রদেশের জন্য কেন আলাদা অর্থনীতির দরকার সেটি ব্যাখ্যা করেন।[২১৯] *পকিস্তান অবজারভার* বিষয়টির ওপর ১৯৬১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটি থেকে দেখা যায় যে, রেহমান সোবহান প্রতিটি প্রদেশকে তার বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ আয়ের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব দানের প্রস্তাব করেন এবং উল্লেখ করেন যে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কাঠামোর মধ্যেই এটি বাস্তবায়ন সম্ভব।[২২০] এ সময় *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য নিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান সাঈদ হাসান, রেডিও পাকিস্তানে বৈষম্যের বিষয়টিকে 'মৃত ঘোড়া' বলে উল্লেখ করেন।[২২১] এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সদস্য ও বাঙালি অর্থনীতিবিদ ড. এম. এন. হুদা। *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি এর প্রতিবাদ করেন। ১৯৬২ সালের ২৮ ডিসেম্বর 'Disparity Not a Dead Horse' শিরোনামে প্রকাশিত উক্ত সাক্ষাৎকার থেকে দেখা যায় যে, ড. হুদা উল্লেখ করেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয়ের বৈষম্যের বিষয়টি মোটেও মৃত ঘোড়া নয় বরং এটি অত্যন্ত জীবিত, বিরাট ও বর্ধমান সমস্যা এবং কখনোই এর স্বভাবিক মৃত্যু হবে না।[২২২] ছয় দফা উত্থাপন করার পর *পাকিস্তান অবজারভার* আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার পক্ষে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের বক্তব্য তুলে ধরে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় নেতা নুরুল আমীন আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার পক্ষে বক্তব্য দেন যা *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকায় ১৯৬৭ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। তিনি মন্তব্য করেন যে, ১৯৫৬ সালের সংবিধানের আলোকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে পাকিস্তানের সংহতি বজায় রাখা সম্ভব নয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ১৯৬৬ সালের ৭ জুন হরতাল আহ্বান করে। বিষয়টির সমালোচনা করে ঐদিন *আজাদ* 'হরতালকে সাফল্য-মণ্ডিত করার জন্য আওয়ামী লীগের একক প্রচেষ্টা' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটিতে মন্তব্য করা হয়, "পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য বিরোধী দলগুলো এই হরতালের প্রশ্নে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চুপ ও নিষ্ক্রিয় থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ উহার শক্তি পরীক্ষায় লিপ্ত হইয়াছে বলিয়া রাজনৈতিক মহলের দৃঢ় বিশ্বাস।"[২২৩] ৭ জুন পাকিস্তানে যে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয় তাতে পুলিশের গুলিবর্ষণে নিহতের ঘটনা ঘটে। কিন্তু হরতালের প্রকৃত খবর যাতে জনগণ জানতে না পারে সেজন্য সরকারি প্রেসনোট ছাড়া অন্যসব খবর প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে হরতালের কোন সংবাদ ৮ জুন ঢাকার পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়নি। তবে ছয় দফা সমর্থনকারী পত্রিকাগুলো নিজস্ব কৌশলে খবর প্রকাশ করার চেষ্টা করে। ৮ জুন *আজাদ* 'পুলিশের গুলিতে ১০ জন নিহত' শিরোনামে সরকারি প্রেসনোট প্রকাশ করে। *পাকিস্তান অবজারভার* কিছুটা চতুরতার সাথে সরকারি প্রেস নোট প্রকাশ করে। ৮ জুন পত্রিকাটি তিন লাইনে সাত কলামব্যাপী সরকারি প্রেসনোট প্রকাশ করে নিম্নোক্ত শিরোনামে –

It's Govt Press Note
Ten killed in firing
Hartal in City and Suburbs

প্রতিবেদনটির মাঝখানে কালো বর্ডার দিয়ে একটি নোট দেওয়া হয় - "We are not publishing our staff correspondat's reports on the incident owing to some unavoidable circumstances -Editor "[২২৪]

ইত্তেফাক-এ সরকারি প্রেসনোটের যে হুবহু অনুলিপি পাওয়া যায় তাতে পুলিশের নির্যাতন এবং ৭ জুনের হরতাল পালনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রেসনোটে বলা হয়:

> ...আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত হরতাল ৭-৬-১৯৬৬ তারিখে অতি প্রত্যুষ হইতে পথচারী ও যানবাহনের ব্যাপক বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়। ... তেজগাঁও দুই-ডাউন চট্টগ্রাম মেইল তেজগাঁও রেলস্টেশনের আউটার সিগন্যালে আটক করিয়া লাইনচ্যুত করা হয়। ট্রেনখানা প্রহারা দানের জন্য একদল পুলিশ দ্রুত তথায় গমন করে। জনতা তাদের ঘিরিয়া ফেলে এবং তুমুল ভাবে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। ফলে বহু পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। যখন পুলিশ জনতার

Dhaka University Institutional Repository

> কবলে পড়িয়া যাবার উপক্রম হয় তখন আত্মরক্ষার জন্য তাহারা গুলিবর্ষণ করে। ফলে ৪ ব্যক্তির মৃত্যু হয়।... নারায়ণগঞ্জের এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা সকাল ৬-৩০ মিনিটের সময় গলাচিপা রেলওয়ে ক্রসিং এর নিকট ঢাকাগামী ট্রেন আটক করে। ... জনতা জোর করিয়া যাত্রীদের নামাইয়া দেয়। ... উচ্ছৃঙ্খল জনতা থানা ভবনে প্রবেশ করার পর পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলিবর্ষণ করার ফলে ৬ ব্যক্তি নিহত হয় ও আরও ১৩ ব্যক্তি আহত হয়। ... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শ্রেণির ছাত্র পিকেটিং করে এবং সেখানে আংশিক ধর্মঘট পালিত হয়।[২২৫]

সরকারি প্রেসনোটে জনতা শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় যেটি স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালনের প্রতি ইঙ্গিত করে। ৭ জুন হরতালে নিহত হওয়ার ঘটনার সমালোচনা করে ৯ জুন মানিক মিয়া ‘রাজনৈতিক মঞ্চ’ কলামে ছয় দফা আন্দোলনকে জনগণের নিজেদের আন্দোলন বলে উল্লেখ করে আন্দোলন মোকাবেলায় সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেন।

১৯৬৬ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত ছয় দফার পক্ষে *ইত্তেফাক*-এর প্রচারণা অব্যাহত থাকে। গবেষণায় দেখা যায় যে, ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসের ১, ১০, ২৪ ও ২৬, মে মাসের ১০, ১২, ১৪, ১৯ এবং জুন মাসের ৫, ৯, ৭ ও ১৫ তারিখে ‘রাজনৈতিক মঞ্চ’ কলামে ছয় দফাকে সমর্থন এবং এর যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়। ছয় দফা আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে একাধিকবার ‘রাজনৈতিক মঞ্চ’ কলামে লেখার কারণে তৃতীয় ও শেষ বারের মতো ১৯৬৬ সালের ১৫ জুন *ইত্তেফাক* সম্পাদক মানিক মিয়া গ্রেফতার হন। ১৬ জুন পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে (৫২ নং ধারার ২ নং উপ-ধারা) ১ নং রামকৃষ্ণ মিশন রোডস্থ নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৭ জুন থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত *ইত্তেফাক* পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ থাকে। এছাড়াও সাপ্তাহিক *ঢাকা টাইমস*, সাপ্তাহিক *পূর্বাণী*-র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[২২৬]

ইত্তেফাক-এর প্রকাশনা বাতিল প্রসঙ্গে ১৮ জুন *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকা ‘Ittefaq’s Press Forfeited’ শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে সরাসরি সরকারের সমালোচনা না করে সামগ্রিক বিষয়টির একটি বিবরণ তুলে ধরে মন্তব্য করা হয়:

> ... The action was taken under sub-rule two of rule 52 of the Defence of Pakistan Rules for alleged violation of the restrictive orders ...The Newspaper was charged with alleged contravention of prohibitory order in baging published reports, comments, views and statements which were likely or intended to infringe the sivereignty of the State of Pakistan or undermineits integrity. It was also alleged that the newspaper had carried such material as was likely of intended to create feelings of enmity of hatred between different class of citizens. Other charges related to publishing of material concerning student’s strike, agitation ... and observance of protest day by Awami League in June 7 last.[২২৭]

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্নভাবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করার পাশাপাশি *ইত্তেফাক*-এর প্রকাশনা বন্ধ করায় সাংবাদিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ঘটনাটির প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন প্রেস ক্লাবে এক সভার আয়োজন করে এবং পত্রিকাটির প্রকাশনা চালু না হলে বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করার কথা বলা হয়। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়:

> The meeting condemned the drastic Government measure in the strongest possible terms and demanded that the forfeiture order served on the New Nation Printing Press be rescinded forth with. The meeting was of the consistent by the Government of the freedom of the Press under the Defence of Pakistan Rules obtaining there course to even the special press laws which were put under moratorium under the so – called "Gentlemen's Agreement" between the Government and the newspaper proprietors and the editors are attacked directed against all section of the Newspaper industry – the working journalists, the press workers, the editors and the newspaper proprietors.[২২৮]

ইত্তেফাক নিয়ে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৮ জুন পূর্ব পাকিস্তান গণপরিষদে বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলের সদস্যগণ একটি মুলতুবি ও একটি অধিকার প্রস্তাব উত্থাপন করলে স্পীকার সেটি বাতিল করেন। ফলে স্পীকার ও স্বতন্ত্র দলের সদস্যগণ স্বল্প সময়ের জন্য ওয়াক আউট করেন।[২২৯] সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে ২২ জুন ঢাকা ও চট্টগ্রামে সাংবাদিক ধর্মঘট পালিত হয়। ছয় দফার বিরোধিতাকারী *আজাদ*, *মর্নিং নিউজ* ও *দৈনিক পাকিস্তান* ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে আর কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। অসাংবাদিক কর্মচারীদের দ্বারা চার পৃষ্ঠার আকারে উক্ত তিনটি পত্রিকা বের হলেও সংবাদপত্র হকাররা সেগুলো বিক্রি করেননি। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা পত্রিকাগুলোও বিলি করা হয়নি।[২৩০] *ইত্তেফাক* নিষিদ্ধ করার বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়ায়। বিচারপতি বি এ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ঢাকা হাইকোর্টের এক বিশেষ বেঞ্চ সর্বসম্মত রায়ে সরকার কর্তৃক পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির ৫২ (খ) ধারা বলে *ইত্তেফাক* পত্রিকার মুদ্রালয় নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করাকে অবৈধ ও আইনের চোখে মূল্যহীন ঘোষণা করে। এর ফলশ্রুতিতে *ইত্তেফাক* প্রকাশিত হতে থাকলেও ১৯৬৬ সালের ২৭ জুলাই পুনরায় এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৬৭ সালের ২৯ মার্চ অসুস্থতার কারণে মানিক মিয়াকে মুক্তি দেওয়া হলেও ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির আগে পর্যন্ত *ইত্তেফাক* আর প্রকাশিত হতে পারেনি।

সংবাদ পত্রিকায় প্রতিবাদের ভাষা ছিল *ইত্তেফাক* ও *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার চেয়ে ভিন্ন। ৭ জুন পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ৮ জুন পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়নি। ৯ জুনের সংখ্যায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলা

Dhaka University Institutional Repository

হয়, "যে মর্মান্তিক বেদনাকে ভাষা দেওয়া যায় না সেখানে নীরবতাই একমাত্র ভাষা। তাই গতকল্য 'সংবাদ' প্রকাশিত হইতে পারে নাই। আমাদের এই নীরব প্রতিবাদ একক হইলেও ইহাতে আমাদের পাঠকরাও শরীক হইলেন, ইহা আমরা ধরিয়া লইতেছি।"[২৩১]

সংবাদ গুলিবর্ষণ সংক্রান্ত অন্যান্য খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। বিষয়টি নিয়ে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বিতর্ক হলেও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত সরকারের পক্ষেই যায়। ১৯৬৬ সালের ৯ জুনের সংবাদ থেকে জানা যায় যে, ৮ জুন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত পূর্ব পাকিস্তানে পুলিশের গুলিবর্ষণ সংক্রান্ত তিনটি মুলতুবি প্রস্তাব স্পীকার বাতিল করেন। প্রতিবাদে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ পরিষদ কক্ষ বর্জন করেন। একইদিন প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনেও মুলতুবি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যরা পরিষদকক্ষ বর্জন করেন।[২৩২]

ছয় দফার প্রচারণার ক্ষেত্রে *সংবাদ*-এর অন্য আরেকটি ভূমিকা লক্ষণীয়। শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করার পর ছাত্রলীগও এর প্রচারণায় জড়িয়ে পড়ে। ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) সহায়তায় ছয় দফার ৫০,০০০ লিফলেট ছাপিয়ে জনগণের মধ্যে বিলি করেছিলেন। এসব লিফলেট *সংবাদ* পত্রিকার প্রেস থেকেই ছাপানো হতো।[২৩৩]

৮. উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসে এক মাইলফলক। পাকিস্তানের সামরিক একনায়ক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবির ভিত্তিতে ১৯৬০ এর দশকের প্রথম থেকে যে আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠতে থাকে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ছিল সে সংগ্রামেরই চূড়ান্ত রূপ। ছয় দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং আইয়ুব খানের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে অধিকার বঞ্চিত মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ইত্যাদি বহুমাত্রিক আন্দোলনের ধারা ধীরে ধীরে একই বিন্দুতে এসে মিলিত হতে থাকে। এর সাথে ছাত্রদের এগারো দফা মিলে বিক্ষোভ এক প্রবল রূপ ধারণ করে যার চূড়ান্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে গণ-অভ্যুত্থানের সময়ে। জাতীয় অধিকারের প্রশ্নসহ গণতন্ত্রের এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি এ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছিল যা এর আগে কখনই ঐক্যবদ্ধ এবং বিপুল সংগ্রামের দাবি হিসেবে আসেনি। এরই ধারাবাহিকতায় একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়। সুতরাং উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই আন্দোলনের ফলে স্বল্প সময়ের জন্য বাক্ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিশেষ স্বীকৃতি

Dhaka University Institutional Repository

অর্জিত হয় এবং এর পূর্বাপর সময়ে ঢাকার সংবাদপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ভূমিকা তুলে ধরা হলো। *ইত্তেফাক* -এর প্রকাশনা ১৯৬৬ সালের ১৭ জুন -১১ জুলাই এবং ২৭ জুলাই - ১৯৬৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ থাকায় এ সময়সীমার মধ্যে পত্রিকাটির ভূমিকা পাওয়া যায় না।

৮.১ মামলার বিবরণ

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার করার জন্য পাকিস্তানের ভূতপূর্ব বিচারপতি এস. এ. রহমানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। মামলাটির প্রকৃত নাম ছিল – রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য। তবে আইয়ুব খানের সরকার রাজনৈতিক সুবিধার জন্য পত্র পত্রিকায় এটিকে ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা’ হিসেবে প্রচার করে।[২৩৪] তবে মামলার অভিযুক্তরা এবং আরও অনেকে ‘ষড়যন্ত্র’ শব্দটি মেনে নিতে রাজি নন। কারণ তারা মনে করেন দেশপ্রেমিক বাঙালিদের অসম্মান করার জন্য পাকিস্তানিরা ‘ষড়যন্ত্র’ শব্দটি ব্যবহার করেছিল; যেমনভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিরা মুক্তিযোদ্ধাদের বলত দুষ্কৃতকারী।[২৩৫] ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে ইসলামাবাদ থেকে কয়েক দফা ঘোষণায় জানানো হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা করার একটি চেষ্টা তারা ব্যর্থ করে দিয়েছে। ১৯৬৮ সালের ৭ জানুয়ারি *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকায় একটি সরকারি প্রেস নোট এবং অভিযুক্তদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়।[২৩৬] ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন থেকে ট্রাইবুনালে বিচার কাজ শুরু হয়।

মামলা চলাকালীন প্রতিদিন পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রে মামলার বিবরণ ছাপা হতো। আইয়ুব সরকারের ধারণা ছিল পত্রিকায় প্রতিদিন মামলার বিবরণ ছাপা হলে জনগণের মধ্যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি হবে। কিন্তু এই ধারণা ছিল ভুল। আগরতলা মামলা বরং বাঙালি জাতীয়তাবাদকে এগিয়ে নিয়েছে।[২৩৭] ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলন এবং আগারতলা ষড়যন্ত্র মামলার কারণে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পায় এবং এই মামলার বিরুদ্ধে ধূমায়িত অসন্তোষ তীব্রতর হতে থাকে। মামলার প্রাত্যহিক কার্যবিবরণী দৈনিক পত্রিকায় যতই প্রকাশিত হতে থাকে, বাঙালি জনগণ ততই উপলব্ধি করতে পারে শাসক শ্রেণির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? এই মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানের জবানবন্দিতে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ ও বঞ্চনার বাস্তব দিকগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তিনি “পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি দাবাইয়া রাখার জন্যই এই ষড়যন্ত্র মামলা বলে উল্লেখ করেন”।[২৩৮] শেখ মুজিবুর রহমানের সাহসী বক্তব্য সরকারের দুর্বল অভিযোগ সম্পর্কে জনগণকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। আইনজীবী এবং অন্য সবার প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের পরামর্শ ছিল যে, মামলার

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে শুধু আদালতেই লড়াই করলে হবে না, লড়াই করতে হবে রাজনৈতিকভাবে দেশে ও বিদেশে। লক্ষ্য হবে অভিযুক্তদের প্রতি জনগণের সমর্থন যেন দিন-দিন বৃদ্ধি পায়। তিনি আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে একটি গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। *আজাদ, সংবাদ* ও *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকায় নিয়মিত মামলার বিবরণ ছাপা হচ্ছিল। তবে মামলাটি বিচারাধীন থাকায় মামলার পক্ষে বা বিপক্ষে নিজস্ব মতামত প্রদান করে সংবাদ বা সম্পাদকীয় প্রকাশ করা পত্রিকাগুলোর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে মামলার জবানবন্দি ও সাওয়াল-জওয়াব ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করে কৌশলে জনমত গঠনের চেষ্টা করা হয়।

রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক দিয়ে *আজাদ* শেখ মুজিবুর রহমান বা আওয়ামী লীগকে সমর্থন না করলেও মামলার বিবরণী ছাপার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। পত্রিকাটির হয়ে রিপোর্ট করেছিলেন সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ। সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ স্পেশাল ট্রাইবুনালের শুনানি সম্পর্কিত সংবাদগুলো অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সংগ্রহ করেন এবং *আজাদ* সেগুলো গুরুত্ব দিয়েই প্রকাশ করে। ১৪ পৃষ্ঠার *আজাদ*-এ প্রথম পাতায় মামলা সংক্রান্ত খবরাদি এবং ভেতরের ১২ পাতায় মামলার প্রতিদিনের কার্যক্রমের পূর্ণ বিবরণ ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে *আজাদ*-এর প্রথম পৃষ্ঠায় আগরতলা মামলা সংক্রান্ত ১২ টি, জুলাই মাসে ৬ টি, আগস্ট মাসে ৩৪ টি এবং নভেম্বর মাসে ৪৭ টি শিরোনাম ছাপা হয়। ডিসেম্বর মাসে মামলা সংক্রান্ত খবর হ্রাস পায় কারণ মামলার শুনানি শেষ হয়ে গিয়েছিল। এর বাইরে ১৯৬৮ সালের জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত *আজাদ* আগরতলা মামলা সংক্রান্ত ছোট-বড় প্রায় ১৭০ টি সংবাদ প্রকাশ করে।[২৩৯]

কিন্তু *আজাদ*–এর প্রতিনিধি হিসেবে ফয়েজ আহমদকে গ্রহণ করতে পাকিস্তান সরকারের আপত্তি ছিল। তবে পত্রিকাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুল আনাম খান সরকারের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, প্রধান প্রতিবেদক ফয়েজ আহমদ ছাড়া অন্য কাউকে নিয়োগ করা হবে না এবং তাকে গ্রহণ করা না হলে *আজাদ* এই মামলার রিপোর্ট করা থেকে বিরত থাকবে।[২৪০] তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও *আজাদ* এর এই দৃঢ় ভূমিকার জন্য ফয়েজ আহমদের পক্ষে রিপোর্ট করা সহজ হয়ে ওঠে। রিপোর্টাররা সকাল ন'টার আগেই যার যার প্রবেশ কার্ড দেখিয়ে নির্ধারিত স্থান গ্রহণ করতেন। ফয়েজ আহমদ তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, বিচার কক্ষটি ছিল ভীতিকর ও ক্ষুদ্র। বিচারকদের ডান পাশে ছিল নির্দিষ্ট কয়েকজন সাংবাদিকের জন্য চেয়ার ও টেবিল। সাংবাদিকদের ডান পাশে অভিযুক্তদের জন্য স্থান করা হয়েছিল। *আজাদ* প্রতিদিন 'ট্রাইবুনাল কক্ষে' নামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণ নিয়ে একটি অতিরিক্ত প্রতিবেদনও প্রকাশ করে। প্রতিদিন মূল প্রতিবেদন লেখা শেষ করে রাত বারোটার পর ফয়েজ আহমদ এই নিজস্ব প্রতিবেদন লিখতেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়ে তিনি বলেন, “মামলার শুনানির প্রতিদিনের প্রতিবেদন ছাড়াও প্রত্যহ আমি তখন ‘ট্রাইবুনাল কক্ষে’ নামক একটি ক্ষুদ্রায়তনের বিশেষ রিপোর্ট লিখতাম – যা ছিল মূল মামলার বাইরে সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং দুঃখ–বেদনা-আনন্দ, সাহসিকতা স্বাভাবিক মানবধর্মী বিষয়ক।”[২৪১]

ফয়েজ আহমদের এই প্রতিবেদন বাঙালি জনগণের কাছে জনপ্রিয়তা পায়, ফলে *আজাদ*-এর বিক্রি ও চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তবে মামলার আরও অনেক ঘটনা ছিল যা রিপোর্ট করা হয়নি। কিন্তু এরপরও যা প্রকাশ করা হয়েছিল তা গণজাগরনের জন্য যথেষ্ট ছিল। *আজাদ* তাদের প্রতিবেদনে বিশেষ শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করে, ফলে জনগণের কাছে শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে একটি বিশেষ ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৯৬৮ সালের ২০ জুন *আজাদ* উল্লেখ করে যে, অধিবেশন সমাপ্তির পর শেখ মুজিবের সাথে আলাপ করার জন্য কাঠগড়ায় দর্শকদের ব্যাপক ভিড় জমে। প্রায় প্রতিদিনের রিপোর্টেই কাঠগড়ায় দাঁড়ানো শেখ মুজিবের সাথে হাতমেলানো বা কথা বলতে জনগণের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। এই বার্তা যখন সাধারণ বাঙালি জনগণের কাছে পৌছে তখন তারাও সচেতন ও প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে, প্রস্তুতি নেয় রাজপথে নেমে আসার। তাছাড়া *আজাদ* মূলত শেখ মুজিবুর রহমানকে মূল উপজীব্য করে সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। যেমন – ১৯৬৮ সালের ২১ জুনের প্রতিবেদনে বলা হয়, “পূর্ব দিনের ন্যায় শেখ মুজিবুর রহমান সহাস্যবদনে কক্ষে প্রবেশ করেন”। এছাড়া মামলা পরিচালনা করার জন্য ব্রিটেনের প্রখ্যাত আইনজীবী টমাস উইলিয়ামস – এর আগমনের কথা জানানো হয় যা মামলাটির খ্যাতিকে প্রমাণ করেছে। *আজাদ* খুব দক্ষতার সাথে ভাষা ও বাক্য প্রয়োগ করে শেখ মুজিবুর রহমানের বিশেষ ভাবমূর্তি তুলে ধরার চেষ্টা করে। পত্রিকাটি প্রবীণ রাজনীতিবিদ আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ সম্পর্কে আবেগপ্রবণ ভাষায় প্রতিবেদন প্রকাশ করে মন্তব্য করে:

> শেখ মুজিবকে বহুদিন পর একবার দেখিবার জন্য গতকাল বৃহস্পতিবার একজন বৃদ্ধ রাজনীতিক ট্রাইবুনাল কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ রাজনীতিক আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ দর্শকদের গ্যালারীতে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন।... এই বৃদ্ধের চোখে অশ্রু ছিল। ... দূর হইতে মুজিবকে একনজর দেখিতেই শুধু তিনি শহরের দূর প্রান্তে আসিয়াছিলেন।[২৪২]

পত্রিকাগুলো এমন ভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে যাতে করে সাধারণ জনগণের কাছে এই মামলার অসারতা প্রমাণিত হয় এবং তারা উপলব্ধি করে কেবলমাত্র হয়রানি করতেই এই মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান এন. এ. রেজভীকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন ১৯৬৮ সালের ৬ আগস্ট *আজাদ* প্রকাশ করে। এতে বলা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

... প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবের সাথে তিনি কাঠগড়ার বাহির হইতে কোলাকুলি করেন সহাস্যবদনে। তাহারা পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। জনাব এন. এ. রেজভী কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান। ... ট্রাইবুনালের অধিবেশন শেষ হওয়ার পর জনাব রেজভী পুনরায় শেখ মুজিবের নিকট আসেন।

এছাড়া *আজাদ*–এর প্রতিবেদনে জেনারেল আইয়ুব খানের পাঠানো প্রধান কৌশলী সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদেরের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাৎ এবং সৌজন্য সমীহের বিষয়টি উঠে আসে। এমনকি ১৯৬৮ সালের ৩০ নভেম্বরের *আজাদ* পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, পুলিশের ঝগড়া বিবাদও শেখ মুজিবুর রহমান থামাতে এগিয়ে আসছেন যেটি তার বিশাল ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রীয় মামালার আসামি কিন্তু সরকারের কর্তাব্যক্তিরাও তাঁর সাথে দেখা করতে আসছেন – বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে এবং আগরতলা মামলার আসামিদের পক্ষে বাঙালি জনমতকে সংগঠিত করতে ভূমিকা রাখে।

পত্রিকাগুলোতে মামলার বিবরণীর পাশাপাশি অনেক মানবিক আবেদনও প্রকাশ পায়। বিশেষ করে *আজাদ* এ ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করে। যেমন – ১৯৬৮ সালের ২২ জানুয়ারির প্রতিবেদনে বলা হয়, "অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন হুদার বৃদ্ধ মাতা গতকাল পুত্রের বিচার দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সাথে পুত্রবধূ ছিলেন। পুত্রকে স্পর্শ করিয়া নির্বাক মাতা মন্থর গতিতে ট্রাইব্যুনাল কক্ষ ত্যাগ করেন।" এ সময় কৌশলে মুজিব পরিবারের বিভিন্ন কষ্টকে বর্ণনা করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৬৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর *আজাদ* মন্তব্য করে, "... গত রবিবার রাতে শেখ মুজিবের প্রথমা কণ্যা (শেখ হাসিনার) বিবাহ নিরানন্দময় পরিবেশে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত বিবাহে শেখ ছাহেবকে উপস্থিত থাকিবার অনুমতিদানের প্রার্থনা করিয়া প্যারলে মুক্তির আবেদন করা হইয়াছিল। শেখ ছাহেব উক্ত বিবাহে উপস্থিত ছিলেন না।"[২৪৩] পাকিস্তান শাসকচক্র অনুমতি দেয়নি এই কথাটি তৎকালীন সময়ে লেখা সম্ভব ছিল না, তাই কৌশলে উপস্থিত না থাকার কথা লেখা হয়। এ ধরনের মানবিক প্রতিবেদন স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি জনমতকে অভ্যুত্থানের পক্ষে আলোড়িত করে। তবে ১৯৬৮ সালের ২১ নভেম্বর সংবেদনশীলতার বিচারে সবচেয়ে বড় প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়:

ছোট্ট ছেলে ওয়ালী। ... দ্বিতীয় অভিযুক্ত ব্যক্তি কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ... গতকাল বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কক্ষে সর্বকনিষ্ঠ দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।... সপ্রতিভ বালক ওয়ালী কাঠগড়ায় রেলিংয়ের ব্যবধানে পিতার নিকট আসিয়া দাঁড়ায়। কাঠগড়ায় রেলিংয়ের উচ্চতা ওয়ালীকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার পত্রিকাগুলো বিভিন্নভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করে যে, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালি বিদ্বেষী ভূমিকার জন্যই আগরতলা মামলা দায়ের করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ১৯৬৮ সালের ১৯ অক্টোবর *আজাদ* তাদের প্রতিবেদনে বলে, "ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস. এ. রহমান গতকাল তিনটি বাংলা শব্দ উচ্চারণ করেন।" এর মাধ্যমে পত্রিকাটি বাঙালিদের জানানোর চেষ্টা করে যে, অবাঙালি শাসকবর্গ বাঙালি নেতৃবৃন্দের বিচার করছে। আগরতলা মামলা দায়ের করা হলেও এটি যে মিথ্যা এবং বাঙালি জনগণের মধ্যে অভিযুক্তদের প্রতি যে সহানুভূতি আছে সেটি পত্রিকাগুলো বিভিন্ন ভাবে তাদের প্রতিবেদনে প্রকাশ করে। ১৯৬৮ সালের ২৩ অক্টোবর আজাদ মন্তব্য করে, "... পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (ছয়দফাপন্থি) গত শনিবার কাউন্সিল অধিবেশনে পুনরায় তাঁহাকে সর্বসম্মতক্রমে সভাপতি নির্বাচিত করায় দর্শকগণ তাঁহাকে দেখিতে আরও উৎসাহী ছিলেন।" এই প্রতিবেদন দিয়ে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, পাকিস্তানি সামরিক চক্র শেখ মুজিবুর রহমানকে মামলা দিয়ে দুর্বল করার চেষ্টা করলেও বাঙালি জনগণ ছিল তাঁর পক্ষে, আওয়ামী লীগ সম্মেলনে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় সেই আস্থাই ব্যক্ত হয়েছে।

সরকার বিরোধী এই পত্রিকাগুলো ট্রাইব্যুনালের হুবহু রিপোর্ট ছাপতে থাকে এবং এই মামলাকে মিথ্যা মামলা বলতে আরম্ভ করে। তবে ট্রাস্ট মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো সরকারের নির্দেশ মোতাবেক এই মামলাকে মিথ্যা মামলা বলা থেকে বিরত থাকে। মামলা বিরোধী পত্রিকার সাংবাদিকরা এই মামলাকে মিথ্যা মামলা হিসেবে অভিহিত করলেও প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীর কতিপয় বাঙালি অফিসার ও বেসামরিক প্রশাসনের উর্ধ্বতন কয়েকজন অফিসারদের পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার এই প্রাথমিক সশস্ত্র আয়োজন সত্য ও বাস্তব ছিল। মামলার ২৬ নং অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন এম. শওকত আলী মন্তব্য করেন, "বিপ্লবী সংস্থার সাথে আমার আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ তখন থেকেই শুরু। সম্ভবত সেটা ছিল ১৯৬৬ সালের জুন মাস। আনুষ্ঠানিক এবং বিশদ আলোচনা ছাড়াই আমরা একমত হয়েছিলাম যে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে গঠিত 'বিপ্লবী সংস্থার' সদস্য।"[২৪৪] কিন্তু দেশ, জাতি ও জনগণের কল্যাণে এসব দেশ প্রেমিকদের উদ্ধারে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা এ মামলাটিকে মিথ্যা মামলা হিসেবে অভিহিত করেন।

৮.২ অন্যান্য খবর

মামলার বিবরণ প্রকাশ করার পাশাপাশি পত্রিকাগুলো গণ-অভ্যুত্থান সংক্রান্ত অন্যান্য খবরও গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতে থাকে।

৮.২.১ *আজাদ*

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক পর্যায়ে *আজাদ* সরকারি পক্ষ অবলম্বন করে। ১৯৬৮ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বরের হরতাল ছিল গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তবে *আজাদ* আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে অনেক আগে থেকেই সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করতে থাকে। ১৯৬৮ সালের ৯ জানুয়ারি *আজাদ* ভারতকে সব ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' নামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ঢাকার ৭ ডিসেম্বরের হরতালে গুলিবর্ষণ এবং নিহতের (সরকারি প্রেসনোট অনুযায়ী ২ জন নিহত ও ৪ জন আহত হয়)[২৪৫] প্রতিবাদে ভাসানী ৮ ডিসেম্বর প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করেন। ৮ ডিসেম্বর পিডিএম, ন্যাপ (মস্কো) এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগও হরতাল আহ্বান করে। এছাড়া ৩১ ডিসেম্বর সংযুক্ত বিরোধী দলের আহ্বানে হরতাল পালন ছিল আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ৮ তারিখের হরতাল নিয়ে *আজাদ* ৯ ডিসেম্বর সম্পাদকীয় প্রকাশ করে 'আন্দোলন ও গণঐক্য' শিরোনামে। এতে গুলিবর্ষণ ও নিহতের ঘটনার সমালোচনা করা হলেও স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি ছিল অনুপস্থিত। বরং পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র বিক্ষোভের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র জনতার সাড়া দেওয়ার বিষয়টিকে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান সৃষ্টির পথে একটি সুযোগ হিসেবে তুলে ধরে বলা হয়ঃ

> ... শাসক সম্প্রদায়ের সৃষ্ট সকল বিভেদের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া, সকল অপপ্রচার ব্যর্থ করিয়া দিয়া এই বিশ একুশ বৎসরের মধ্যে এই প্রথমবারের মত পাকিস্তানের উভয় অংশের গণমানুষ যে একই আন্দোলনের কাতারে সামিল হইতে পারিয়াছে ... এখানেই এবারের সংগ্রামের বিজয়।

স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে *আজাদ* বলেঃ

> ... গণঐক্যের দুর্ব্বার তরঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সকল বালির বাধ ধুইয়া মুছিয়া সাফ হইয়া যাইবে। কিন্তু এই তরঙ্গকে ক্ষ্যাপা বন্যা হইলে চলিবে না, তাহাকে সৃষ্টির পলিমাটি বহন করিয়া পাকিস্তানে একটি সুখী ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নূতন ভিত্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিচল থাকিতে হইবে।[২৪৬]

আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত উত্তপ্ত জনমতকে সরকার বিরোধী আন্দোলনে পরিণত করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের মধ্যে ঐক্য প্রচেষ্টা তৈরি হয়।[২৪৭] মওলানা ভাসানী স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে যে সব বক্তব্য প্রদান করেন সেগুলো ঢাকার পত্রিকাগুলো গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। যেমন- ১৯৬৮ সালের ৪ নভেম্বর *আজাদ* প্রথম পৃষ্ঠার ৪ নং কলামে তৎকালীন সরকারের সমালোচনা করে দেওয়া ভাসানীর বক্তৃতায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবির বিষয়টি তুলে ধরে। পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতাদের দমননীতির প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে কি ধরনের প্রতিবাদ হয়েছে *আজাদ* সেসব বেশ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

করে। বিশেষ করে ন্যাপ (মস্কো ও পিকিংপন্থী) এর বিভিন্ন কর্মসূচির সংবাদ পত্রিকাটিতে স্থান পায়। ১৯৬৮ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাস জুড়েই পত্রিকাটিতে এই ধরনের সংবাদ পাওয়া যায়। সরকারি নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকার সাংবাদিকরা ১৯৬৮ সালের ১১ ডিসেম্বর ধর্মঘট পালন করে। ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ১৩ ডিসেম্বর সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। *আজাদ* তাদের ১৪ ডিসেম্বরের সংখ্যায় পুলিশের গণ-গ্রেফতার এবং সফল ভাবে হরতাল পালনের সংবাদটি তুলে ধরে। সুতরাং উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের প্রাথমিক পর্যায়ে *আজাদ* মূলত গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে।

বিভিন্ন কারণে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো পৃথক পৃথক কর্মসূচির মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবে আন্দোলন করলেও ধীরে ধীরে দেশের সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও পেশাজীবী সংগঠন , বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপকতর আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এর প্রথম বাস্তব প্রতিফলন ঘটে 'ডাক' গঠনের মাধ্যমে। এই ঐক্যজোট আট দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।[২৪৮] তবে এ অঞ্চলের রাজনীতিবিদরা গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে যে সহিষ্ণুতা প্রয়োজন তা দেখাননি। ববং অধিকাংশ সময় গুরুত্ব দিয়েছেন ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠী স্বার্থকে - এর প্রমাণ হিসেবে দেখা যায় ন্যাপ (ভাসানী) ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি ডাক-এ যোগদান করা থেকে বিরত থাকে। *আজাদ* তাদের ৯ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলামে ডাক এর গঠন নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্দোলন পরিচালনার জন্য সংগ্রাম কমিটি গঠন' শিরোনামে। এরই ধারাবাহিকতায় *আজাদ* ১২ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে বিরোধী দলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিষয়টিকে সাধুবাদ জানিয়ে অবশিষ্ট বিরোধী দলের মাধ্যমে পূর্ণ ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। ঐক্যবদ্ধ না হলে যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফল হয় না *আজাদ* বিষয়টি এ অঞ্চলের রাজনীতিবিদদের সামনে তুলে ধরে।[২৪৯]

জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ জুড়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিক্ষোভরত ছাত্রদের ওপর পুলিশ হামলা চালাতে থাকে। ছাত্র নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং ১১ দফা দাবির সমর্থনে ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ২০ জানুয়ারি ধর্মঘট চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের মিছিল বের হয়। এই মিছিলে একজন পুলিশ অফিসারের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হন।[২৫০] এ সময় *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার ফটোগ্রাফার মোজাম্মেল হোসেনও আহত হন। এ ঘটনা ছবির মাধ্যমে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে *আজাদ*। এ সময় থেকেই *আজাদ* গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষে একটি জোরালো ভূমিকা রাখতে

Dhaka University Institutional Repository

সক্ষম হয়। পত্রিকাটিতে একটি আলাদা অংশ থাকত আন্দোলনের খবর আর ছবি দিয়ে। আসাদের মৃত্যুর খবর প্রকাশ করে *আজাদ* ২১ জানুয়ারি প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলামে মন্তব্য করে যে, পুলিশের গুলিতে নিহত আসাদুজ্জামান ছাত্রদের অধিকার আদায়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এক নতুন সোপানে উপনীত করেছে। ঐ দিন রাজধানী ঢাকার সাধারণ মানুষদের মনোভাব জানিয়েও পত্রিকাটি প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামে সংবাদ প্রকাশ করে।[২৫১] 'মর্মান্তিক ও বিয়োগান্ত' শিরোনামে একই দিন প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে পুলিশের শক্তি প্রয়োগের নীতির সমালোচনা করে বলা হয়:

> কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা এই দাবি জানাইতেছি- অবিলম্বে এই শক্তি প্রয়োগের নীতি পরিত্যাগ করিয়া ছাত্রদের প্রতি তাহারা প্রকৃত অবিভাবকসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিন। অন্য কথায় পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিতে পারে এবং দেশ ও দেশবাসীর অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হইতে পারে।[২৫২]

২২ জানুয়ারি *আজাদ*-এর এই আলাদা অংশটির প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলামব্যাপী শিরোনাম ছিল, "মৃত্যুর জানাজা মোরা কিছুতেই করিবনা পাঠ কবরের ঘুম ভাঙ্গে জীবনের দাবী আজ এতই বিরাট। রিপোর্টটি যদিও সাংবাদিক তার আবেগ দিয়ে উপস্থাপন করেছিলেন কিন্তু এর মাধ্যমে একদিকে যেমন এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে পত্রিকাটির অবস্থান ফুটে ওঠে তেমনি একই সাথে তা তৎকালীন পরিস্থিতি বুঝতে সহায়ক হয়েছিল। রিপোর্টটিতে বলা হয়েছিল:

> ... সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হলের সামনে একদল ছাত্রের গুঞ্জরন থেকে উপরের ঐ শব্দগুলি আমার কানে নয় বুকে এসে বাজল। ছেলেটি আবৃতি করছিল না, যেন চোখ মুখ কণ্ঠ এক করে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উচ্চারণ করছিল। ...কাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি শোকাহত মর্মে ভাব দেখিনি, দেখেছি সাথীর মৃত্যুতে সমগ্র ছাত্র সমাজের গত এক দশকের সঞ্চিত বিক্ষোভ যেন ফেটে পড়িয়াছে। জালেমের জিঞ্জির ভাংগার শপথে তারা অটল।

ঐ দিন প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত পাঁচটি ছবির ক্যাপশনের ভাষাতেও জনগণের পক্ষে পত্রিকার সুরটি অত্যন্ত স্পষ্ট -

> ক. সমুদ্র উত্তাল জনতা তরঙ্গ কে রোখে – মিছিলের ছবি
>
> খ. সেই মৃত্যুহীন প্রাণ – আসাদের ছবি
>
> গ. আসাদ মরেছে কিন্তু আমরা মরিনি। সংগ্রাম আমাদের চলবেই – একজন ছাত্র
>
> ঘ. ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে।

তবে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সাধারণ জনগণ যে তাদের অধিকারের জন্য সচেতন হয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে এ বার্তাটি *আজাদ* তাদের দুটি খবরের মাধ্যমে প্রকাশ করে। ২২ জানুয়ারি সংখ্যায় পল্টনে অনুষ্ঠিত আসাদের জানাজায় দলমত নির্বিশেষে চাকুরিজীবী, ছাত্র, ব্যাবসায়ী, দিনমজুর, এমনকি অনেক দূর থেকে আসা গ্রামের

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ মানুষ অংশ নিয়েছিল, সে খবর *আজাদ* প্রকাশ করে 'ঐতিহাসিক ও লক্ষাধিক লোকের মিছিল শিরোনামে'।[২৫৩] পাশাপাশি ঐ দিন একজন মুদি দোকানদারের ছবি দিয়ে এর ক্যাপশনে তার বক্তব্য তুলে ধরা হয়, "একদিনের হরতালে অইব না। হাজারদিন হরতাল করমু। আহেন দোকানপাট বন্ধ কইরা পথে নামি।"[২৫৪] এই মুদি দোকানদার বা সাধারণ বাঙালিরা ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের অসংখ্য অধিকার বঞ্চিত, নির্যাতিত ও বিক্ষুব্ধ কিন্তু সচেতন মানুষের প্রতিভূ। *আজাদ* তাদের বক্তব্যকে সামনে তুলে ধরে বাঙালির রাজনৈতিক সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি সুচারুভাবে পালন করেছে। একইদিন পত্রিকাটি 'ছাত্র সমস্যা ও সরকারি নীতি' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দমননীতির পরিবর্তে ছাত্রদের বহুদিনের শিক্ষামূলক দাবিগুলো মেনে নেয়ার আহ্বান জানায়। ঐ সম্পাদকীয় কলামে সরকারি নীতির সমালোচনা করে *আজাদ* মন্তব্য করে, "পুলিশের গুলিতে ছাত্রের মৃত্যু আমাদের নিকট অসহনীয় ও মর্ম্মান্তিক ঘটনা ... দেশের একটি অমূল্য ও সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন বিনাশের জন্য সরকারকে প্রদেশের সকল নাগরিকের কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে।"[২৫৫]

২৩ জানুয়ারি *আজাদ*-এর এই আলাদা অংশটিতে ব্যানার শিরোনাম করা হল – "আঘাত হেনেছ নিত্য, অত্যাচার যত লক্ষ চিত্ত দীপ্ত ক্রোধে এবার বারুদ, আসাদ সমগ্র মন এখানে জাগ্রত ... সারা দেশ আজ যেন রক্তের বুদ্বুদ" এভাবে আন্দোলন ধীরে ধীরে তীব্রতর হতে থাকে এবং পত্রিকাগুলো এর সাথে আরও জোরালো ভাবে সম্পৃক্ত হয়। ঐ দিন শহরের সাধারণ মানুষের আন্দোলনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে *আজাদ* রিপোর্ট করে:

> দেখে মনে হল, সরকারি নির্যাতন আর বেত – বুলেট – বেয়নেট সমগ্র জনতাকে আজ প্রতিবাদ মুখর ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। মুক্তি পিয়াসী মানুষ আজ আন্দোলনে নামিতে কিছু দ্বিধা করিতেছে না। প্রিয় নওয়াবগঞ্জ এলাকায় পানওয়ালা বলিয়াছেন, শুধু ছাত্র ছাত্রী আন্দোলন অইত না, ইবার হক্কলের এক হওন লাইগব।

২৩ জানুয়ারি ঢাকায় একটি বিশাল মশাল মিছিল বের হয়। ছাত্রদের পাশাপাশি 'ডাক' এর পক্ষ থেকে আওয়ামীলীগ ও ন্যাপ (মস্কো) মিছিল বের করে, ছাত্রদের মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন থেকে শুরু হয়ে আড়াই ঘণ্টাব্যাপী ঢাকার বিভিন্ন রাজপথ যখন ভ্রমণ করে তখন আন্দোলনের গভীরতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।[২৫৬] ২৪ জানুয়ারি *আজাদ* আগের দিনের মিছিলের বিষয়ে রিপোর্ট করে যেটির শিরোনাম ছিল, "ঢাকার বুকে স্মরণকালের বৃহত্তর মশাল মিছিলঃ ত্রিশ সহস্রাধিক ছাত্র ছাত্রীর অংশগ্রহণ।"[২৫৭]

পরদিন ২৫ জানুয়ারি মশাল মিছিল নিয়ে *আজাদ* 'সেদিনের বৃহত্তর মিছিলে যা দেখেছি। যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে' শিরোনামে এক নিবন্ধ প্রকাশ করে। এতে ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে বলা হয়:

> যে আলোর পথযাত্রী মুক্তির সংগ্রামী পথে শুরু করিয়াছে তাহার যাত্রা, গত বৃহস্পতিবারের মিছিলে তাহার হাতে মশাল ছিল। ... বাহান্নর একুশের অনেক চড়াই উৎরাই ডিঙিয়ে আবার এসেছিল উনসত্তরের জানুয়ারীতে আরেক আলোক

Dhaka University Institutional Repository

দীপ্ত বৃহস্পতিবার। ... এমন মিছিলে শরিক হইয়াছে কারখানার শ্রমিক, পথের রিক্সাওয়ালা, গঞ্জের মহাজন, স্টেশনের কুলি, ঘরের গৃহিণী, অফিসের কেরানী, নৌকার মাঝি – এককথায় সব স্তরের মানুষ। ... সর্বত এখন এক আওয়াজ আসাদ ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।

সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে 'মুক্তির সংগ্রামী পথ' হিসেবে উল্লেখ করে *আজাদ* প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার দাবিকেই সামনে তুলে এনেছিল। মুক্তি সংগ্রামে গণ মানুষের এই অংশগ্রহণের খবর যে পাকিস্তানি অগণতান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রকাঠামো থেকে বেরিয়ে একটি বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্র তৈরির চেতনা বাঙালির মানসপটে জাগ্রত করেছিল সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আসাদের মৃত্যুর পর থেকেই *আজাদ* ছাত্রদের এগারো দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন দাবিতে ছাত্র জনতার আন্দোলনের পক্ষে বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। প্রদেশে সান্ধ্য আইনের প্রতিবাদ করে পত্রিকাটি ২৯ জানুয়ারি 'গরীব-দুঃখীদের জীবনে সান্ধ্য আইন' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

২ ফেব্রুয়ারি পত্রিকাটি সামগ্রিক গণ-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে 'দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি' শিরোনামে একটি দিগ্‌নির্দেশনামূলক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে সরকারি দলের সমালোচনা করার সাথে সাথে বিরোধী দলের কাছে আরও গঠনমূলক আন্দোলনের আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। পাশাপাশি বিবেচনাপ্রসূতভাবে পত্রিকাটি মন্তব্য করে:

দেশের বর্ত্তমান অরাজক ও অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য কাহারা দায়ী তার চুলচেরা বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হইব না। তাহা বিচারের সময়ও এখন নহে। যিনি বা যাহারাই আজিকার অরাজক অবস্থার জন্য দায়ী হইয়া থাকুক না কেন ইতিহাসের কাঠগড়ায় একদিন তাদের দাঁড়াইতে হইবে এবং তার চিরকালের রায়ও মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এসময় গণ আন্দোলনের সমর্থনে জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলীয় অনেক সদস্য পদত্যাগ করেন যেটি *আজাদ* তুলে ধরে। আন্দোলনের পক্ষে ১৪ ফেব্রুয়ারি পল্টনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ছাত্রদের এগারো দফার প্রতি সমর্থন ও শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করা হয়। আজাদ ১৫ ফেব্রুয়ারি এ খবর প্রকাশ করে 'পার্লামেন্টারী সরকার কায়েম ও সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের দাবীর ধ্বনিতে মহানগরী প্রকম্পিত' শিরোনামে। ফলে এ খবর যখন ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জনপদের মানুষ পড়ে তখন সেটি তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে ও জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে একটি বড় ভূমিকা পালন করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা পুলিশের বেয়নেট চার্জের ফলে নিহত হলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ সময় ঢাকায় সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে জনতা মিছিল বের করে যেটি *আজাদ* তাদের ১৯ ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় ১ম পৃষ্ঠায় ৫ম কলামে প্রকাশ করে। এতে বলা হয় যে,

Dhaka University Institutional Repository

সান্ধ্য আইন, সেনাবাহিনী ও ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে রাত ১০ টায় রাজধানীর নতুন শহরের বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার নাগরিকের খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।[২৫৮] এ ধরনের খবর যখন জনগণ জানতে পারে তখন তারা আন্দোলনে অংশ নিতে আরও বেশি উৎসাহিত হয়। এরপর কয়েকদিন *আজাদ* দেশব্যাপী বিভিন্ন আন্দোলনের খবর প্রকাশ করে। ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস উপলক্ষে সংবাদপত্র অফিস ছুটি থাকার পরও ছাত্রদের অনুরোধে আন্দোলনের খবর ছাপানোর জন্য *আজাদ* ২২ ফেব্রুয়ারি বিশেষ ব্যবস্থাধীনে ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকা বের করে । এতে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের বিভিন্ন খবর প্রকাশ করা হয়।

আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকার এক ঘোষণায় ফেব্রুয়ারি মাসের ২২ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি দেয় এবং আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। সরকার ঘোষণা করে যে, 'ফৌজদারি আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইবুনাল) অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৮' নামক অধ্যাদেশটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে আগরতলা মামলাটি নিজ থেকেই বাতিল হয়ে যায়। এ সংবাদ পরদিন ঢাকার প্রধান প্রধান দৈনিক অত্যন্ত আবেগমণ্ডিত ভাষায় প্রকাশ করে। *আজাদ* প্রথম পাতাতে দুটো আট কলামব্যাপী শিরোনাম করে- 'মুক্ত মানব শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত' এবং 'এসো সমিতির সাম্যে ও ঐক্যে এসো জনতার মুখরিত সখ্যে'। এছাড়া 'ফিরে নাই কেবল একজন' শিরোনামে সার্জেন্ট জহুরুল হকের কথাও স্মরণ করে *আজাদ*।
এভাবে *আজাদ* প্রাথমিক পর্যায়ে আগরতলা ষড়যন্ত্রকে 'পাকিস্তান বিছিন্ন করার ভারতীয় প্রয়াস' হিসেবে উল্লেখ করলেও আগের মতই পত্রিকাটি তার অবস্থান পরিবর্তন করে আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে ভূমিকা রাখে।

৮.২.২ *সংবাদ*

এ সময় কিছুটা বিপরীত চিত্র পাওয়া যায় *সংবাদ* পত্রিকায়। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম থেকেই পত্রিকাটি পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে যা ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে ভাসানী পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ছয় দফা ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা এবং পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার দাবি তুলে ধরে বলেন, "আপনারা যদি পূর্ব পাকিস্তানের এই হায়াত মউতের সমস্যা সমাধানে অগ্রসর না হন তাহা হইলে পূর্ব পাকিস্তানকে 'তালাক' দিন, পূর্ব বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

সাড়ে ৬ কোটি মানুষকে বিচ্ছিন্ন হইতে দিন, নিজেদের পায়ে দাঁড়াইয়া নিজেদের সমস্যার সমাধান করিতে দিন।"[২৫৯]

এ বিষয়টি *সংবাদ* তাদের ৪ নভেম্বরের সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠার তিন নং কলামে তুলে ধরে। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো মূলত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে কর্মসূচি পালন করে এবং ঢাকার পত্রিকাগুলোতেও এর প্রভাব দেখা যায়। যেমন- ন্যাপ(মুজাফ্‌ফর) আহূত ভোটাধিকার ভিত্তিক পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র কায়েম, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, এক ইউনিট বাতিল ইত্যাদি দাবি *সংবাদ*-এর সম্পাদকীয় কলামে স্থান করে নেয়। এসব দাবি এবং আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনকে গতিশীল করা এবং গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হিসেবে বাক্ স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনা ও প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অধ্যাদেশ বাতিল, দমননীতি প্রতিরোধ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় এ সময় *সংবাদ*-এর সম্পাদকীয় কলামে স্থান পায়। পত্রিকাটির নীতি ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি প্রদান এবং এর সাথে কৃষক শ্রমিকসহ সকল মেহনতি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ন্যাপের 'দাবী সপ্তাহ' পালন কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়ে *সংবাদ* ১৯৬৮ সালের ১৩ নভেম্বর সম্পাদকীয় প্রকাশ করে যেখানে এ আন্দোলনকে আরও সফল করে তোলার জন্য সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে বলা হয়:

> ... এই সপ্তাহ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়া ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরাই উৎসাহ বোধ করিবেন, তাহা নহে। ইহার গণমুখী কর্মসূচী মেহনতী জনতার সংগঠনসমূহের কর্মীবৃন্দকেও অনুপ্রেরণা দিবে। ... এই কারণেই মেহনতী সমাজের সঙ্গে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সচেতন সংযোগ যেমন বৃদ্ধি পাওয়া দরকার, তেমনি মেহনতীসমাজের পক্ষ হইতেও ন্যাপের সামগ্রিক কর্মসূচীকে কার্যকরী করার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

তাছাড়া আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে গতিশীল করতে সাংবাদিকদের ভূমিকার বিষয়টি *সংবাদ* বেশ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিকরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান, রাজনৈতিক নির্যাতন বন্ধ ও *ইত্তেফাক*-এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। তৎকালীন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শহীদুল্লাহ কায়সার, সাধারণ সম্পাদক আতাউস সামাদ এবং প্রেস ক্লাব সভাপতি এ. বি. এম. মুসা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ফলে ১৯৬৩ সালের পর ১৯৬৮ সালের ১ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রসেবীদের মিছিলের বিষয়টি *সংবাদ* তুলে ধরে তাদের ২ ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠার ৪ নং

Dhaka University Institutional Repository

কলামে যেখানে পত্রিকাটির শিরোনাম ছিল, 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রতিবাদে ঢাকার সাংবাদিক সমাজ ও সংবাদপত্র সেবীদের সভা ও বিক্ষোভ মিছিল।'

সংবাদ জনগণকে এই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করে যে, আইয়ুব খানের মত একটি অগণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধেও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করা যায়। যেমন- ১৯৬৮ সালের ৬ ডিসেম্বর আইয়ুব খানের ঢাকায় আগমনের প্রতিবাদে পিডিএম নেতা কর্মীরা মিছিল করে এবং ইসলামপুরে একটি দোকানে ঝুলিয়ে রাখা আইয়ুব খানের একটি ছবি নামানোর চেষ্টা করে। খবরটি *সংবাদ* তাদের ৬ ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামে প্রকাশ করে।

৭ ডিসেম্বর হরতাল পালন কালে পুলিশের গুলিতে দুই জন নিহত হওয়ার বিষয়টি পত্রিকাটিতে খবর হিসেবে তেমন বড় পরিসরে আসেনি, এর পরিবর্তে পত্রিকাটি সম্পাদকীয় কলামে বিষয়টি বেশ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। *সংবাদ* বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে বিষয়টি জাতীয় পরিষদে আলোচনার দাবি জানায়। যুক্তি হিসেবে *সংবাদ* উল্লেখ করে যে, গভর্নর যেহেতু প্রেসিডেন্টের এজেন্ট এবং প্রাদেশিক সরকার প্রাদেশিক আইন পরিষদের কাছে দায়ী নয় তাই এ গুলিবর্ষণের ঘটনার দায় কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকার করতে পারে না। *সংবাদ* আরও দাবি করে যে জাতীয় পরিষদে বিষয়টি আলোচনা করা না গেলে যেন অবিলম্বে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়।[২৬০] তবে ১৩ ডিসেম্বর 'সংযুক্ত বিরোধী দলের ডাকে আজ হরতাল' শিরোনামে সফলভাবে হরতাল পালন এবং চট্টগ্রামে পুলিশের গুলিতে আহত হওয়ার বিষয়টি *সংবাদ* ১৪ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলামে বেশ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন জনগণের মধ্যে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনকে সফল করা সম্ভব এই ইতিবাচক বার্তা যায় তেমনি ৭ ডিসেম্বরের হরতালের পর ১৪ ডিসেম্বরের হরতালেও পুলিশের গুলি করার খবর জনগণের ক্ষোভকে আরও বৃদ্ধি করে। *সংবাদ* পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ কর্মসুচি পালনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে নির্দেশনামূলক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৬৮ সালের ৭ ডিসেম্বর 'ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী পদক্ষেপের উদ্যোগ' শিরোনামে প্রকাশিত এমনই একটি সম্পাদকীয়তে ১৩ ডিসেম্বর প্রদেশব্যাপী দমননীতি প্রতিরোধ দিবস পালনের প্রসংশা করে বলা হয়:

> ... ইহাকে আমরা ঐক্যের সময়োচিত উদ্যোগ নামে অভিহিত করিতে চাই। ...এখন যদি সুস্পষ্ট সর্বজনবোধ্য এবং মূল সমস্যাবলী সমাধানের লক্ষ্যে নিয়োজিত কর্মসূচীকে সামনে আনা যায় তাহলে গণ আন্দোলনের প্রবাহকে কেহ বিভক্ত করিতে পারিবে না এবং জনসাধারণের প্রতি যে দায়িত্ব রহিয়াছে উহার কথা বিবেচনা করিয়া সমস্ত গণতান্ত্রিক দল, ব্যক্তি ও গ্রুপ পরস্পরের নিকটতর হইবে। পৃথক পৃথক চলার যে প্রবণতা আছে তাহা কাটিয়া যাইবে।

Dhaka University Institutional Repository

এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ ডিসেম্বরের সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটি ১৩ ডিসেম্বরের হরতালকে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত মেহেনতি মানুষ, বুদ্ধিজীবী এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের একত্রিত হওয়ার এক নতুন পর্যায়ের সূচনা হিসেবে উল্লেখ করে বলে, " ... তেরই ডিসেম্বরের হরতাল বর্তমান সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছয় কোটি মানুষের দ্ব্যর্থহীন রায়" এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে *সংবাদ* এই সম্পাদকীয়তে আন্দোলনের নেতৃত্ব পরোক্ষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে প্রদান করে বাঙালি জনগণের পক্ষেই অবস্থান নেয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৮ সালের ১৩ ডিসেম্বরের হরতাল ছিল বাঙালি জনগণের সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাসের প্রমাণ আর এ ক্ষেত্রে *সংবাদ* নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৬৮ সালের ২৭ ডিসেম্বরের আরেকটি সম্পাদকীয়তে *সংবাদ* আবারও ১৩ ডিসেম্বরের প্রদেশব্যাপী হরতাল পালনের উদাহরণ টেনে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্য এবং এটিকে সংরক্ষণের মাধ্যমে আরও সম্প্রসারিত করার কথা বলে। এ ক্ষেত্রে সকল বিরোধী দলের একটি সম্মিলিত কর্মসূচি এবং এই ঐক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে দেশে গণতান্ত্রিক ধারা ফিরিয়ে আনার কথা বলা হয়। সুতরাং স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টি তখনও সংবাদ তাদের নীতি হিসেবে গ্রহণ করেনি। *সংবাদ* ১৯৬৯ সালের ৯ জানুয়ারির সংখ্যায় 'ডাক' গঠনের খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে 'বহু আকাঙ্ক্ষিত গণ ঐক্যের শুভ সূচনা' শিরোনামে। পরদিন ১০ জানুয়ারি *সংবাদ* এ বিষয়ে 'গণতান্ত্রিক ঐক্যের শুভ সুচনায়' শিরোনামে সম্পাদকীয় কলামে দেশবাসীর বহু আকাঙ্ক্ষিত ঐক্যজোটকে অভিনন্দন জানায় এবং আট দফা দাবির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। নাম উল্লেখ না করে দুইটি বিরোধী দলের 'ডাক'-এ যোগদান না করার সমালোচনা করা হয়।[২৬১] এই সম্পাদকীয়তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম প্রয়োজন বলে ১০ জানুয়ারির সম্পাদকীয়তে যে মতামত প্রকাশ করা হয় সেটির ভিত্তিতে বলা যায় যে, পরবরতী দুই বছরের মধ্যে পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনে যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল সেটি সম্পর্কে *সংবাদ* কোন দূরদর্শী ভূমিকা রাখতে পারেনি।

সংবাদ ১৯ জানুয়ারি থেকেই ছাত্রদের ওপর পুলিশের নির্যাতনের খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতে থাকে। এ সময় খবর প্রকশের ধরন থেকেই ছাত্রদের প্রতি সমর্থনের বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। যেমন- ১৯ জানুয়ারি ছাত্র জনতার ওপর পুলিশের নির্যাতনের প্রতিবাদে বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যদের একযোগে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ কক্ষ বর্জনের খবরের সাথে সাথে পরিষদের নেতা দেওয়ান বাসেতের 'আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই পুলিশি ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে' এ বক্তব্যকে পত্রিকাটি সাফাই হিসেবে উল্লেখ করে। এছাড়া ছাত্ররা মিছিলে যে স্লোগান দিয়েছে যেমন – 'সংগ্রাম চলবে চলবে', 'পূর্ব বাংলার স্বাধিকার দিতে হবে' এসব বক্তব্য পত্রিকাটি তুলে ধরে।[২৬২] ২০ জানুয়ারি আসাদ নিহত হবার খবর ২১ জানুয়ারি *সংবাদ* 'মেডিক্যাল হাসপাতাল সহ বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

স্থানে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও বেপরোয়া লাঠিচার্জ' শিরোনামে প্রকাশ করে যেখানে পুলিশের কর্মকাণ্ডকে নেতিবাচক হিসেবে তুলে ধরা হয়। ২২ জানুয়ারি *সংবাদ* ব্যানার শিরোনাম করে হরতাল, জানাজা ও মিছিলের খবর দিয়ে। তাছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তির বিবৃতি প্রকাশ করতে গিয়ে সরকারের সমালোচনামূলক –'সরকার ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছে, দেশ শাসনের অধিকার হারাইয়া ফেলিয়াছে' ইত্যাদি শিরোনাম করা হয়। ঐ দিনই আরেকটি শিরোনামে ছাত্র হত্যার বিচার দাবি করা হয়। পাশাপাশি সংগ্রামের 'নিশানা শীর্ষক' সম্পাদকীয় কলামে জনগণের আন্দোলনের প্রতি পতিকাটি সমর্থন ব্যক্ত করে। পরদিন ২৩ জানুয়ারি পত্রিকাটি লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে আসাদের গায়েবানা জানাজা ও এরপর মিছিলকে স্মরণকালের বৃহত্তম শোক মিছিল হিসেবে অভিহিত করে। খবর প্রকাশের মধ্যেই পত্রিকাটির বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে অবস্থানটি স্পষ্ট।*সংবাদ*-এর এই অবস্থান যে কতটা শক্তিশালী সেটি বোঝা যায় এর সম্পাদকীয় কলাম থেকে। ২১ জানুয়ারি পত্রিকাটির সম্পাদকীয় কলাম লেখা হয় 'এই গুলীগালাজ ও হত্যানীতি বন্ধ কর' শিরোনামে। এতে সরকারের নির্যাতনমূলক ও অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষের সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক তথা বুদ্ধিজীবী শ্রেণি কিভাবে একত্রিত হয়েছেন সে বিষয়টিকে সামনে নিয়ে এসে বলা হয়:

> ... গতকাল পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামানের মর্মান্তিক মৃত্যু ... সরকারের দেউলিয়া শিক্ষানীতির আরেক দফা প্রমাণ ... সামগ্রিক ভাবে যে অগণতান্ত্রিক নির্যাতনমূলক ব্যবস্থাকে সরকার আজও আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিয়া শান্তিরক্ষার দোহাই দিয়া এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনার পর ঘটনা ঘটাইয়া চলিয়াছেন তাহা কোন সভ্য দেশে চলিতে পারে না। বন্ধ করো এই গুলীগালাজ ও হত্যানীতি অবিলম্বে।

পরদিন ২২ জানুয়ারি *সংবাদ* সম্পাদকীয় প্রকাশ করে 'সংগ্রামের নিশানা' শিরোনামে। এতে গণআন্দোলনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করার পাশাপাশি *সংবাদ* আন্দোলনের পর্যায়, গতিপ্রকৃতি এবং আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকারের অপচেষ্টা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করে বলে, "প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি প্রতিশ্রুতিশীল আংশিক সংগ্রামকে মূল রাজনৈতিক সংগ্রামী আন্দোলনের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য নানা ধরনের প্রচেষ্টা চালাইবে।"

পত্রিকাটি আসাদের নিহত হবার পর থেকে আন্দোলনের খবর আরও বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতে থাকে। বিশেষ করে সাংবাদিক ও মহিলারা ঢাকায় বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন যেটি সংবাদ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। ৮ ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় *সংবাদ* সর্বদলীয় মহিলা সমিতির মিছিলকে 'ঢাকায় স্মরণকালের বৃহত্তম

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা বিক্ষোভ মিছিল' হিসেবে উল্লেখ করে। পল্টন ময়দানে এ সময় আন্দোলনের পক্ষে প্রায়ই জনসভা হয় যেটি *সংবাদ* নিয়মিত প্রকাশ করতে থাকে। *সংবাদ*-এর এই ভূমিকা ছিল 'ডাক'-এর পক্ষে। ১৪ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালন করা হলে এর পক্ষে *সংবাদ* গুরুত্ব দিয়ে খবর প্রকাশ করে। এ সময় পত্রিকাটির শিরোনাম ছিল, "হৃত অধিকার ফিরাইয়া দাও।। শেখ মুজিব ও মনি সিং এর মুক্তি চাই।। আইয়ুবী শাসনতন্ত্র বাতিল কর।।ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতা এক হও।।দেশব্যাপী অবিস্মরণীয় হরতাল নগরে বন্দরে উত্তাল জনতরঙ্গ : পল্টনে লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষের অভূতপূর্ব সমাবেশ।"[২৬৩]

১৬ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহরুল হক নিহত হলে ১৭ ফেব্রুয়ারি *সংবাদ* এর প্রতিবাদ জানিয়ে 'জহুরুল হকের মৃত্যুতে প্রচণ্ড গণ-বিস্ফোরণ' শিরোনামে খবর প্রকাশ করে। ঐ দিন ঘটনার তদন্ত দাবি করে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে সরকারি প্রেস নোটের সমালোচনা করে বলা হয়, "শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হকের গুলীবিদ্ধ হওয়ার যে কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে উহাকে দেশবাসী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না।"
পাশাপাশি ১৯ ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় পত্রিকাটি ড. সামসুজ্জোহার মৃত্যুর খবর এবং ঢাকায় কারফিউ লঙ্ঘন করে ছাত্র জনতার মিছিল করার খবর প্রকাশ করে।

এভাবে *সংবাদ* আইয়ুব বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পক্ষে জোরালো অবস্থান রাখে।

৮.২.৩ *ইত্তেফাক*

ছাত্রদের এগারো দফা দাবির ২ নং দফায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং *ইত্তেফাক*-এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি সন্নিবেশিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবিতে যখন ব্যাপক গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছে তখন ১৯৬৯ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে আসেন। পরদিন ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি 'দেশ রক্ষা আইন ও অর্ডিন্যান্স' প্রয়োগ বন্ধ রাখার সিধান্ত ঘোষণা করেন। ফলে ১৯৬৬ সাল থেকে বন্ধ থাকা *ইত্তেফাক* পুনরায় ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এর আগে ৫ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে প্রদেশে পূর্ণ সাংবাদিক ধর্মঘট পালন করা হয়।[২৬৪] বস্তুত *ইত্তেফাক*-এর মুক্তি ছিল বাঙালির গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই বিজয়। ফলে *সংবাদ* ১০ ফেব্রুয়ারি 'ইত্তেফাক এর মুক্তি দেশের গণতান্ত্রিক শক্তির বিজয়' হিসেবে উল্লেখ করে।[২৬৫]

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই *ইত্তেফাক* স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৪ ফেব্রুয়ারি পালিত হরতালের পক্ষে ১৫ ফেব্রুয়ারি *ইত্তেফাক* সংবাদ প্রকাশ করে 'প্রচণ্ড গণবিস্ফোরণে সমগ্র দেশ প্রকম্পিত, যুগান্তকারী হরতালের মাধ্যমে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে ১২ কোটি মানুষের রায় ঘোষণা'। এর পাশাপাশি পত্রিকাটি সার্জেন্ট জহুরুল হকের নিহত হবার খবর প্রকাশ করে কিছুটা ভিন্ন ভাবে। *ইত্তেফাক* বিভিন্ন স্লোগান তুলে ধরে বলে:

> আগরতলা মামলা প্রত্যাহার কর। জহুরুল হকের রক্ত বৃথা যেতে দেব না, নির্বিচারে গুলী করা চলবে না, বাঙ্গালীকে কথায় কথায় গুলী করা চলবে না, শেখ মুজিব কে ফিরিয়ে দাও, জেলের তালা ভাঙতে হবে, শেখ মুজিবকে আনতে হবে – প্রভৃতি গগন বিদারী স্লোগানে রাজধানী প্রকম্পিত হইয়া ওঠে।[২৬৬]

আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করার পর ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি *ইত্তেফাক* শিরোনাম করে 'ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার মুজিব সহ সকলের মুক্তি লাভ : কারাগার রাজবন্দী শূন্য।' এছাড়া পত্রিকাটি একইদিন বিশেষ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে যেখানে পূর্ব বাংলা তথা বাঙালি জনগণের বিজয়ের কথাই ধ্বনিত হয়েছিল:

> পূর্ব বাংলার মাটিতে অবশেষে বাস্তিলের কারাগার ধসিয়া পরিয়াছে, জনতার জয় হইয়াছে। ... জয় নিপীড়িত মানুষের জয়, জয় নব উত্থান – আজ উৎসবের দিন নয়, বিজয়ের দিন। ... এ কাহিনী অসংখ্য শহীদের আত্মদানের, অসংখ্য বীরমাতা ও বীরজায়ার অশ্রু ও হাহাকার সংবরণের কাহিনী।

৮.২.৪ *পাকিস্তান অবজারভার*

আন্দোলনের শুরু থেকেই *পাকিস্তান অবজারভার* কিছুটা নমনীয় ও অনেকাংশে দ্বিমুখী নীতি অনুসরন করে। পত্রিকাটি ১৯৬৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের হরতালের খবর পরদিন প্রথম পৃষ্ঠার ৫ নং কলামে প্রকাশ করে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি পূরণ না হলে তারা যে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামো থেকে বেরিয়ে যাবে ভাসানীর এ বক্তব্য তুলে ধরা হয়।[২৬৭] এরপরের কয়েকদিন মূলত হরতাল, প্রতিবাদ ও নিহতদের স্মরণে গায়েবানা জানাজার খবর দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে *পাকিস্তান অবজারভার* ৭ ডিসেম্বরের হরতালকে পশ্চিম পাকিস্তানে সংঘটিত আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের ধারাবাহিকতা হিসেবে উল্লেখ করে বলে, এ ধরনের আন্দোলন পরিচালিত করার জন্য যে মাপের নেতৃত্ব দরকার সেটি পূর্ব পাকিস্তানে নেই। ১৩ ডিসেম্বর সংযুক্ত বিরোধী দলের হরতাল সফল ভাবে পালন করার খবর প্রকাশ করলেও সম্পাদকীয় কলামে এ নিয়ে পত্রিকাটির নিজস্ব কোন মতামত ছিল না। এ থেকে পত্রিকাটির কিছুটা দ্বিমুখী ও সরকারের প্রতি নমনীয় নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। 'ডাক' গঠনের খবর পত্রিকাটি ৯ জানুয়ারি সংখ্যায় সাধারণ ভাবে প্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান অবজারভার ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিরোধী ছিল। আসাদের মৃত্যুর একদিন আগে ১৯৬৯ সালের ১৯ জানুয়ারি 'Unwise'শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটির এ নীতি বেরিয়ে আসে। এ সময় পত্রিকাটি মন্তব্য করে, "We have always been opposed to student activism in politics and this newspaper policy is consistent in this regard."

আসাদের মৃত্যুর পরদিন ২১ জানুয়ারি *পাকিস্তান অবজারভার* আগের দিনের ঘটনার একটি দীর্ঘ বর্ণনা প্রকাশ করে। তবে আগের মতই পত্রিকাটির এক ধরনের মধ্যপন্থি নীতি পালন করার বিষয়টি লক্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রেই পত্রিকাটি পুলিশের গুলিবর্ষণের বিষয়টিকে ছাত্রদের হামলা থেকে জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করে। তাছাড়া যে ধরনের শিরোনাম ব্যবহার করে পত্রিকাটি সংবাদ প্রকাশ করে তাতে প্রকৃত পক্ষে ছাত্রদের আন্দোলনকে অত্যন্ত নেতিবাচক ভাবেই উপস্থাপন করা হয়। ২১ জানুয়ারি পত্রিকাটি খবর প্রকাশ করে 'Militant students parade city streets'শিরোনামে। আসাদের মৃত্যুর খবর যে রিপোর্টে প্রকাশ করা হয় সেটির শিরোনাম ছিল 'Hand to hand fight with police'[২৬৮] পাশাপাশি আসাদের মৃত্যুর সংবাদে কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সহ সাধারণ জনগণ শোক প্রকাশ করেছে সে সংবাদও প্রকাশ করা হয়। এভাবে *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার দ্বিমুখী চরিত্রের প্রকাশ পাওয়া যায়। পরদিন ২৩ জানুয়ারি পত্রিকাটি সংবাদ প্রকাশ করে গায়েবানা জানাজা এবং কালো পতাকা হাতে বিশাল মিছিলের খবর দিয়ে যেখানে মিছিলটিকে 'Biggest ever in the city' বলে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু একই সাথে আরেকটি শিরোনাম করা হয় 'Eden College girls fight EPR' শিরোনামে। অন্যান্য পত্রিকা যেখানে ইপিআর কিভাবে ছাত্রদের ওপর লাঠিপেটা করেছে সে সংবাদ প্রকাশ করেছে সেখানে *পাকিস্তান অবজারভার* মূলত দেখাতে চেয়েছে ছাত্রীরা কিভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় কলামেও এ নীতির প্রকাশ পাওয়া যায়। আসাদ নিহত হওয়ার পরদিন পত্রিকাটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে 'Plea for Prudence' শিরোনামে। এতে সরাসরি ছাত্রদের পক্ষ নেওয়া হয়নি আবার পুলিশের গুলিবর্ষণের বিষয়টিকে সমর্থন করা হয়নি। ২৫ জানুয়ারি 'we regret' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে একই সাথে সরকারি নীতি এবং আন্দোলনকারীদের ভূমিকার সমালোচনা করে বলা হয়:

> …today we can only mourn the dead and express our condolences for those who have suffered, whoever and wherever they may be. We regret the deaths and injuries caused by yesterday's police firing and the previous deaths and injuries… The general frustration has created this almost revolutionary situation and as we foresaw, there is no leader available with the prestige and status required to control it.

Dhaka University Institutional Repository

২৭ জানুয়ারি (১৯৬৯) প্রকাশিত 'The Inevitable is What We Choose' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তেও এক ধরনের মধ্যপন্থি নীতির প্রতিফলন দেখা যায়। এতে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়, "We are sure the majority of the students do not want Armageddon to come; it goes without saying that the government also cannot want it."

১৪ ফেব্রুয়ারির (১৯৬৯) হরতাল নিয়েও পত্রিকাটি আগের মতই এক ধরনের মধ্যবর্তী ভূমিকা পালন করে সংবাদ প্রকাশ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে ১৪ ফেব্রুয়ারি হরতাল পালনের সফলতা নিয়ে যেখানে সব পত্রিকা খবর প্রকাশ করেছে সেখানে *পাকিস্তান অবজারভার* খবরের শিরোনাম করেছে 'Peaceful Hortal'। ১৪ ফেব্রুয়ারি পল্টনের জনসভায় জনগণের ব্যাপক উপস্থিতিকে অন্যান্য পত্রিকা গুরুত্ব দিলেও *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকা সাধারণ ভাবে শিরোনাম করে 'People pledge democracy'.[২৬৯] তাছাড়া সংবাদ প্রকাশের যে ধরন ছিল তাতে পত্রিকাটির আন্দোলনের পক্ষে কোন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায় না। সার্জেন্ট জহুরুল হক কিংবা ড. শামসুজ্জোহা নিহত হবার খবর প্রকাশের ক্ষেত্রেও পত্রিকাটির একই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

আগরতলা মামলা প্রত্যাহার হবার পর *পাকিস্তান অবজারভার* তাদের মধ্যপন্থি নীতি থেকে বের হয়ে এটিকে জনগণের বিজয় হিসেবে চিহ্নিত করে। 'The People have it' শিরোনামে প্রকাশিত দিগ্‌নির্দেশনামূলক সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> The people have to rejoice because they have got their demand for the withdrawal of the case ultimately fulfilled … Sheikh Mujibur Rahman should now have a vital role to play and it is to be expected that he is fully aware of it.[২৭০]

মুক্তির পর শেখ মুজিবুর রহমান 'ডাক' এর নেতৃবৃন্দের সাথে রাওয়ালপিন্ডিতে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করতে যান। বৈঠক ব্যর্থ হলে ১৪ মার্চ ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা পেলে তিনি ছয় দফা আদায় করতে পারতেন। অসহযোগী যে কয়জনের নাম তিনি ঘোষণা করেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরী এবং সম্পাদক আব্দুস সালাম।[২৭১] প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধুর বিরোধী হিসেবে পরিচিত হামিদুল হক চৌধুরী - উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও আগরতলা মামলা

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির প্রধান ব্যক্তিতে পরিণত হচ্ছেন, এর বিরোধী ছিলেন।

৮.২.৫ *মর্নিং নিউজ*

অন্যান্য পত্রিকা যেখানে ১৯৬৮ সালের ৭ ডিসেম্বর পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার ঘটনার সমালোচনা করে সংবাদ প্রকাশ করেছে সেখানে *মর্নিং নিউজ* বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি নেতিবাচক ভূমিকা পালনের ধারা বজায় রাখে এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আবির্ভূত হয়। ৮ ডিসেম্বর পত্রিকাটি পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনার পক্ষে যুক্তি দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে 'police open fine in self defence'এবং '2 killed as violent mobs clash with police in city' শিরোনামে।পাশাপাশি আইয়ুব খান বিষয়টিকে 'Hindus crime' বলে অভিহিত করেন যেটি *মর্নিং নিউজ* ৮ তারিখে প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামে প্রকাশ করে।[২৭২] একই ঘটনা পাওয়া যায় ১৩ ডিসেম্বরের হরতালের সংবাদ পরিবেশন করার ক্ষেত্রে। এখানেও পত্রিকাটি পুলিশ আত্মরক্ষায় গুলি করেছে বলে সংবাদ প্রকাশ করে। সরকার সমর্থক পত্রিকাটি 'ডাক' গঠনের সংবাদ কিছুটা ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করে।[২৭৩] আটটি বিরোধী দলের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সংবাদ প্রকাশের পরিবর্তে পত্রিকাটি ৯ জানুয়ারি (১৯৬৯) প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদ প্রকাশ করে '8 opposition parties not to take part in elections' শিরোনামে। শুধু তাই নয়, ১৯৬৯ সালের ১১ জানুয়ারি প্রকাশিত সম্পাদকীয় কলামে 'ডাক'-এর গঠন ও এর বিভিন্ন কর্মসূচির সমালোচনা করে পত্রিকাটি বলেঃ

> Supposing President Ayub were to take his detectors at their words and step down tomorrow. What will happen? A political and administrative vacuum for the simple reason that jointly the Opposition (DAC) has no policy and no plan and individually one opposition party would not let the other make any move. In fact the decision to boycott the elections sprung from the plain fact that the parties were unable to agree on a single candidate.

১৯৬৯ সালের জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে স্বৈরাচার বিরোধী গণ আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলে *মর্নিং নিউজ* ১৮ জানুয়ারিতে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে ছাত্র সমাজ এবং একই সাথে রাজনীতিবিদের ভূমিকার সমালোচনা করে বলেঃ

> It is morally wrong to play on the sentiments of students and misdirect their idealism. If they fritter away their time and energy in agitational activities when they should concentrate on the studies, they would ultimately be losers.

Dhaka University Institutional Repository

আসাদের মৃত্যুর খবরে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল বরারবরের মতই নেতিবাচক। গণ-অভ্যুত্থানের খবর পত্রিকাটিতে নিয়মিত ছাপা হয় কিন্তু খবর প্রকাশের ধরন ছিল অন্যান্য পত্রিকা থেকে আলাদা। ২১ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত খবরে পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়েছে বলে দাবি করে বলা হয়:

> The firing which police says was in self – defense climaxed an hour long pitched battle between the marching students and the police … A large number of students among the marchers here equipped with sticks, inflammable materials and brickbats which they used against the police.

তাছাড়া পত্রিকাটি ছাত্রদের প্রতি ইঙ্গিত করে দাবি করে যে, নিহত আসাদুজ্জামানের মরদেহ কিডন্যাপ করা হয়েছে। পরদিন ২২ জানুয়ারি সব পত্রিকা যেখানে আসাদের জানাজা, বিশাল শোকর‍্যালি এবং পুলিশের নির্যাতনের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছে সেখানে *মর্নিং নিউজ* ছিল সরকারের পক্ষে সরব। ইপিআর ও পুলিশের পক্ষ সমর্থন করে পত্রিকাটি সংবাদ প্রকাশ করে বলে যে, ছাত্রদের পক্ষ থেকে হামলা ও ইট নিক্ষেপের মাধ্যমে ইপিআরের সাথে যুদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের নেতিবাচক এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী মূল ধারার বাইরে গিয়ে সংবাদ প্রকাশের পাশাপাশি গণ-অভ্যুত্থান চলাকালীন আসাদ নিহত হলে আন্দোলন প্রসঙ্গে পত্রিকাটি কোনো সম্পাদকীয় প্রকাশ করেনি। ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি ঢাকায় হরতাল ডাকা হলে এক অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি হয়। পুলিশের গুলিতে দশম শ্রেণির ছাত্র মতিউর সহ কয়েকজন নিহত হয়। *দৈনিক পাকিস্তান* এবং *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিরোধী ভূমিকার কারণে ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি মুক্তিকামী বিক্ষুব্ধ জনতা ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট ভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ কারণেই পরবর্তী দুই দিন অর্থাৎ ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি পত্রিকা দুটো প্রকাশিত হয়নি।

১৪ ফেব্রুয়ারি হরতাল নিয়ে পত্রিকাটি আগের মতই সরকারি পক্ষ অবলম্বন করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। হরতাল পালন করতে গিয়ে জনজীবন স্থবির হয়ে পড়ে বলে পত্রিকাটি দাবি করে। লক্ষণীয় যে পুলিশের গুলিতে নিহত প্রতিটি ব্যক্তির বেলায় আত্মরক্ষার্থে গুলি চালানো হয়েছিল বলে পত্রিকাটি উল্লেখ করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করার পরও *মর্নিং নিউজ* তার আগের নীতিতে অটল ছিল।

৮.২.৬ *দৈনিক পাকিস্তান*

দৈনিক পাকিস্তান গণ-অভ্যুত্থানের শুরু থেকে সরকারি পক্ষ অবলম্বন করে আন্দোলন বিরোধী ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে পত্রিকাটির সংবাদ প্রকাশের ধরন ছিল অনেকাংশে *মর্নিং নিউজ*-এর মত। ১৯৬৮ সালের ৭

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বরের হরতাল নিয়ে পত্রিকাটি পরদিন ৮ ডিসেম্বর সরকারি পক্ষ সমর্থন করে জনতা পুলিশের ওপর আক্রমণ করলে পুলিশ গুলি করতে বাধ্য হয় বলে উল্লেখ করে। ৮ ডিসেম্বরের হরতালের খবর পত্রিকাটি প্রকাশ করে ৯ ডিসেম্বর সংখ্যায় 'হরতাল আহ্বান সত্ত্বেও ঢাকায় জীবনযাত্রা স্বাভাবিক' শিরোনামে। অন্যান্য পত্রিকা যেখানে ১৪ ডিসেম্বরের হরতাল সফল ভাবে পালন করার বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করে সেখানে *দৈনিক পাকিস্তান* তাদের ১৫ ডিসেম্বরের সংখ্যায় পুলিশ কিভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত ছিল সেই বর্ণনা প্রকাশ করে। 'ডাক' গঠন নিয়ে পত্রিকাটি ৯ জানুয়ারি সংখ্যায় সাধারণ সংবাদ প্রকাশ করে যেখানে সরকারের পক্ষ অবলম্বন করার বিষয়টি ছিল সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবহ।

কিন্তু ট্রাস্ট মালিকানাধীন পত্রিকাটি আসাদ নিহত হওয়ার পর থেকেই আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নেয় এবং বিভিন্ন খবর ছবির মাধ্যমে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। বিশেষ করে আন্দোলন প্রকাশের ধরন ছিল অন্যান্য ব্যক্তিমালিকানাধীন পত্রিকার সমতুল্য। আসাদ নিহত হওয়ার আগে থেকেই পত্রিকাটি ছাত্রদের ওপর পুলিশের হামলার খবর প্রকাশ করতে থাকে। ২০ জানুয়ারি পত্রিকাটি ১ম পৃষ্ঠার ২য় কলামে সংবাদ প্রকাশ করে 'ঢাকায় ছাত্রদের ওপর তৃতীয় দিন লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ' শিরোনামে। পরদিন ২১ জানুয়ারি আসাদের মৃত্যুর খবর প্রকাশ করে পত্রিকাটি শিরোনাম করে 'বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সাথে পুলিশের কয়েকদফা সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ, ঢাকায় গুলিতে একজন নিহত'। তবে মুল পার্থক্যটি দেখা যায় সম্পাদকীয় কলাম থেকে। এখানে পত্রিকাটি ছাত্রদের দাবিকে সরাসরি সমর্থন না করে আসাদের মৃত্যুর জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ধৈর্য ও বিচক্ষণহীনতাকেই দায়ী করে।[২৭৪] পত্রিকাটি যে ধরনের ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করে তাতে আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান স্পষ্ট হয়। *দৈনিক পাকিস্তান* ট্রাস্ট মালিকানাধীন হওয়ায় পত্রিকাটির পক্ষে এর চেয়ে বেশি ভূমিকা রাখা সম্ভব ছিল না। ২২ জানুয়ারি 'ঢাকার পরিস্থিতি' শীর্ষক সম্পাদকীয় কলামে পত্রিকাটি মন্তব্য করে:

> তাছাড়া আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত তাদের বিচার বুদ্ধি, ধৈর্য ও বিচক্ষনতার ওপরও অনেক কিছু নির্ভর করে। ... বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ধরনের দায়িত্ব জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে কিনা উহা অবশ্যই যাচাই করিয়া দেখার প্রয়োজন রাখে।

প্রকৃতপক্ষে এ সময় দু-একটি ছাড়া প্রায় সব কয়টি পত্রিকা একযোগে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করে। গুরুত্বপূর্ণ হলো সরকারি মালিকানাধীন পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান* ধীরে ধীরে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আন্দোলনের পক্ষে সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ১৯৬৯ সালের ১৪

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি হরতাল ও জনসভা বিষয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি পত্রিকাটি যে সংবাদ প্রকাশ করে তাতে বলা হয়, "... গতকাল বিকেলে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে দু'লক্ষাধিক ছাত্র শ্রমিক জনতার ঐতিহাসিক জনসভা দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখার অটুট সংকল্প ঘোষণা করে।" এরই ধারাবাহিকতায় পত্রিকাটি ১৭ ফেব্রুয়ারি পল্টনে মওলানা ভাসানীর জনসভার খবর দিয়ে শিরোনাম করে, 'পল্টনের বিরাট জনসভা মওলানা ভাসানীর ঘোষণা শেখ মুজিবের মুক্তি ও ১১ দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবেই'। একই দিনে জহুরুল হকের জানাজার খবরে শিরোনাম করা হয়, 'সার্জেন্ট জহুরুল হকের জানাজা ও দাফনে হাজার হাজার লোকের অংশগ্রহণ'। বিশেষ করে ড. শামসুজ্জোহার মৃত্যুর খবরে কারফিউ ভঙ্গ করে ঢাকায় ছাত্রদের মিছিল বের করার খবর *দৈনিক পাকিস্তান* অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে।[২৭৫] ১৯ ফেব্রুয়ারি পত্রিকাটি এ বিষয়ে 'সান্ধ্য আইনে স্লোগান ও গুলির আওয়াজে মুখরিত রাজধানী ঢাকা' শিরোনামে বলেঃ

> ৫০ ঘণ্টার অধিক সান্ধ্য আইনের কবলে নিস্তব্ধ থাকার পর গতকাল রাত দশটার দিকে রাজধানীর সমস্ত এলাকা হঠাৎ বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। বিভিন্ন এলাকা থেকে হঠাৎ স্লোগান উঠতে থাকে 'সংগ্রাম সংগ্রাম চলবে চলবে' ... মাঝে মাঝে গুলিবর্ষণের শব্দ ভেসে আসতে থাকে । কিন্তু শতকণ্ঠের শ্লোগান সবকিছু ছাপিয়ে যায়।

একই বিষয়ের ওপর পত্রিকাটি ২০ ফেব্রুয়ারি আলাদা একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে 'অন্য সে রাত' শিরোনামে। এতে বলা হয়ঃ

> কারফিউর প্রতিরোধ ভেদ করে আর রাইফেল স্টেনগানের ভীতি উপেক্ষা করে সংগ্রামের শপথ নিয়ে আওয়াজ নির্ঘোষিত হয়ে এ রাতটিকে দিয়েছে এক অবিস্মরণীয় মর্যাদা। দীর্ঘস্থায়ী কারফিউর শ্বাসরোধকারী ছিন্ন করে যে আওয়াজ যুগপৎ ভাবে ছাত্রাবাসগুলোর ছাত্ররা ও তেজগাঁও শিল্প এলাকার শ্রমিকরা তুলেছিল মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়েছিল শহরের অনেক জায়গায়। ... অপরদিকে গর্জে উঠেছিল রাইফেল। তবু মারণাস্ত্রের সে শব্দকেও ছাপিয়ে উঠেছিল জনতার কণ্ঠের গর্জন।

পত্রিকাটির পরিবর্তিত চেহারার প্রতিফলন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। ২৩ ফেব্রুয়ারি পত্রিকাটি আগরতলা মামলাকে 'তথাকথিত' হিসেবে উল্লেখ করে বলে, 'ছাত্র জনতার দুর্বার সংগ্রামের সাফল্য :তথাকথিত আগরতলা মামলা প্রত্যাহার মুজিব সহ সকলের মুক্তি লাভ'। এ বিষয়ে পত্রিকাটি শেখ মুজিবুর রাহমানের নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে 'শেখ মুজিবের মুক্তি' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে, "দেশের রাজনীতিতে শেখ সাহেবের জন্য এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্ধারিত ... শেখ মুজিবের মুক্তি জনগণেরই বিজয় ঘোষণা করিতেছে।"

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রতিবেদন গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমি তৈরির পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মামলা পরিচালনার কিছুদিনের মধ্যেই পাকিস্তানি পরিকল্পনার অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণিত হয়। ফলে পাকিস্তানি শাসকরা বিভিন্ন কূটকৌশল প্রয়োগ করে। একটি ভাঁজ করা কাগজে পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের মানচিত্র খুঁজে পাওয়ার নাটক সাজানো হয়।[২৭৬] কিন্তু বিভিন্ন সংবাদপত্রে যখন মামলাটির বিবরণ প্রকাশিত হয় তখন বাঙালি জনগণ ফুঁসে ওঠে এবং আন্দোলনের তোড়ে শেষ পর্যন্ত মামলাই উঠিয়ে নেয় পাকিস্তান সরকার। শুধু তাই নয়, আইয়ুব খান এবং তার দোসর মোনায়েম খানকে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে হয়।

মূল্যায়ন

১৯৫৮ সাল থেকে জারি হওয়া সামরিক শাসনের মধ্যে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হলেও সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পরই পত্রিকাগুলো আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল *মর্নিং নিউজ*। অবাঙালি স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী পত্রিকাটি স্বৈরশাসনের পক্ষ সমর্থন করে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করলেও বাঙালি জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। একটি পর্যায়ে এর সাথে যুক্ত হয় ট্রাস্ট মালিকানাধীন *দৈনিক পাকিস্তান*। আইয়ুব খানের সরকারের অবৈধ ও দমনমূলক পদক্ষেপ, সাম্প্রদায়িক নীতি এবং ইসলামিকরণ প্রবণতা এসব পত্রিকায় সমর্থন পায়। বিপরীতে রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিন্নতা থাকলেও *ইত্তেফাক*, *সংবাদ* এবং *পাকিস্তান অবজারভার* বিভিন্ন সময়ে বাঙালি জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এছাড়া মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকা *আজাদ* সাম্প্রদায়িক, রক্ষণশীল ও পাকিস্তানপন্থি আদর্শের ধারক ও বাহক হলেও উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে।

সামরিক শাসন জারির পরই সরকার নিজের প্রয়োজনে সংবাদপত্রকে ব্যবহার করে। একদিকে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারি, সাংবাদিকদের গ্রেফতার এবং বিদেশ গমনে বাধা দেওয়া হয়, অন্যদিকে সামরিক সরকার জনগণের কল্যাণে কাজ করছে সেটি প্রমাণ করতে পত্রিকায় রাজনীতিবিদদের বিভিন্ন দুর্নীতির খবর প্রকাশ করা হতে থাকে। সংবাদপত্র যখনই জনগণের অধিকারের কথা তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছে তখনই বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারি করে মতপ্রকাশের অধিকারকে কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির আগে অধিকাংশ ক্ষত্রে রাজনীতিবিদরাই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু আইয়ুব খানের সামরিক বেসামরিক আমলা নিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থায় বাক্‌স্বাধীনতা ও স্বাধীন সংবাদপত্রকে নিজেদের ক্ষমতার প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯৬৩ সালের সংশোধিত প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে *মর্নিং নিউজ* ছাড়া ঢাকার অন্য সব পত্রিকা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করে এবং সরকার বাধ্য হয় অধিকাংশ সমালোচিত ধারা রহিত করতে। এটি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়াসকে উৎসাহিত করে।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির প্রাথমিক পর্যায়ে রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র হয়রানির শিকার হলেও *আজাদ* আইয়ুব খানের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন জানিয়ে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এসব সম্পাদকীয়তে সামরিক শাসন জারিকে রাজনৈতিক কোন্দল নিরসনের উপায় হিসেবে বৈধতা দেয়া হয়। কিন্তু *ইত্তেফাক* দীর্ঘদিন সামরিক শাসন বজায় রাখার বিরোধিতা করে দ্রুত জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিতে কৌশলে বিভিন্ন সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। পত্রিকাটির সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সম্পূর্ণভাবে সামরিক শাসনের বিরোধী ছিলেন। *ইত্তেফাক*-এর পাশাপাশি *সংবাদ* ১৯৬০ এর দশক জুড়েই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। *আজাদ* যেখানে আইয়ুব খানকে তোষণ করে বিভিন্ন খবর প্রকাশ করে সেখানে *ইত্তেফাক* ও *সংবাদ* স্বৈরাচার বিরোধী খবর প্রকাশ করত নিয়মিত।

ভাষা ও সংস্কৃতি বাঙালি জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে বড় উপাদান যা অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করে। ফলে দ্বিজাতিতত্ত্বের মত একটি সাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে অবাঙালি শাসকবৃন্দ বারবার ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হেনেছে। পূর্ব বাংলায় অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনা তথা সমন্বয়পন্থি সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা ছিল সাম্প্রদায়িক মহল যারা বাংলা ভাষা, রবীন্দ্র সংগীত ইত্যাদি বিষয়কে পাকিস্তান বিরোধী এবং হিন্দুয়ানি বলে গণ্য করত। এই সাম্প্রদায়িক শ্রেণির মুখপত্র ছিল *আজাদ*, *মর্নিং নিউজ*, ও *পয়গাম*। অপরদিকে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসন ও বিধি-নিষেধের মধ্যেও *ইত্তেফাক*, *সংবাদ* ও *পাকিস্তান অবজারভার* বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি তথা অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে অবস্থান নেয়।

১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে ঢাকার সংবাদপত্রগুলো প্রগতিশীল রাজনীতিক ও জনতার সাথে একত্রিত হয়ে দাঙ্গা বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) এবং তার পত্রিকা *ইত্তেফাক* সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি *সংবাদ* এবং *পাকিস্তান অবজারভার* অসাম্প্রদায়িক নীতি নিয়ে দাঙ্গা বিরোধী ভূমিকা রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলনের মতই আইয়ুব আমলে *আজাদ* পত্রিকার দ্বিমুখী চরিত্র দেখা যায়। পত্রিকাটি একদিকে রবীন্দ্র সাহিত্য এবং রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের বিরোধিতা করে কিন্তু একই সাথে বাংলা বানান সংস্কারের বিপক্ষেও অবস্থান নেয়। রবীন্দ্র সাহিত্য নিয়ে *দৈনিক পাকিস্তান* এবং *মর্নিং নিউজ*-ও *আজাদ*-এর মত সংকীর্ণ অবস্থান নেয়। পাশাপাশি *দৈনিক পাকিস্তান* এবং *মর্নিং নিউজ* বাংলা বানান সংস্কারের পক্ষে যুক্তি দিয়ে একাধিক সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সংকীর্ণ ও রক্ষণশীল ধারার বুদ্ধিজীবী - যারা বাংলা ভাষা ও বানান সংস্কারের পক্ষে ছিলেন তারাও *দৈনিক পাকিস্তানকে* ভিত্তি করে প্রচারণা চালান ও বিবৃতি প্রদান করেন। কিন্তু *ইত্তেফাক, সংবাদ* ও *পাকিস্তান অবজারভার* এক্ষত্রে প্রগতিশীল ভূমিকা রাখে। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে ঢাকার পত্রিকাগুলো সাম্প্রদায়িক এবং অসাম্প্রদায়িক এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায় এবং এদের বিতর্ক চরম আকার ধারণ করে। ফলে পাঠক যারা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী নন তারাও রবীন্দ্রনাথের অসাম্প্রদায়িক চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হন। এভাবে একটি জাতীয় জাগৃতির বাহন হয়ে দাঁড়ায় রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালন, বাংলা ভাষার সংস্কার প্রয়াসের বিরোধিতা, সরকারি প্রচার মাধ্যমে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার নিয়ে বিতর্ক কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা ছিল না, ছিল স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবাদ। *ইত্তেফাক, সংবাদ* ও *পাকিস্তান অবজারভার* এই প্রতিবাদে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে।

ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারেও *আজাদ* রক্ষণশীল ও বৈপরীত্যমূলক ভূমিকা নেয়। পত্রিকাটি ১৯৬২ সালের সংবিধানকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের আন্দোলনের সমালোচনা করে এবং আন্দোলন নিষিদ্ধ করারও দাবি জানায়। একই কাতারে দাঁড়িয়ে সরকার সমর্থক *মর্নিং নিউজ* ও *দৈনিক পাকিস্তান* ছাত্র আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের গ্রেফতার ও হয়রানি করা হলে *আজাদ* এর প্রতিবাদ জানায়। বিভিন্ন সময়ে ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্রদের দাবির পক্ষে অবস্থান নেয় *ইত্তেফাক*। বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ-এর মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পত্রিকাটির সম্পাদক মানিক মিয়া নেপথ্যে থেকে ভূমিকা রাখেন। এর সাথে যুক্ত হয় *সংবাদ* ও *পাকিস্তান অবজারভার*।

শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণার মধ্য দিয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবি একটি সফল রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। কৌশলগত কারণে ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, আঞ্চলিক বৈষম্য ইত্যাদি স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে ঢাকার পত্রিকাগুলো জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেনি। তবে নির্বাচনের পরেই পত্রিকাগুলো ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষে অবস্থান নেয়। ছয় দফা ভিত্তিক জনমত সংগঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে *ইত্তেফাক*। পত্রিকাটির সম্পাদক

Dhaka University Institutional Repository

মানিক মিয়া ব্যক্তিগতভাবে ছয় দফা কোনো কোনো দফা সমর্থন না করলেও জাতীয় স্বার্থে তিনি এটিকে রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং *ইত্তেফাক* হয়ে ওঠে ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলনের প্রধান সমর্থক। ফলে আইয়ুব খান সরকার পত্রিকাটি নিষিদ্ধ করে। *পাকিস্তান অবজারভার* ১৯৬৬ সালের আগে থেকেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের কথা তুলে ধরে বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশ করতে থাকে। একটি পর্যায়ে ন্যাপ সমর্থিত *সংবাদ* আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখতে শুরু করে। এর বিপরীতে *আজাদ, দৈনিক পাকিস্তান* ও *মর্নিং নিউজ* ছয় দফা বিরোধী অবস্থান নেয়। ছয় দফার সমালোচনা করলেও *আজাদ* অনেক আগে থেকেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের বিষয়ে সোচ্চার ছিল এবং এ বিষয়ে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এসব সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানের উভয় অংশের বৈষম্য দূর করে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হয়। এমনকি বৈষম্য দূর না হলে সেটি পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করতে পারে বলে *আজাদ* একাধিক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করে। সুতরাং *আজাদ* ছয় দফা ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিপক্ষে কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য দূর করার পক্ষে ভূমিকা রাখে। *ইত্তেফাক*-এর সাথে *আজাদ*-এর ভূমিকার প্রধান পার্থক্য হলো - *ইত্তেফাক* আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে একটি জাতীয় দাবিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়।

১৯৬৮ সালের শুরুতে বা ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্র তৈরির বিষয়টি ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলোর নীতিতে স্থান করে নেয়নি। তাছাড়া এ সময় বাঙালি নেতৃত্বের বক্তৃতা বিবৃতিতে এটা স্পষ্ট যে, স্বায়ত্তশাসনের দাবি তাদের মানসপটে বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর প্রভাব সংবাদপত্রের ওপরেও পরে। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানেও *আজাদ* দ্বিমুখী নীতির পরিচয় দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে *আজাদ* সামগ্রিক বিষয়টিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতীয় গোয়েন্দাদের তৎপরতা বললেও একটি পর্যায়ে পত্রিকাটি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পক্ষে এবং সরকারের দমনপীড়নের বিপক্ষে ভূমিকা রাখে। *ইত্তেফাক*-এর অনুপস্থিতিতে *আজাদ* ছিল অভ্যুত্থানের পক্ষে সবচেয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর।

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের শুরু থেকেই *আজাদ* এ অঞ্চলের সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ওপর গুরুত্ব দেয়। ঐক্যবদ্ধ না হলে যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফল হয় না *আজাদ* এ বিষয়টি তদের সংবাদ ও সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে তুলে ধরে। এর পাশাপাশি শুরু থেকেই পত্রিকাটি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে। দিক্‌নির্দেশনামূলক এ ভূমিকার সাথে সাথে *আজাদ* মুদি দোকানদার বা পানবিক্রেতার মত

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের সাধারণ মানুষের অভিমত প্রকাশ করে রাজনৈতিক সচেতনতা ছড়িয়ে দেয়ার কাজটি সুচারুভাবে পালন করেছে।

গণ-অভ্যুত্থানের সূচনালগ্ন থেকেই *সংবাদ* বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর এবং সম্পাদকীয় কলামে গঠনমূলক মতামত প্রদানের মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরিতে কাজ করে। যেকোনো গণ-আন্দোলন সফল করার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো রাজনৈতিক দল ও জনগণের মেলবন্ধন এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। *সংবাদ* অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ ভাবে কর্মসূচি প্রদান ও আন্দোলন এবং আরও বেশি জনসম্পৃক্ত হবার ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরিতে একটি বিশেষ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছিল। বিশেষ করে আসাদ নিহত হবার পর সরকারের কঠোর সমালোচনা করে এবং আন্দোলনের পক্ষে খবর প্রকাশ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে পত্রিকাটির স্পষ্ট অবস্থানের প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সাধারণ জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে বাঙালির রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরির ক্ষেত্রে *সংবাদ*-এর ভূমিকা এক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

পাকিস্তান অবজারভার গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা থেকেই কিছুটা মধ্যপন্থি নীতি অবলম্বন করে সংবাদ প্রকাশ করে। আন্দোলনের শুরু থেকে আসাদ নিহত হবার পরও পত্রিকাটি এমন ভাবে সংবাদ প্রকাশ করেছে যেখানে সরাসরি ছাত্র বা পুলিশ কারও পক্ষই অবলম্বন করা হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রেই সংবাদ প্রকাশের ধরন ছিলএমন যে, ছাত্ররা পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং সেটি থেকে বাঁচতে পুলিশ গুলিবর্ষণ করেছে। পত্রিকাটির মালিক হামিদুল হক চৌধুরীর আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু বিরোধী মনোভাব এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

মর্নিং নিউজ শুরু থেকেই সরকারি পক্ষ অবলম্বন করে। গুলিবর্ষণ ও ছাত্র নিহত হওয়ার ঘটনায় পত্রিকাটি পুলিশের পক্ষ সমর্থন করে সেটি আত্মরক্ষার্থে করা হয়েছে বলে দাবি করে। এভাবে অবাঙালি স্বার্থের প্রতিভূ হিসেবে পত্রিকাটি বাঙালি জতীয়তাবাদী রাজনীতির মূল ধারার বাইরে গিয়ে সংবাদ পরিবেশন করে।

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান বিষয়ে *দৈনিক পাকিস্তান*-এর ভূমিকাকে দু'টি পর্যায়ে মূল্যায়ন করা যায়। প্রথম দিকে পত্রিকাটি সরকারি পক্ষ অবলম্বন করে সংবাদ প্রকাশ করলেও আসাদের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে পত্রিকাটি আন্দোলনের পক্ষে বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। এভাবে *দৈনিক পাকিস্তান*-এর বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও অভাবনীয় এবং সংবাদ প্রকাশের ধরন ছিল অনেকাংশেই অন্যান্য পত্রিকার তুলনায় তীব্র।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং সার্বিকভাবে বলা যায় আইয়ুব আমলে *মর্নিং নিউজ* বাদে ঢাকা থেকে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকা সরকারের হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখে। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবোধের এক ঐক্যবদ্ধ চেতনা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়।

তথ্যসূত্র

১. গবেষক রাশব্রুক এ বিষয়ে মন্তব্য করেন, "His adroitness in confusing opponents by playing one of against the other and getting his own way in the end, became proverbial." Rushbrook Williams, *The State of Pakistan*, London: Faber and Faber, 1962, p.149.

২. মোঃ এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংবাদপত্র*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮, পৃ. ১৩৭।

৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র,* দ্বিতীয় খণ্ড পটভূমি, ১৯৫৮-১৯৭১, ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ১; ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রেসিডেন্টকে পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে জরুরি আইন জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এ ক্ষমতা ব্যবহার করেই তিনি সামরিক শাসন জারি করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত –A. B. M. Mofizul Islam, *Protection of the-Constitution and Fundamental Rights Under the Martial Law in Pakistan 1958-1962,* Dhaka: 1988, p. 199.

৪. A. Akanda, 'The 1962 Constitution of Pakistan and the Reaction of the People of Bangladesh', *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol. III, 1978, p. 71.

৫. *The Dhaka Gazette*, Extraordinary, Published by Authority, 12 November, 1958, pp. 2669-2672; পরিশিষ্ট ৩ দ্রষ্টব্য।

৫(ক). পরিশিষ্ট ৪ দ্রষ্টব্য।

৬. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১।

৭. তারিক আলী, *পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ: জান্তা না জনতা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃ. ৮।

৮. ড. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সাংস্কৃতিক ধারা,* ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

৯. প্রথম স্তরে ছিল – ইউনিয়ন কাউন্সিল, দ্বিতীয় স্তরে – থানা কাউন্সিল, তৃতীয় স্তরে – জেলা এবং চতুর্থ স্তরে – বিভাগীয় কাউন্সিল। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য – আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১*, ঢাকা : বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ২৮১-৩০০।

১০. নুরুল হুদা (সম্পাদিত), আবদুল হক, *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা, প্রেক্ষাপটঃ বাংলাদেশ ১৯৫৩-'৯৩,* ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৯৬, পৃ. ৬২-৬৩

১১. উক্ত ১১ জন ব্যক্তি ছিলেন – ১) নুরুল আমীন, ২) আতাউর রহমান খান, ৩) খান বাহাদুর নাজির উদ্দিন আহমেদ, ৪) এস. এ. মজিদ, ৫) সৈয়দ কামরুল আহসান, ৬) আবুল কাশেম, ৭) আবদুস সালাম (*পাকিস্তান অবজারভার*), ৮) তফাজ্জল হোসেন (*ইত্তেফাক*), ৯) জহুর হোসেন (*সংবাদ*), ১০) আবুল কালাম শামসুদ্দিন (*আজাদ*), ১১) মুস্তফা হাসান। তেরটি সংগঠন ছিল – ১) ঢাকা বার এসোসিয়েশন, ২) ময়মনসিংহ বার এসোসিয়েশন, ৩) ঢাকা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন, ৪) পূর্ব পাকিস্তান আইনজীবী সমিতি, ৫) চট্টগ্রাম জেলা বার এসোসিয়েশন, ৬) রংপুর বার এসোসিয়েশন, ৭) কুষ্টিয়া বার এসোসিয়েশন, ৮) টাঙ্গাইল উকিল বার এসোসিয়েশন, ৯) মানিকগঞ্জ বার এসোসিয়েশন, ১০) পূর্ব পাকিস্তান মোক্তার সমিতি, ১১) ফরিদপুর মোক্তার বার এসোসিয়েশন, ১২) পূর্ব পাকিস্তান আয়কর বার এসোসিয়েশন, ১৩) পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশন (পূর্ব জোন) এর কার্যকরী পরিষদ। বিস্তারিত – মোঃ মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, ঢাকা : সময়, ২০০৫, পৃ. ১৭০, পাদটীকা নং – ২২

১২. S. A. Akanda, 'Was Parliamentary System of Government a Failure in Pakistan? A Case Study of a Constitutional Debate in Pakistan during Martial Law, 1958-1962', *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol. VI, 1982-83, p. 179

১৩. ড. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩।

১৪. ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০ থেকে ১৯৭১,* ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ২২৪।

১৫. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪।

১৬. *ঐ*, পৃ. ১৯৩।

১৭. মুনতাসির মামুন, জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ১৯৪৭-১৯৯০*, ঢাকা : সময়, ২০১৪, পৃ. ২২।

১৮. ড. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. ড. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৫।

২০. রাশেদ খান মেনন, 'চৌষট্টির ছাত্র আন্দোলন', *বিচিত্রা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭, পৃ. ৫৪।

২১. জুলফিকার হায়দার, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা,* ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ১৪৫

২১(ক). ছয় দফার বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৬ এ।

২২. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃ. ১৩৯

২৩. জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলো হলো – কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামি, কৃষক শ্রমিক পার্টি, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এবং জামায়াত-ই-ইসলামি।

২৪. সরকার ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটনের কথা ঘোষণা করে। ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা, দুইজন সিনিয়র বাঙালি সিভিল কর্মকর্তাসহ মোট ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে ১৮ জানুয়ারি আরেকটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকেও উক্ত মামলার আসামি করা হয়। অভিযোগে বলা হয় যে, তাঁরা ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি পি. এন. ওঝার মাধ্যমে আগরতলা সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র ও অন্যান্য বৈষয়িক সাহায্যের জন্য ভারতীয় বিভিন্ন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। আগরতলা মামলা বিষয়ে বিস্তারিত – হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৮-৩৬৩। এছাড়াও মামলার ৩৫ নং অভিযুক্ত লে. আবদুর রউফ, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার নাবিক জীবন,*ঢাকা : প্যাপিরাস প্রকাশনী, ১৯৯২।

২৫. ৮ টি বিরোধী দলের সমন্বয়ে ডাক গঠিত হয়। দলগুলো ছিল – এনডিএফ, জামায়াত-ই-ইসলামি, নেজামে ইসলামি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (নসরুল্লাহ খান), আওয়ামী লীগ (ছয় দফা পন্থি), ন্যাপ (ওয়ালী), জমিয়াতে ওলামায়ে ইসলাম। বিস্তারিত – আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০-১৭১

২৬. Mohammad Ayub Khan, *Friends not Masters: A Political Autobiography*, London: OUP, 1967, p. 84

২৭. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১

২৮. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

২৯. সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫, পৃ. ৭২

৩০. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

৩১.	সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮।

৩২.	কে. জি. মুস্তাফা, *সিরাজুদ্দিন হোসেন তৎকালীন রাজনীতি ও সাংবাদিকতা*, সেমিনার, সিরডাপ মিলনায়তন, ২৬ ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৮।

৩৩.	আবদুস সালাম (*পাকিস্তান অবজারভার*), মুজিবর রহমান খাঁ (*আজাদ*), জহুর হোসেন চৌধুরী (*সংবাদ*), তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া (*ইত্তেফাক*), ফরিদ আহমেদ (*নাজাত*), মোঃ বদরুদ্দীন (*মর্নিং নিউজ*) এর সদস্য ছিলেন। বিস্তারিত – এম. আর. আখতার মুকুল, *ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা : শিখা প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ. ১৪৯।

৩৪.	*ঐ*, পৃ. ২৪৯।

৩৫.	সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২।

৩৬.	*পাকিস্তান অবজারভার*, ৯ অক্টোবর ১৯৫৮।

৩৭.	*ঐ*, ১০ অক্টোবর ১৯৫৮।

৩৮.	তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, ঢাকা : বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, ১৯৮১, পৃ. ১১৪।

৩৯.	*ইত্তেফাক*, ১৭ অক্টোবর ১৯৫৮।

৪০.	ড. প্রীতি কুমার মিত্র, 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৫৮-১৯৬৬', প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, মোনায়েম সরকার, ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ৯২।

৪১.	সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।

৪২.	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, ঢাকা : নভেল পাবলিশিং হাউজ, পৃ. ৯৬।

৪৩.	অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৪, পৃ. ২৬১।

৪৪.	তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০।

৪৫.	মুনতাসির মামুন, জয়ন্ত কুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।

৪৬.	সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩।

৪৮. সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪, ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র, ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯, পৃ. ৬৩৬-৬৪১, মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১।

৪৯. সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯।

৫০. *ঐ*।

৫১. *আজাদ*, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩।

৫২. *ঐ*, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩।

৫৩. *ইত্তেফাক*, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩।

৫৪. *ঐ*, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩।

৫৫. আওয়ামী লীগ, জামায়াত-ই-ইসলামি, নেজামে ইসলামি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নুরুল আমীনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের অংশ নিয়ে ১৯৬২ সালের ৪ অক্টোবর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট – এনডিএফ' গঠিত হয়।

৫৬. *আজাদ*, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩।

৫৭. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১-২১২।

৫৮. *ইত্তেফাক*, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩।

৫৯. *ঐ*, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩।

৬০. *পাকিস্তান অবজারভার*, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩।

৬১. *আজাদ*, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩।

৬২. *ঐ*, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩।

৬৩. *ঐ*, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩।

৬৪. *আজাদ*, ২৭ মার্চ ১৯৬৪।

৬৫. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

৬৬. *সংবাদ*, ২ ডিসেম্বর, ১৯৬৮।

৬৭. খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক*, ঢাকা : বর্তমান সময়, ২০১০, পৃ. ৫২।

৬৮. মনি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ. ৫৯।

৬৯. খোকা রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২।

৭০. ড. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৫।

৭১. মোরশেদ শফিউল হাসান, *স্বাধীনতার পটভূমি ১৯৬০ দশক*, ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ২০১৪, পৃ. ৫৭।

৭২. মুনতাসির মামুন, জয়ন্ত কুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩।

৭৩. মাযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪, পৃ. ২০৭।

৭৪. *পাকিস্তান অবজারভার*, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২।

৭৫. সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯।

৭৬. *আজাদ*, ২ আগস্ট ১৯৬২।

৭৭. *আজাদ*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬২।

৭৮. ড. প্রীতি কুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪।

৭৯. ড. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০।

৮০. *আজাদ*, ৫ মে ১৯৬৪।

৮১. ড. প্রীতি কুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯।

৮২. ড. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮১; ঢাকা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ ১৯৬৪ সালের ৮ জুলাই ছাত্র বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত এবং জামানত তলব দুটোকেই অবৈধ ঘোষণা করে – *আজাদ*, ৯ জুলাই ১৯৬৪।

৮৩. *আজাদ*, ২৮ মে ১৯৬৪।

৮৪. মাহফুজ উল্লাহ, *পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গৌরবের দিনগুলি*, ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১২, পৃ. ১০২।

৮৫. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

৮৬. *আজাদ*, ৫ জুলাই, ১৯৫৯।

৮৭. *ঐ*, ৪ অক্টোবর, ১৯৫৯।

৮৮. *ঐ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০।

৮৯. *ঐ*।

৯০. যে চারজন মন্ত্রীকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় তাঁরা হলেন – আবুল মনসুর আহমেদ, আবদুল খালেক, শেখ মুজিবুর রহমান ও হামিদুল হক চৌধুরী। একমাত্র মওলানা ভাসানী ছাড়া অন্যদের দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।

৯১. *পাকিস্তান অবজারভার*, ১১ আগস্ট ১৯৫৯।

৯২. *ঐ*, ৩০ এপ্রিল ১৯৬২।

৯৩. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯-১০৮।

৯৪. *ইত্তেফাক*, ২৫ জুন ১৯৬২।

৯৫. ড. প্রীতি কুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২।

৯৬. *ইত্তেফাক*, ৯ জুলাই ১৯৬২।

৯৭. *আজাদ*, ৯ জুলাই ১৯৬২।

৯৮. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০-১৭২, প্রয়োজনীয় দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে বিরোধী দলীয় নয় জন পরিষদ সদস্যকে টাকা দিয়ে কিনতে হয়েছিল। বিস্তারিত - ড. প্রীতি কুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯।

৯৯. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬।

১০০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩-১৭৪।

১০১. ড. প্রীতি কুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১।

১০২. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৭, আরও –Mohammad Ayub Khan, *op.cit*, p. 250-253.

Dhaka University Institutional Repository

১০৩. *আজাদ*, ১২ অক্টোবর ১৯৬২।

১০৪. *ঐ*, ১৭ মে, ১৯৬৩।

১০৫. *ঐ*, ১৭ জুলাই ১৯৬৪।

১০৬. *ঐ*, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪।

১০৭. *ঐ*, ৩ অক্টোবর ১৯৬৪।

১০৮. *ঐ*।

১০৯. *ঐ*, ৭ নভেম্বর ১৯৬৪।

১১০. মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২।

১১১. *ইত্তেফাক*, ৫ জানুয়ারি ১৯৬৫।

১১২. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০।

১১৩. *আজাদ*, ২৭ অক্টোবর ১৯৬৭।

১১৪. মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০।

১১৫. *পাকিস্তান অবজারভার*, ৩০ জুন ১৯৬০।

১১৬. *আজাদ*, ১০ জুন ১৯৬০।

১১৭. মুনতাসির মামুন, জয়ন্ত কুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪।

১১৮. আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭।

১১৯. Karl Von Vorys, *Plitical Development in Pakistan*, London : OUP, 1965, p. 232.

১২০. মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২।

১২১. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯-১৩০।

১২২. *ঐ*।

Dhaka University Institutional Repository

১২৩. বিবৃতি দানকারী ৯ জন রাজনীতিবিদ হলেন নুরুল আমীন, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, ইউসুফ আলী চৌধুরী, শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ আজিজুল হক, হামিদুল হক চৌধুরী, পীর মোহসিন উদ্দিন আহমেদ, মাহমুদ আলী। এ বিষয়ে বিস্তারিত – হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫-১৬৯।

১২৪. *ইত্তেফাক*, ২৫ জুন ১৯৬২।

১২৫. *আজাদ*, ১২ অক্টোবর ১৯৬২।

১২৬. আতাউর রহমান খান, *স্বৈরাচারের দশ বছর*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০১, পৃ. ১৬৮।

১২৭. *আজাদ*, ২৪ অক্টোবর, ১৯৫৮।

১২৮. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭।

১২৯. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪।

১৩০. কে. জি. মুস্তাফা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।

১৩১. *ইত্তেফাক*, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪।

১৩২. সুব্রত শংকর ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০।

১৩৩. আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৩, পৃ. ৩৭০।

১৩৪. *ইত্তেফাক*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪।

১৩৫. মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯।

১৩৬. *ঐ*, পৃ. ১৫৫।

১৩৭. আইয়ুব খান উল্লেখ করেন, কোনো ভাষাই পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয় বলে বাংলা ও উর্দুর মিশ্রণে একটি নতুন ভাষা তৈরি করতে হবে এবং তা লিখতে হবে রোমান হরফে। বিস্তারিত- Mohamad Ayub Khan, *op.cit*, p.102.

১৩৮. মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১।

১৩৯. রেজোওয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭১)*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৩-৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৪০. ‘রওনক সাহিত্য সংস্থা’ সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায় পাদটীকা ১৯১ দ্রষ্টব্য; *আজাদ*, ১৩ মে ১৯৫৮।

১৪১. *ইত্তেফাক*, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯।

১৪২. সাঈদ-উর-রহমান, ‘আইয়ুব খানের আমলে জাতীয় ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক’, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১৮৪।

১৪৩. রেজোওয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৫।

১৪৪. *আজাদ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২।

১৪৫. *ঐ*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩।

১৪৬. সাঈদ-উর-রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮।

১৪৭. মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫।

১৪৮. ইসরাইল খান, *বাংলা সাময়িকপত্র* : পাকিস্তান পর্ব, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৪, পৃ. ২৭।

১৪৯. *ঐ*, পৃ. ৬৮১।

১৫০. *দৈনিক পাকিস্তান*, *ইত্তেফাক*, *আজাদ*, *সংগ্রাম* ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১।

১৫১. ইসরাইল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।

১৫২. *পয়গাম*, ৬ জুলাই ১৯৬৮।

১৫৩. ড. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮।

১৫৪. *আজাদ*, ২৬ এপ্রিল ১৯৬১।

১৫৫. *ঐ*।

১৫৬. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭।

১৫৭. গোলাম মুর্শিদ, *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ রবীন্দ্র চর্চা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮১, পৃ. ২২৯-২৩০।

১৫৮. *ঐ*, পৃ. ২২৮।

১৫৯. মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৬০. *ইত্তেফাক*, ২৩ এপ্রিল ১৯৬১।

১৬১. *ঐ*।

১৬২. *সংবাদ*, ৯ মে ১৯৬১।

১৬৩. মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭।

১৬৪. ড. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৪।

১৬৫. আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৪।

১৬৬. *আজাদ*, ১৩ মার্চ ১৯৬১।

১৬৭. *ঐ*, ১৪ জুন ১৯৬৬।

১৬৮. আবদুল হালিম, 'বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৬৬-১৯৬৯', প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, মোনায়েম সরকার, ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩।

১৬৯. মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১।

১৭০. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৩ জুন ১৯৬৭

১৭১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫-১৬৯, বিবৃতিতে স্বাক্ষরদাতাগণ হিলেন – ড. কুদরত-ই-খোদা, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, শিল্পী জয়নুল আবেদীন, জনাব এম. এ. বারী, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, ড. খান সরওয়ার মুরশিদ, কবি সিকান্দার আবু জাফর, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ড. নিলীমা ইব্রাহীম, ড. আহমেদ শরীফ, কবি শামসুর রাহমান, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, কবি আবুল ফজল, কবি ফজল শাহবুদ্দীন, ড. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

১৭২. এই ৫ জন স্বাক্ষরদাতা ছিলেন – সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন (ইংরেজি), কে. এম. এ. মুনিম (ইংরেজি), এম. শাহবুদ্দীন (আইন), ড. মোহর আলী (ইতিহাস), এ. এফ. এম. আব্দুর রহমান (গণিত); *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ জুন ১৯৬৭।

১৭৩. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ জুন ১৯৬৭; এরা অধিকাংশই সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। স্বাক্ষরদাতাগণ ছিলেন – মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, মোহাম্মদ মোদাচ্ছের, কবি ফররুখ আহমদ, কবি আহসান হাবীব, ড. হাসান জামান, ড. কাজী দীন মুহম্মদ, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, ড. গোলাম সাকলায়েন, কবি বেনজির আহমদ, কবি খান মোহাম্মদ মইনুদ্দীন, অধ্যক্ষ শেখ শরফুদ্দীন, আ. কা. মু. আজমউদ্দীন, কবি তালিম হোসেন, শাহেদ আলী, কবি আ. ন. ম. বজলুর রশিদ, কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সানাউল্লাহ নূরী,

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুস সাত্তার, শিল্পী কাজী আবুল কাশেম, কবি মুফাখখারুল ইসলাম, গ্রন্থাগারিক শামসুল হক, অধ্যক্ষ ওসমান গনি, মফিজুদ্দীন আহমদ, আনিসুল হক চোধুরী, মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক মোঃ মতিউর রহমান, জহরুল হক, ফারুক মাহমুদ, মোহাম্মদ নাসির আলী, এ. কে. এম. নুরুল ইসলাম, কবি জাহানারা আরজু, বেগম হোসনে আরা, বেগম মাফরুহা চৌধুরী, কাজী আবদুল ওয়াদুদ, আখতার-উল-ইসলাম। বিস্তারিত – মনসুর মুসা (সম্পাদিত), *বাঙলাদেশ*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ২৯২-২৯৩।

১৭৪. *আজাদ*, ২৬ মে ১৯৬৭।

১৭৫. *ঐ*।

১৭৬. *ঐ*, ১ জুলাই, ১৯৬৭।

১৭৭. *পয়গাম*, ১ জুলাই, ১৯৬৭।

১৭৮. *পাকিস্তান অবজারভার*, ২ জুলাই, ১৯৬৭।

১৭৯. *মর্নিং নিউজ*, ২৮ জুন ১৯৬৭।

১৮০. মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১।

১৮১. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৮ আগস্ট ১৯৬৭

১৮২. *সংবাদ*, ২ জুলাই ১৯৬৭

১৮৩. মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

১৮৪. কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হাসনাত, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুহম্মদ ওসমান গণি, মুহম্মদ ফেরদাউস, মুনীর চোধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী।

১৮৫. ড. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১১।

১৮৬. কমিটির সদস্যরা হলেন জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক ফেরদৌস খান, আবদুল হাই (বাংলা বিভাগ), সাজ্জাদ হোসায়েন (ইংরেজি বিভাগ), ড. মোহাম্মদ ওসমান (টিটি কলেজ), আবুল কাসেম (বাংলা কলেজ), ইব্রাহীম খাঁ, ড. এনামুল হক, মুনীর চৌধুরী, টি হোসেন (চৌমহনী কলেজ)।

১৮৭. সাঈদ-উর-রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮।

১৮৮. *আজাদ*, ২৭ আগস্ট, ১৯৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯. *সংবাদ*, ১৩ আগস্ট, ১৯৬৮।

১৯০. বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা হলেন – কাজী মোতাহার হোসেন, সুফিয়া কামাল, শহীদুল্লাহ কায়সার, হাসান হাফিজুর রহমান, আতাউস সামাদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, ফয়েজ আহমেদ, ওয়াহিদুল হক প্রমুখ। বিস্তারিত – হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭০।

১৯১. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮।

১৯২. *আজাদ*, ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮।

১৯৩. ড. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪।

১৯৪. এস এস বারনভ, *পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য (১৯৪৭-১৯৭১)*, ড. তাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১, পৃ. ১১৭

১৯৫. ড. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬।

১৯৬. রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়: একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য*, ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮, পৃ. ৩০।

১৯৭. ড. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭।

১৯৮. আওয়ামী লীগের সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমেদ, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও মুসলিম লীগ (নুরুল আমীন)'র প্রায় সবাই পুনরুজ্জীবনের বিপক্ষে ছিলেন। বিস্তারিত – লেনিন আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৯৭, পৃ. ৪৩৩।

১৯৯. পশ্চিম পাকিস্তনের আইয়ুব বিরোধী বিভিন্ন ডানপন্থি রাজনৈতিক দল ১৯৯৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি 'নিখিল পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্স' আহ্বান করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্ততায় সম্পাদিত তাসখন্দ চুক্তি-উত্তর রাজনীতির গতিধারা নির্ধারণ করাই ছিল কনফারেন্সের উদ্দেশ্য। এই সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তি ও জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক ছয় দফা উত্থাপন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ছয় দফার তীব্র বিরোধিতা করেন। পরে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে তা পাকিস্তানের উভয় অংশে প্রকাশিত হয়। বিস্তারিত – আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০।

২০০. *আজাদ*, ২১ মার্চ ১৯৬০

২০১. *ঐ*, ৮ মার্চ ১৯৬৩

Dhaka University Institutional Repository

২০২. *ঐ*, ৮ জুলাই ১৯৬৩

২০৩. *ঐ*, ৪ ডিসেম্বর ১৯৬৩।

২০৪. *ঐ*, ২০ মার্চ ১৯৬৭।

২০৫. *ঐ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৬৭।

২০৬. *ঐ*, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬।

২০৭. *ঐ*, ১৮ মার্চ ১৯৬৬।

২০৮. *ঐ*, ৯ এপ্রিল ১৯৬৬।

২০৯. *ঐ*, মোঃ শামসুল আলম, 'ছয় দফা আন্দোলন আনুপূর্বিক ইতিহাস', *The Jahangirnagar Review*, part- CN Vol- IX, 1997-98, p. 13.

২১০. *মর্নিং নিউজ*, ২১ এপ্রিল ১৯৬৬।

২১১. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৬৭; ততকালীন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকের একটি সাক্ষাৎকার থেকে দেখা যায় যে, রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দীর একান্ত অনুসারী মানিক মিয়া প্রথম দিকে ছয় দফাকে সমর্থনের বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তবে শীঘ্রই তিনি দ্বিধা ফেলে ছয় দফার পক্ষে কলম ধরেন এবং *ইত্তেফাক* ছয় দফার প্রধান মুখপত্রে পরিণত হয়। বিস্তারিত – মুহম্মদ শামসুল হক, *স্বাধীনতার সশস্ত্র প্রস্তুতি : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অপ্রকাশিত জবানবন্দি*, চট্টগ্রাম : বলাকা, ২০০৯, পৃ. ১৫৮।

২১২. *ইত্তেফাক*, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬, সংবাদপত্রে পাকিস্তানের 'সংহতি বিরোধী' খবর প্রকাশের বিরুদ্ধে গোপন নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকায় ঢাকার পত্রিকাগুলো তখন ছয় দফার পূর্ণ বিবরণ ছাপেনি। মূলত ছয় দফার সারাংশ ছাপা হয়। মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।

২১৩. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৪৬।

২১৪. *ইত্তেফাক*, ৭ নভেম্বর ১৯৬৪।

২১৫. *ঐ*, ২৩ জুন ১৯৬৫।

২১৬. *ঐ*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬।

২১৭. *ইত্তেফাক*, ৬ জুন ১৯৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

২১৮. মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫।

২১৯. রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১।

২২০. *পাকিস্তান অবজারভার*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬১।

২২১. মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬।

২২২. *পাকিস্তান অবজারভার*, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬২।

২২৩. *আজাদ*, ৭ জুন ১৯৬৬।

২২৪. *পাকিস্তান অবজারভার*, ৮ জুন ১৯৬৬।

২২৫. *ইত্তেফাক*, ৮ জুন ১৯৬৬।

২২৬. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪; সরকারের বিরুদ্ধে *ইত্তেফাক* আইনের আশ্রয় নেয় এবং নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ঢাকা হাইকোর্টে রিট করা হয়। বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকীর নেতৃত্বে পাচজন বিচারপতির সমবায়ে গঠিত এক বিশেষ বেঞ্চ সরকারের নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করাকে অবৈধ ঘোষণা করে। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার আইনের বাইরে গিয়ে একই বিধির বলে *ইত্তেফাক*-এর প্রেসকে পুনরায় বাজেয়াপ্ত করে প্রায় দু'বছর সাত মাস (১৬ জুন ১৯৬৬ – ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯) নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখেন।

২২৭. *পাকিস্তান অবজারভার*, ১৮ জুন ১৯৬৬।

২২৮. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯

২২৯. মাযহারুল ইসলাম,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৯।

২৩০. মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০।

২৩১. *সংবাদ*, ৯ জুন ১৯৬৬।

২৩২. *ঐ*।

২৩৩. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩।

২৩৪. মোহাম্মদ হাননান, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, বঙ্গবন্ধু এবং দৈনিক আজাদ', মোঃ শাহ আলমগীর (সম্পাদিত), *বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম*, ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ২০১৩, পৃ. ৪৯-৭৫; আগরতলা মামলা বিষয়ে বিস্তারিত – সাহিদা বেগম, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র,* ঢাকা : ২০০০; মামলা দায়ের করার দুই বছর আগে

Dhaka University Institutional Repository

থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান নিরাপত্তা আইনে কারাগারে বন্দী ছিলেন। ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি মুক্তি দিয়ে পুনরায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

২৩৫. কর্নেল শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা*, ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, পৃ. ১৬।

২৩৬. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৭ জানুয়ারি ১৯৬৮; প্রেসনোটে বলা হয়, "একটি রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে গত মাসে পূর্ব পাকিস্তানে ২৮ ব্যক্তিকে গ্রপ্তার করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রটি গত মাসে উদ্‌ঘাটিত হয়। ধৃত ব্যক্তিগণ পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল।" ৬ জানুয়ারি প্রকাশিত প্রেসনোটে এক নম্বর অভিযুক্ত ছিলেন লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন। তবে শেষ পর্যন্ত শেখ মজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করা হয়।

২৩৭. মুনতাসির মামুন, জয়ন্ত কুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯।

২৩৮. জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা : সুবর্ণ, ২০০৯, ১২৮; এছাড়া আগরতলা মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে শেখ মুজিবের দেওয়া জবানবন্দির বিস্তারিত - মোনায়েম সরকার (সম্পাদিত), *বাঙালির কণ্ঠ*, ঢাকা : বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ১৯৯৯, পৃ. ১৪৭-১৫২।

২৩৯. মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪।

২৪০. ফয়েজ আহমদ, *'আগরতলা মামলা', শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ,* ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪, পৃ. ৮।

২৪১. *ঐ*।

২৪২. *আজাদ*, ২ আগস্ট ১৯৬৮।

২৪৩. *ঐ*, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৮।

২৪৪. কর্নেল শওকত আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।

২৪৫. *আজাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৬৮।

২৪৬. *ঐ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৬৮।

২৪৭. আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব আটক থাকায় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আমেনা বেগম এবং সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে দলটি পরিচালিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে মওলানা ভাসানী ছয় দফাকে সাম্রাজ্যবাদের ফর্মুলা বলে মন্তব্য করেন –*ইত্তেফাক*, ৮ এপ্রিল ১৯৬৬।

২৪৮. *আজাদ*, ৯ জানুয়ারি ১৯৬৯; এই আট দফা কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম ছিল ফেডারেল ধরনের পার্লামেন্ট, সরাসরি নির্বাচন ও সার্বজনীন ভোটাধিকার, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারসহ মৌলিক নাগরিক অধিকার প্রদান, সংবাদপত্রের

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা প্রদান ইত্যাদি। তবে এতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিস্তারিত - Rangalal Sen, *Plotical Elites in Bangladesh*, Dhaka : UPL, 1986, p. 233.

২৪৯. *আজাদ*, ১২ জানুয়ারি, ১৯৬৯।

২৫০. আবদুল হালিম,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১; আসাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র ছিলেন। একই সাথে ভর্তি হয়েছিলেন ঢাকা কেন্দ্রীয় আইন মহাবিদ্যালয়ে। সাংগঠনিক ভাবে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের মেনন গ্রুপের ঢাকা হল (বর্তমানে শহীদুল্লাহ হল) শাখার সভাপতি ছিলেন - ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, কলিকাতা : এ হাকিম এণ্ড সন্স, ১৯৯৬, পৃ. ১৬৪।

২৫১. *আজাদ*, ১১ জানুয়ারি ১৯৬৯।

২৫২. *ঐ*।

২৫৩. *ঐ*, ২২ জানুয়ারি ১৯৬৯।

২৫৪. *ঐ*।

২৫৫. *ঐ*।

২৫৬. আবদুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২।

২৫৭. *আজাদ*, ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৯।

২৫৮. *আজাদ*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।

২৫৯. *সংবাদ*, ৪ নভেম্বর ১৯৬৮।

২৬০. *ঐ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৬৮।

২৬১. *ঐ*, ১০ জানুয়ারি ১৯৬৯; ন্যাপ (ভাসানী) এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি ডাক-এ যোগদান করা থেকে বিরত থাকে।

২৬২. *ঐ*, ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯।

২৬৩. *ঐ*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।

২৬৪. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৫

২৬৫. *সংবাদ*, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

২৬৬. *ইত্তেফাক*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।

২৬৭. *পাকিস্তান অবজারভার*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৬৮।

২৬৮. *ঐ*, ২১ জানুয়ারি ১৯৬৯।

২৬৯. *ঐ*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।

২৭০. *ঐ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।

২৭১. জয়ন্ত কুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

২৭২. *মর্নিং নিউজ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৬৮।

২৭৩. *ঐ*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৬৮।

২৭৪. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২১ জানুয়ারি, ১৯৬৯।

২৭৫. *ঐ*, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।

২৭৬. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৯৭০ সালের নির্বাচন, বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং সংবাদপত্র : ১৯৭০-৭১(মার্চ)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল বাঙালি জনগণের স্বায়ত্তশাসন এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য সমাধানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাইলফলক। বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী ধারা এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের[১] নেতৃত্বে প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিভাজন দৃষ্টিগোচর হলেও নির্বাচনের পর বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ ধারা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে *আজাদ*, *ইত্তেফাক*, *সংবাদ*, *দি পিপল* এবং ট্রাস্ট মালিকানাধীন হওয়ার পরও *দৈনিক পাকিস্তান*-এর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। ট্রাস্ট মালিকানাধীন অন্য পত্রিকা *মর্নিং নিউজ* চিরাচরিত ভাবেই সরকারি পক্ষ অবলম্বন করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরোধী অবস্থান নেয়। অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত ভূমিকা পালনকারী হামিদুল হক চৌধুরীর *পাকিস্তান অবজারভার* এবং *পূর্বদেশ* ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে আপোশমূলক নীতি নেয়।

ঘটনাপ্রবাহ

জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ রাতে সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি এবং সংবিধান বাতিল করে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।[২] এ সময় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের তেমন কোনো রূপরেখা ছিল না। যে প্রক্রিয়ায় আইয়ুব খান সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন সেটি ছিল অগণতান্ত্রিক কারণ ১৯৬২ সালের সংবিধানে সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কোনো বিধান ছিল না। ৩১ মার্চ সামরিক আইনের এক ঘোষণায় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[৩] প্রবল গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করে তিনি গণ-অভ্যুত্থানের সহায়ক শক্তিগুলো ধ্বংস করার মত কোনো সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তবে সামরিক আইন বজায় রাখার ক্ষেত্রে ইয়াহিয়া খানের প্রশাসন বেশ তৎপর ছিল। ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর এক বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল, পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশে অধিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান, এক ব্যক্তি এক ভোট এই নীতিতে প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিক নির্বাচন, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন, ফেডারেল সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, পরিষদের প্রথম বৈঠক থেকে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা এবং ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।[৪] ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ অপর এক ঘোষণায় ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের 'আইন কাঠামো আদেশ' (Legal Frame Work

Dhaka University Institutional Repository

Order) জারির কথা ঘোষণা করেন যা ৩০ মার্চ প্রকাশিত হয়।[৫] আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ (উভয় গ্রুপ) সহ অন্যান্য গণতন্ত্রমনা দলসমূহ আইন কাঠামো আদেশ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা ও তাতে প্রেসিডেন্টের সম্মতি নিতে ব্যর্থ হলে সংবিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে ইত্যাদি অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ বাদ দেওয়ার দাবি জানায়। অপরদিকে ধর্মভিত্তিক ও ডানপন্থি দলগুলো সামরিক শাসনকে তাঁদের পক্ষে সুবিধাজনক মনে করে আইন কাঠামো আদেশের প্রতি সমর্থন জানায়।[৬] তবে আইন কাঠামো আদেশের সমালোচনা করলেও ভাসানী ন্যাপ বাদে অন্যান্য রাজনৈতিক দল নির্বাচনের ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়।[৭]

আওয়ামী লীগ ছয় দফাকে নির্বাচনি ইশতাহার হিসেবে ঘোষণা করে এবং নির্বাচনকে ছয় দফা ও এগারো দফার প্রশ্নে একটি গণভোট হিসেবে অভিহিত করে। দলটি নির্বাচনি প্রচারণায় পাকিস্তানের উভয় অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসে এবং 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' শিরোনামে একটি পোস্টারের মাধ্যমে এই বৈষম্যের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে।[৮] ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর) পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে নির্বাচনি ইশতাহারে অগ্রাধিকার দিলেও ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্নে তাদের দাবি আওয়ামী লীগের ছয় দফা থেকে কিছুটা নমনীয় ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনে ইসলামি দলগুলোর বিপক্ষে আওয়ামী লীগের সাথে জোট গঠনে তারা আগ্রহী ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ একক ভাবে নির্বাচন করতে আগ্রহী ছিল। পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি) কেন্দ্রকে শক্তিশালী রেখে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। দলটির নেতা নুরুল আমীন আওয়ামী লীগের ছয় দফার বিরোধিতা করে দলটির বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতার অভিযোগ উত্থাপন করেন। ধর্মভিত্তিক দল জামায়াত-ই-ইসলামি ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। দলটি বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করে বলে যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি হুমকি। মুসলিম লীগের তিনটি গ্রুপ আওয়ামী লীগের ছয় দফা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভারত বিরোধী নীতি গ্রহণ করে।[৯] সুতরাং সার্বিকভাবে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোকে তিনটিভাগে বিভক্ত করা যায় – প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং ইসলামি ভাবধারার শাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী দল।

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। দলটি জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ টি আসনের মধ্যে২৮৮ টি আসন লাভ করে। অপরদিকে জাতীয় পরিষদে অবশিষ্ট দুটো আসন লাভ করেন পিডিপি নেতা নুরুল আমীন ও স্বতন্ত্র সদস্য। প্রাদেশিক পরিষদে স্বতন্ত্র ও অন্যান্য সদস্যরা ১২ টি

Dhaka University Institutional Repository

আসন পায়। পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ কোনো আসন পায়নি। সেখানে জাতীয় পরিষদে ৮৩ টি আসন পেয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টো'র পাকিস্তান পিপলস পার্টি দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়।[১০]

নির্বাচনের এই ফলাফল ছিল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন তথা ছয় দফা কর্মসূচির প্রতি গণরায়। পাকিস্তানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ডানপন্থিদলগুলোর এই দাবিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করে। ফলে বাঙালি অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি এই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। পাশাপাশি এটাও প্রমাণ হয়ে যায় যে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে কোনো বিশেষ মিল ছিল না এবং ইসলাম এই দুই অংশের মধ্যে কোনো বন্ধন সৃষ্টি করতে পারেনি। আইন আদেশ কাঠামোর তৃতীয় তফসিলে ১৭(২) নং তফসিলের ১৮ নং ধারায় বলা হয়েছিল সাংবিধানিক বিল সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাকি অন্যকোনো বিশেষ প্রক্রিয়ায় গৃহীত হবে জাতীয় পরিষদই তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদে সাংবিধানিক বিল পাশ করার পদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয়টি স্থির করে নেয়।[১১] ১৯৭১ সালের মধ্য জানুয়ারিতে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে তিনদিন ধরে বঙ্গবন্ধুর সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভবিষ্যৎ সংবিধান নিয়ে আলোচনা করেন। ভুট্টো ১৯৭১ সালের ২৭-২৯ জানুয়ারি ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ছয় দফার কেবলমাত্র প্রথম ও ষষ্ঠ দফা মেনে নিতে সম্মত হন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন যে পশ্চিম পাকিস্তান ছয় দফা মেনে নিতে রাজি না হলে তিনি একাই সংবিধান প্রণয়ন করবেন। ইয়াহিয়া খান বাঙালি জনমতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং ১৯৭১ সালের ১ মার্চ এক আকস্মিক ঘোষণায় ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ও ছাত্রলীগের উদ্যোগে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এই সংগঠনের উদ্যোগে ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করা হয়।[১২] ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ 'স্বাধীনতার ইশতাহার' ঘোষণা করে। এতে 'বাংলাদেশ' নামে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং এর সর্বাধিনায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি এই রাষ্ট্র অর্জনে আন্দোলনের ধারা হিসেবে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ এবং সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলা হয়।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিলের প্রতিবাদে ২ মার্চের হরতালে পুলিশের গুলিতে হতাহতের ঘটনা ঘটে। ২ মার্চ রাত থেকেই (সন্ধ্যা ৭ টা থেকে সকাল ৭ টা) কারফিউ জারি করা হয়েছিল। ফলে ৩-৬ মার্চ প্রদেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল ঘোষণা করা হয়। ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ এক ঘোষণায় ২৫ মার্চ থেকে জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। এছাড়া তিনি কঠোর প্রকৃতির টিক্কা খানকেপূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন।[১৩] এই প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রদান করে পরবর্তী সাতদিনের জন্য অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ সময় বঙ্গবন্ধুর ওপর বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার চাপ থাকলেও তিনি কিছুটা কৌশলী হন। ফলে ৭ মার্চের ভাষণের দুটো দিক পাওয়া যায় –

প্রথমত, এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু পরোক্ষ ভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

দ্বিতীয়ত, বঙ্গবন্ধু আলোচনার পথ উন্মুক্ত রেখে বলেন যে সামরিক শাসন প্রত্যাহার, সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া, প্রাণহানি সম্পর্কে তদন্ত এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের আগেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এই চারটি শর্ত মেনে নিলে তিনি এসেমব্লিতে বসার বিষয় বিবেচনা করবেন।

৭ মার্চ থেকে সরকারি প্রশাসন তাজউদ্দীন আহমেদের নির্দেশনায় পরিচালিত হতে থাকে। ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু এক ঘোষণায় এযাবৎ দেওয়া সব নির্দেশনা বাতিল করে দেন এবং পরিবর্তে ১৫ মার্চ থেকে নির্দেশ আকারে ঘোষিত ৩৫ টি কর্মসূচি পালিত হবে বলে ঘোষণা দেন।[১৪] ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান এবং ২১ মার্চ ভুট্টো আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। কিন্তু আলোচনার আড়ালে পূর্ব পাকিস্তানে গোপনে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। বেসামরিক পোশাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আনার পাশাপাশি সিনিয়র অবাঙালি অফিসার ও ব্যবসায়ীদের পরিবারবর্গকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঐ রাতেই শুরু হয় নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানিদের বর্বর হত্যাকাণ্ড - অপারেশন সার্চলাইট।[১৫] রাত ১ টা ১০ মিনিটে গ্রেফতার হওয়ার আগে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইপিয়ার ওয়ারলেস যোগে প্রাপ্ত সেই ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র (পরে স্বাধীন বাংলা)[১৬] থেকে প্রচারিত হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি চট্টগ্রাম উপকূলে নোঙর করা একটি জাহাজে গৃহীত হয়। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক এম. এ. হান্নান ২৬ মার্চ সেটি স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে পাঠ করেন। এতে বলা হয়:

> This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

২৭ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের ঐতিহাসিক মূল কপিটি নিরাপত্তার কারণে নষ্ট করে ফেলা হয়। ঘোষণাপত্রটি ছিল নিম্নরূপ:

> Major Zia, Provisional Commander-in-Chief of the Bangladesh Liberation Army, hereby proclaims, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh.[১৮]

স্বাধীনতার ঘোষণার পর আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।

সংবাদপত্রের ভূমিকা

১. ১৯৭০ সালের নির্বাচন

ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করার পর ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ থেকে ধারাবাহিকভাবে জারি হতে থাকে সামরিক আইন বিধি। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় ৬, ১৭ ও ১৯ নং ধারা। এসব ধারায় সামরিক আইনের সমালোচনা, শাসক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ বা উত্তেজনা সৃষ্টি, জনমনে আতঙ্ক ও হতাশা সৃষ্টি এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার চেষ্টার জন্য বিভিন্ন মেয়াদের সাজা নির্ধারণ করা হয়। সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।[১৯]

১৯৭০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশ্য রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় ঢাকার বিভিন্ন সংবাদপত্র ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচন ও সংবিধানের রূপরেখা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটায়। ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয় এবং ঐ বছরের মাঝামাঝি থেকে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গন পূর্ণ মাত্রায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধান টেলিভিশনে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ পান এবং পরদিন দৈনিক সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হতে থাকে।

আগরতলা মামলা এবং উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে *মর্নিং নিউজ* বাদে ঢাকার সংবাদপত্রগুলো সম্মিলিতভাবে সমর্থন দিলেও ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পত্রিকাগুলো তাদের পূর্বতন রাজনৈতিক অবস্থানে ফিরে যায়। *ইত্তেফাক* আওয়ামী লীগকে এবং *সংবাদ* ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)[২০] এর মোজাফ্‌ফর গ্রুপকে সমর্থন করে। তবে ভাসানীপন্থি ন্যাপের খবরও পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করে। *আজাদ* কাউন্সিল মুসলিম লীগের সমর্থক হলেও নির্বাচনমুখী মনোভাবের কারণে পত্রিকাটির অবস্থান ছিল অনেক ক্ষেত্রেই *ইত্তেফাক* ও

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগের সাথে একই সমান্তরাল। এ সময় প্রচার সংখ্যা ও জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে *আজাদ, ইত্তেফাক* ও *সংবাদ* ছিল শীর্ষস্থানীয়।[২১]

১.১ *ইত্তেফাক*

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে জনমত সংগঠন ও নির্বাচনি প্রচারাভিযানে *ইত্তেফাক* কাজ করে। দলটি ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনরুজ্জীবিত করার বিরোধিতা করে। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং এক ইউনিট বাতিল ছাড়া কোন সংবিধানই গ্রহণযোগ্য হবে না।[২২] তিনি বলেন সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণ-পরিষদ গঠন করে এর ওপর সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করাই গণতান্ত্রিক রীতি।[২৩] *ইত্তেফাক* আওয়ামী লীগের এই নির্বাচনমুখী নীতিকে সমর্থন করে এবং নির্বাচনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে প্রয়োজনীয় সংবাদ, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় এবং মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সামরিক শাসন জারির পরপর ১৯৬৯ সালের ২৮ মার্চ পত্রিকাটি সামরিক শাসন ও নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশ করে। মানিক মিয়া সামরিক শাসন দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেন:

> ... ১৯৫৮ সালে প্রবর্তিত সামরিক শাসন দীর্ঘকাল চলিবার পরে দেশে পুনরায় সামরিক শাসন প্রবর্তিত করিতে হইবে, ইহা কেহই ধারণা করে নাই। ...আমাদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ পর্যন্ত জাতীয় ভিত্তিতে একটিবারও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার জন্যই বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। ... আমরা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছি। কেননা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, অন্য কোনো ব্যবস্থা দ্বারা উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করা যাইবে না।[২৪]

এ সময় দেশে প্রকাশ্য রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় *ইত্তেফাক* শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনে সরকারের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করতে থাকে। ১৯৬৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'মঞ্চে নেপথ্যে' কলামে নির্বাচনের দাবিতে পত্রিকাটি মন্তব্য করে:

> সাধারণ মানুষ রাজনীতির সাত পাঁচ আজ আর বুঝিতে চায় না। তারা চায় নির্বাচন – সে নির্বাচন যত সত্বর আসে, ততই তাহাদের জন্য মঙ্গল বলিয়াই তাহারা মনে করে। তারা চায় শাসনতান্ত্রিক সংকটের অবসান হোক ... এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায়িত্ব মুখ্যত সরকারের হইলেও রাজনীতিকদের দায়িত্বও এক্ষেত্রে আদৌ কম নয়।[২৫]

পত্রিকাটি ধারাবাহিকভাবে চলমান শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংকট নিয়ে লেখনী প্রকাশ করে। পাশাপাশি পত্রিকাটি সাধারণ পাঠকদের বিভিন্ন বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতে থাকে। যেমন - ১৯৬৯ সালের ৬

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর সামরিক শাসনের মধ্যে ভবিষ্যৎ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আশংকা জানিয়ে একজন পাঠক আনোয়ার হোসেন 'গোল টেবিল বৈঠক বনাম রাজনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি' শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধে রাজনৈতিক নেতাদের ঐক্যমতের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে মন্তব্য করেন:

> শাসনতন্ত্রের মৌলিক বিষয়াদির উপর রাজনীতিবিদের একমতে পৌছাতে না পারিলে প্রেসিডেন্ট শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে সরাসরি জনগণের দরবারে যাইবেন বলিয়া ইতিপূর্বে ঘোষণা করিয়াছেন।... বিগত বাইশ বছরে সৃষ্ট রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শাসনতন্ত্রের মৌলিক বিষয়াদি যথা স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব ও এক ইউনিট বাতিল ইত্যাদির ব্যাপারে কোনো প্রকার ঐক্যমতে না পৌছায়া এবং সম্পূর্ণ শাসনতান্ত্রিক শূন্যতার ভিতর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে পরবর্তীকালে দেশে যে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে উহা ভাবিয়া অনেকে আবার মনে করেন যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একত্রে বসিয়া আলাপ আলোচনার মারফত বিতর্কমূলক বিষয়াদির উপর ঐক্যমত্য পৌছান।[২৬]

একইভাবে শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনে আবুল হাসনাতের 'রাজনৈতিক সংকট ও তার সমাধান' শিরোনামে মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।[২৭] এভাবে *ইত্তেফাক* পুরো সেপ্টেম্বর মাস জুড়েই রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট নিয়ে একাধিক লেখনী প্রকাশ করে। পত্রিকাটিতে ১৯৬৯ সালের ১, ২, ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। *ইত্তেফাক* পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে 'বাংলাদেশ' নাম গ্রহণ করার বিষয়েও প্রচারণা চালায়। ১৯৬৯ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলা একাডেমিতে গ্রামোফোন কোম্পানির এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তান নামের পরিবর্তে বাংলাদেশ নাম গ্রহণ করার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য উদ্ধৃত করে *ইত্তেফাক* ১৭ ডিসেম্বর মন্তব্য করে, "... আর বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর কোনো হামলা হইতে দেওয়া হইবে না এবং এখন হইতে পূর্ব পাকিস্তান অবশ্যই বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে।"[২৮] ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ ইয়াহিয়া খান আইন কাঠামো আদেশ ঘোষণা করলে *ইত্তেফাক* পরোক্ষভাবে এটিকে স্বাগত জানায়।[২৯]

১৯৭০ সালের মাঝামাঝি থেকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হলে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন জনসভায় সাংবিধানিক পরিকল্পনা ও বাঙালির অধিকার আদায়ের দাবি এবং বিগত ২২ বছরে বাঙালিদের ওপর শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরেন। এ সময় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে *ইত্তেফাক* আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশগ্রহণ করতে থাকে। *ইত্তেফাক* মূলত ছয় দফা দাবিকে গুরুত্ব দেয়। ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে পূর্ব পাকিস্তানে বন্যার কারণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনেকেই নির্বাচন স্থগিত করার পক্ষে অবস্থান নেয়। ভাসানী ভোটের আগে ভাতের দাবি তুলে নির্বাচন পেছানোর পক্ষে মত দেন।[৩০] কিন্তু নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের প্রতি জোরালো দাবি জানায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। *ইত্তেফাক* নির্বাচন অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা তুলে ধরে

Dhaka University Institutional Repository

একাধিক সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে এবং অনেকটা কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আওয়ামী লীগ ও এর কর্মীদের রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে পত্রিকাটি ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাস জুড়েই একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। *ইত্তেফাক* ভাসানীর 'ভোটের আগে ভাত চাই' – এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়ে ১৯৭০ সালের ১ নভেম্বর *ইত্তেফাক* উপ-সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে:

> ... তাহারা বলিতেছে ভোটের আগে ভাত চাই, বন্যা নিয়ন্ত্রণ না হইলে ব্যালট বাক্স জ্বালিয়ে দিব ইত্যাদি। ... নিয়ন্ত্রণের কাজ এক পাও আগাইবে না; কিন্তু নির্বাচনের তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ একশ বছর পিছাইয়া যাইবে। ... নির্বাচন ও গণ আন্দোলন পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। ... যেখানে শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তে গণতন্ত্র ব্যাহত হয়, অথবা নির্বাচনের ফল জনগণ ভোগ করিতে পারে না, সেখানেই আন্দোলন প্রয়োজন হয়। সে আন্দোলনের চরম উদ্দেশ্য সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠান। ... এই যুক্তিটাই আসন্ন নির্বাচনে প্রয়োগ করা যাক।[৩১]

ইত্তেফাক নির্বাচন বর্জন প্রশ্নে ভাসানীর সমালোচনা অব্যাহত রাখে। ভাসানীর বিপ্লব তত্ত্বের সমালোচনা করে ১২ নভেম্বর পত্রিকাটি উপ-সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে, "স্রেফ লাল টুপি পরিধান করিয়া এবং শ্লোগানে শ্লোগানে মনের গরমি প্রকাশ করার নাম যদি বিপ্লব হয় ... এই লাল টুপি পরিধানের বিপ্লব কেন প্রদর্শিত হয়, কি এর আসল মতলব এবং কোথায় এর শেষ দৌড়, সে সব দেশের মানুষের ভালই জানা।"[৩২]

কোনো চক্রান্তের কারণে যাতে নির্বাচন বাতিল না হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকতে *ইত্তেফাক* আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালের ১ নভেম্বর 'রাজনীতি ও রাজনৈতিক' দায়িত্ব শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। পত্রিকাটির অনেক সাংবাদিক ব্যক্তিগতভাবে সমাবেশে অংশগ্রহণ করে আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারে ভূমিকা রাখেন। যেমন –*ইত্তেফাক* এর বার্তা সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন ছাত্রলীগের ১১ দফা সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন।[৩৩]

নির্বাচনি প্রচারণার এক পর্যায়ে ন্যাপ সমর্থিত *সংবাদ* এবং সরকার সমর্থিত *মর্নিং নিউজ* আওয়ামী লীগ বিরোধী বিভিন্ন প্রচারণা চালালে *ইত্তেফাক* এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ১৯৭০ সালের ১৯ অক্টোবর *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার সমালোচনা করে মন্তব্য করা হয়, "মতিঝিলের মতি'র গ্রুপ অব পাবলিকেশনের ইংরেজী দৈনিকটি এখন উপকথার সেই বিচক্ষন ব্যক্তির মত নিজেকে একমাত্র বুদ্ধিমান ভাবিয়া আর সকলকে গবেট ও বোকা ঠাওরাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।"[৩৪] পাশপাশি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে *সংবাদ* পত্রিকায় 'আপোষবাদী ও সংগ্রাম বিমুখতা' শিরোনামে প্রচারণা চালানোর প্রতিবাদ করে *ইত্তেফাক* মন্তব্য করে, "ইংরেজী সহযোগীর

Dhaka University Institutional Repository

সহোদর ভ্রাতা আবিষ্কার করিতেছেন আপোষবাদী সংগ্রাম বিমুখতা। ইহার পশ্চাতে যে মূল দর্শনটি নিহিত তাহা হইল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দুই ফ্রন্টে প্রচারণা চালানো।"[৩৫]

ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করে *ইত্তেফাক* বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল চেতনা তথা ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার ওপর গুরুত্ব দেয়। ১৯৭০ সালের ২১ অক্টোবর এ প্রেক্ষিতে আশাবাদ ব্যক্ত করে পত্রিকাটি মন্তব্য করে, "বস্তুত এবারের নির্বাচন স্বায়ত্তশাসন অর্জনের নির্বাচন... দেশকে মুক্ত করিবে ধর্ম ব্যবসায়ী ও কুচক্রীদের হাত থেকে।"[৩৬]

আওয়ামী লীগের নির্বাচনি জনসভা *ইত্তেফাক* এ প্রচারণা পায়। যেমন – ১৯৭০ সালের ৩১ অক্টোবর ঢাকার জয়দেবপুরে বঙ্গবন্ধুর নির্বাচনি জনসভায় দেওয়া ভাষণ *ইত্তেফাক* পরদিন ১ নভেম্বর প্রধান শিরোনাম হিসেবে প্রকাশ করে।[৩৭] জনসভার সংবাদ প্রকাশের পাশাপাশি *ইত্তেফাক* ছয় দফা ও এগারো দফার ভিত্তিতে জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। ১৯৭০ সালের ৫ নভেম্বর *ইত্তেফাক* ও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আবেদন জানিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলা হয়:

> সারাদেশ ও দেশের মানুষের তীব্র সংকট ও দুর্গতি থেকে চিরদিনের মত মুক্ত করার সুযোগ এই নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রহণ করা যাইতে পারে ... ভোটাধিকারের নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে সেই মহা সুযোগ ও দায়িত্ব যদি আমরা কুচক্রীদের কাছে থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি, তাহলে কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারা মানুষের দুঃখ মোচন এবং বাংলার মুক্তি সনদ ছয় দফা ও এগারো দফা বাস্তবায়িত করা যাইবে।[৩৮]

নির্বাচনি খবরাখবর প্রচার ও প্রকাশে যখন ঢাকার সংবাদপত্রগুলো ব্যস্ত সে সময় ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে এবং এতে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়।[৩৯] যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে দুইদিন পর থেকে পত্রিকায় ক্ষয়ক্ষতির খবর প্রকাশিত হতে থাকে। এ সময় পত্রিকায় নির্বাচনি প্রচারণার খবর হ্রাস পায়। বন্যার কারণে আগে থেকেই যে সব নেতা নির্বাচন পেছানোর পক্ষপাতী ছিলেন তারা একবাক্যে নির্বাচন পেছানোর দাবি জানায়।[৪০] তবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নির্বাচন বাতিলের বিরোধিতা করে। আওয়ামী লীগ ঘূর্ণি দুর্গত এলাকায় কয়েক সপ্তাহ পর এবং অন্যসব জায়গায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মত দেয়। ইতোমধ্যে দুর্গত এলাকায় ত্রাণ বিতরণে সরকারি অব্যবস্থাপনার চিত্র বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ঢাকার পত্রিকাগুলোর প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, সরকারি উচ্চ পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তা বা পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো নেতা (ন্যাপ নেতা আবদুল ওয়ালী খান ব্যতীত) দুর্যোগপীড়িত পূর্ব বাংলার মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। এই দুর্যোগ আবারও

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণ করে যে পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ মাত্র। এই উদাসীনতা বাঙালি জনগণের ক্ষোভ বৃদ্ধি করে। আওয়ামী লীগ এই ক্ষোভ নির্বাচনি প্রচারণায় যথার্থভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। বঙ্গবন্ধু এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করে সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং *ইত্তেফাক* এসব সমালোচনা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতে থাকে। অবহেলা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভোটের মাধ্যমেই জবাব দেওয়া সম্ভব এটাই ছিল *ইত্তেফাক* ও আওয়ামী লীগের যুক্তি। নির্বাচন পেছানোর সমালোচনা করে পত্রিকাটি মন্তব্য করে, "নির্বাচনকে যাহারা বানচাল করিতে চায় এবং তারিখ পিছাইয়া দিবার শ্লোগান তোলে, তাহারা গণতন্ত্রকেই টুটি টিপিয়া হত্যা করিতে চায়।"[৪১]

প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ধর্মভিত্তিক দলগুলো পুনরায় ধর্মকে ব্যবহার করে প্রচারণা চালালে *ইত্তেফাক* বিষয়টির সমালোচনা করে ১৬ নভেম্বর 'নির্বাচনের ডামাডোল ও সত্য দর্শন' শীর্ষক নিয়মিত কলামে মন্তব্য করে,

> ... আমাদের তথাকথিত 'ইসলাম পছন্দ' শিবিরও শেষ পর্যন্ত অন্যূন পাঁচটি দলে বিভক্ত হইয়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়াছেন। ... মুখে সকলের ইসলামের বাণী ও বুলি অথচ কেহ 'দাঁড়িপাল্লা' কেহ 'বই' কেহ 'খেজুর গাছ' কেহ 'গাভী' আবার কেহবা 'গরুর গাড়ী' প্রতীক লইয়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ... রাজনীতির সহিত ধর্মকে জড়িত করা চলে না, করিলে ন্যায় ও সত্যের শান্তি ও সুন্দরের ধর্ম ইসলাম বিতর্কের বস্তুতেই পরিণত হয়। ... শতকরা ৯৫ জনই যে দেশে মুসলমান সে দেশে অহরহ যদি ইসলাম রক্ষার প্রশ্ন ওঠে তাহা হইলে যে দেশে মুসলমান সংখ্যালঘু সে দেশের মুসলমানরা কি ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া গিয়াছে বা যাইবে?[৪২]

ইত্তেফাক-এর এই বক্তব্য ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতি সমর্থন। নির্ধারিত তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিনা সে বিষয়ে সব সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে ২৭ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব নির্ধারিত তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। জাতীয় পরিষদের ৯ টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২১ টি ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকার নির্বাচন একমাস পিছিয়ে জানুয়ারিতে নিয়ে আসা হয়। বিষয়টিকে ধন্যবাদ জানিয়ে *ইত্তেফাক* পরদিন ২৮ নভেম্বর 'সঠিক সিদ্ধান্ত' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।[৪৩]

নির্বাচনের দিন ৭ ডিসেম্বর *ইত্তেফাক* শত বাধাবিপত্তির পরও নির্বাচন অনুষ্ঠানে স্বস্তি প্রকাশ করে বাঙালি জনগণের প্রতি আহ্বান জনিয়ে মন্তব্য করে, "মহা পরীক্ষার এই দিনটিতে প্রতিটি দেশপ্রাণ নাগরিক বঞ্চিত-বিশীর্ণ পূর্ব বাংলার স্বাধিকারের শাশ্বতদাবী সম্মুখে রাখিয়া এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ চিন্তা হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিজেদের সেই ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করিবেন।"[৪৪] পরদিন ৮ ডিসেম্বর *ইত্তেফাক* ভোটের সার্বিক

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতি নিয়ে 'ভোট কেন্দ্রে কি দেখিলাম' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন থেকে নির্বাচনে বাঙালি জনগণের উৎসাহ উদ্দীপনার দিকটি ফুটে ওঠে।[৪৫]

১.২ *আজাদ*

১৯৭০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় *আজাদ* এর আগে ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা এবং সাংবিধানিক সংকট নিয়ে বিভিন্ন সম্পাদকীয় ও নিবন্ধ প্রকাশ করে। সামরিক শাসনের প্রথম দিকেই পত্রিকাটির সুবিধাবাদী চরিত্রের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। একটি সময়ে আইয়ুব খানের সমালোচনা করলেও এ পর্যায়ে পত্রিকাটি আইয়ুব খানের উন্নয়নের দশককে বিতর্কিত বলে মন্তব্য করে। পাশাপাশি শাসক শ্রেণির স্তুতিজ্ঞাপন করার ধারা বজায় রেখে *আজাদ* বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাবোর্ডের পাঠ্যসূচি থেকে আইয়ুব খানের *প্রভু নয় বন্ধু* বইটি বাতিল করার প্রশংসা করে।[৪৬]

ভবিষ্যৎ সংবিধান নিয়ে *আজাদ* আলোচনার সূত্রপাত করে ১৯৬৯ সালের ১৫ জুন। এ পর্যায়ে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল অনেক বেশি গঠনমূলক। ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সুপারিশ এবং আক্রমণ ও পাল্টা-আক্রমণের সমালোচনা করে সামরিক শাসনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর অদূরদর্শিতাকেই দায়ী করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংবিধান সংক্রান্ত খসড়া যাচাই করা এবং তাদের মধ্যে সমঝোতা তৈরি করে জনমতের ভিত্তিতে সাংবিধানিক খসড়া পেশ করার জন্য *আজাদ* একটি কমিশন গঠন করার প্রস্তাব করে।[৪৭] এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালের ১৪ আগস্ট আবুল মনসুর আহমদ *আজাদ*-এ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে সংসদীয় রাজনীতির পক্ষে যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করে আশু নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান।[৪৮] একই বিষয়ের ওপর পত্রিকাটি ২৩ আগস্ট 'শাসনতান্ত্রিক জিজ্ঞাসা' শিরোনামে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এখানেও ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যমতে আসতে না পারার সমালোচনা করা হয়।[৪৯]

১৯৭০ সালের জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির ওপর বিধিনিষেধ উঠে যাওয়ায় *আজাদ* ভবিষ্যৎ নির্বাচন ও সংবিধান নিয়ে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখে এবং একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে। পত্রিকাটি আইন কাঠামো আদেশের মাধ্যমে নির্বাচনের পক্ষে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করায় সন্তোষ প্রকাশ করে। ১৯৭০ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত *আজাদ*-এর সংবাদ ও সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ করে দুইটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়–

Dhaka University Institutional Repository

১. *আজাদ* নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে জোরালো অবস্থান নেয় এবং কোনোভাবেই নির্বাচন পেছানো বা বাতিল না করার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস চালায়।

২. *আজাদ* বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যকার কোন্দল এবং একটি দলের নির্বাচনি সমাবেশে অন্য দলের হামলা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করে। অতীতে এই অনৈক্য ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণেই সামরিক শাসনের পথ উন্মুক্ত হয়েছে বলে *আজাদ* একাধিক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করে।

আজাদ-এর এই নীতির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৭০ সালের ২০ জানুয়ারি 'নির্বাচনী পরিবেশ' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে *আজাদ* মুষ্টিমেয় কিছু লোকের নির্বাচন বয়কট করার বিষয়ে সতর্ক থাকতে রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৫০] পত্রিকাটি রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পারিক অবিশ্বাস এবং সংঘাতমূলক রাজনীতির বিরোধিতা করে ১৯৭০ সালের ৫ মার্চ 'জাতীয় ঐক্য ও রাজনীতি' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে নিজস্ব তৎপরতা অক্ষুন্ন রেখে সাধারণ সমঝোতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির ওপর জোর দেয়।[৫১] ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পরদিনও প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে নির্বাচন সম্পর্কে *আজাদ*-এর ইতিবাচক মনোভাব পাওয়া যায়। পত্রিকাটি 'আসন্ন নির্বাচন ও যথার্থ পরিস্থিতি' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে কিছু সংখ্যক লোকের বিরোধিতার পরও সরকার ও জনগণের যৌথ শক্তির মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে তোলার বিষয়টিকে সাধুবাদ জানায়। এসব সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশের বাইরে পত্রিকাটি নির্বাচন সংক্রান্ত ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জনসভার খবরও গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধু ও ভাসানী এসব সংবাদ এ গুরুত্ব পেয়েছেন। যেমন – ১৯৭০ সালের ৭ জুন আওয়ামী লীগ রেসকোর্স ময়দান থেকে তাদের নির্বাচনি প্রচার শুরু করলে *আজাদ* এটিকে 'স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভা' হিসেবে উল্লেখ করে।[৫২] আওয়ামী লীগ বিরোধী আদর্শের একটি পত্রিকার কাছে এই স্বীকৃতি নির্বাচন পূর্ব সময়ে দলটির জনপ্রিয়তা এবং ছয় দফা ও এগারো দফার প্রতি জনসমর্থনের বিষয়টিই প্রমাণ করে।

১.৩ *সংবাদ*

১৯৭০ সালের নির্বাচনে *সংবাদ* অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদের ন্যাপকে সমর্থন করে। পত্রিকাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদুল কবীর ন্যাপ প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।[৫৩] ফলে পত্রিকাটির নীতিতেও এর প্রভাব পড়ে। সামরিক শাসন জারির পর থেকে ১৯৭০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ন্যাপের উভয় অংশের বক্তৃতা বিবৃতি এবং ন্যাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করলেও সংবাদ প্রকাশের ধরন থেকেই

Dhaka University Institutional Repository

মোজাফ্ফর আহমেদের নেতৃত্বাধীন ন্যাপের প্রতি সমর্থনের বিষয়টি ছিল স্পষ্ট। ন্যাপের এই অংশটিকে পত্রিকাটি সবসময় মূলধারার ন্যাপ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে।[৫৪]

সংবাদ এ সময় ভবিষ্যৎ সংবিধান নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তব্যও নিয়মিত প্রকাশ করে। যেমন – পূর্ব পাকিস্তান জামায়াত-ই-ইসলামি'র সাধারণ সম্পাদক গোলাম আজম ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণয়ন করার পক্ষে এবং সংবিধান প্রশ্নে কনভেনশন আহ্বান করার ভাসানীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তব্য দিলে *সংবাদ* সেটি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে।[৫৫] ভাসানী ন্যাপ প্রথম থেকেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করার দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। ভাসানী ন্যাপের যারা নির্বাচন বিরোধী ছিলেন তারা নির্বাচন বয়কট করার দাবিতে সভা-সমাবেশ করতে থাকে। ন্যাপের অন্য অংশটি (মোজাফ্ফর) প্রথম থেকেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে আগ্রহী ছিল। পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বক্তব্য দেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে তার এই দাবি আরও জোরালো হয়। এ সময় *সংবাদ* প্রায় প্রতিদিনই মোজাফ্ফর আহমেদের 'গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্যবদ্ধ' হওয়ার আহ্বানকে উদ্ধৃত করে সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। যেমন – ১৯৭০ সালের ৫ জানুয়ারি সংখ্যায় পত্রিকাটি পল্টন ময়দানে ন্যাপের জনসভাকে ঐতিহাসিক আখ্যায়িত করে সংবাদ প্রকাশ করে। এছাড়া অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদের ১১ দফার ভিত্তিতে ঐক্যজোট গড়ে তোলার আহ্বানকে শিরোনাম করা হয়।[৫৬] ন্যাপের এই অংশটির লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগের সাথে জোটবদ্ধ ভাবে নির্বাচন করা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু জোট গঠনের বিরোধী ছিলেন। বিষয়টিকে ন্যাপ দলটির 'সংকীর্ণ রাজনীতি' বলে সমালোচনা করে যা *সংবাদ*-এ উঠে আসে।[৫৭]

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের পর ন্যাপের উভয় অংশ নির্বাচন সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখার দাবি জানালে *সংবাদ* বিষয়টির যৌক্তিকতা তুলে ধরে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৭০ সালের ২৯ নভেম্বর 'নির্বাচনের তারিখ' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে *সংবাদ* মন্তব্য করে:

> ... দুর্গত এলাকায় নির্বাচন স্থগিত রাখার ফলে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন সারাদেশে একযোগে অনুষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না। স্বাধীনতার তেইশ বছর পর অনুষ্ঠিত দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন এই অস্বাভাবিক পরিবেশে এবং খণ্ডখণ্ডভাবে অনুষ্ঠিত হউক ইহা কাহারও কাম্য হইতে পারে না। ... প্রেসিডেন্ট নিজেই বলিয়াছেন যে দুর্গত এলাকাগুলিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের অধিবেশন বসিবে না। ... কিন্তু প্রশ্ন হইল পরিষদের অধিবেশনই যদি না বসে তবে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এত তাড়াহুড়ো কেন?[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের আগ্রহের সমালোচনা করে বলে যে, দলটির আগ্রহের কারণেই শাসকগোষ্ঠী নির্বাচন পেছাতে চাননি। তবে পত্রিকাটি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নির্বাচনের আগের দিন ৬ ডিসেম্বর পত্রিকাটি ভেতরের পাতায় ন্যাপ প্রার্থীদের ছবি দিয়ে তাদের জয়যুক্ত করার আহ্বান জানায়।[৫৯] পাশাপাশি পত্রিকাটি নির্বাচনের দিন ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর 'একদিন সাফল্যের দিন : নবতর পরীক্ষার দিন' শিরোনামে একটি আবেগপূর্ণ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে আওয়ামী লীগের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়, "দেশের শাসনযন্ত্রে জনগণের অংশগ্রহণের প্রাথমিক পদেক্ষপ হিসেবে দেশবাসী সার্বজনীন ভোটাধিকার পাইয়াছে। এই সাফল্য অর্জন কোনো একটি দল বা বিশেষ কোনো মতাবলম্বী প্রতিষ্ঠানের একক অবদানের ফসল নহে।"[৬০] *সংবাদ* একই সাথে ভোটারদের 'সস্তা ভাবাবেগ' পরিহার করে প্রকৃত গণতন্ত্র কায়েম করার পেছনে যাদের ত্যাগ ও অবদান আছে তাদের ভোট দিয়ে জয়ী করার আহ্বান জানায়।

১.৪ *দৈনিক পাকিস্তান*

দৈনিক পাকিস্তান ট্রাস্ট মালিকানাধীন পত্রিকা হলেও উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি পত্রিকাটির যে পরিবর্তিত চরিত্র পরিলক্ষিত হয় সেটি এ পর্যায়েও অব্যাহত থাকে। পত্রিকাটি সরকারি হওয়ায় সরাসরি সরকার বিরোধী কোনো সম্পাদকীয় বা সংবাদ প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। ফলে পত্রিকাটি কিছুটা কৌশলের আশ্রয় নেয়। পত্রিকাটির সংবাদ প্রকাশের ধরন বাঙালি জনমতকেই প্রতিনিধিত্ব করেছিল। পাশাপাশি পত্রিকাটি এমন অনেক সংবাদ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে যেগুলো বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে অর্থবহ কিন্তু অন্যান্য পত্রিকা তা গুরুত্ব দেয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিটের অবসান হলে 'পশ্চিম পাঞ্জাব'- এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'পাঞ্জাব' কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলা' বা 'পূর্ব বাংলা' করা হয়নি। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু দিবসের আলোচনায় পূর্বাঞ্চলকে 'বাংলা' নামে পরিচিত করার ঘোষণা দেন। *দৈনিক পাকিস্তান তাঁর* বক্তব্য উদ্ধৃত করে পরদিন প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলামে সেটি প্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধু মন্তব্য করেন:

> এক সময় এ দেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকু চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। ... একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোনো কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুজিয়া

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায় নাই। ... আমি ঘোষণা করিতেছি – আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধু বাংলাদেশ।[৬১]

পত্রিকাটি বাঙালি অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে আসে। বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ করার দাবি জানালে *দৈনিক পাকিস্তান* ১৯৬৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর ১ম পৃষ্ঠার ২য় কলামে শিরোনাম করে, "রবীন্দ্র সংগীত প্রচারে যারা বাধা দিয়েছিল আজ তারা অপসারিত, যারা বাধা দেবে তারাও অপসারিত হবে ... মুজিব"[৬২] এভাবে কৌশলে পত্রিকাটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে সংবাদ প্রকাশ করে। *দৈনিক পাকিস্তান* আওয়ামী লীগের জনসভার যেসব সংবাদ প্রকাশ করে সেগুলোর আগে 'বিশাল জনসভা' বা এ ধরনের বিশেষণ ব্যবহার করে। যেমন – ১৯৭০ সালের ১২ জানুয়ারি পত্রিকাটি 'পল্টনের জনসমুদ্রে শেখ মুজিবের ঘোষণা জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায় করে নেবে' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে।[৬৩]

দৈনিক পাকিস্তান বিভিন্ন সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে প্রকারান্তরে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি প্রচারণায় সহায়তা করে। বিশেষ করে বামপন্থি বিভিন্ন দল ধর্মভিত্তিক ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিপক্ষে জোরালো অবস্থান রাখতে না পারায় বঙ্গবন্ধু একাধিক বক্তৃতায় ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সমালোচনা করেন। বঙ্গবন্ধু জামায়াত-ই-ইসলামি'র ধর্মের নামে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন। *দৈনিক পাকিস্তান*-এর সংবাদ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ১৯৬৯ সালের ১৯ জুলাই, ১৫ আগস্ট, ৯, ১০, ২৩ সেপ্টেম্বর এবং ১৯৭০ সালের ২ ও ৩০ জানুয়ারি পত্রিকাটি বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য উদ্ধৃত করে সংবাদ প্রকাশ করে। এসব খবর বাঙালি জনমতকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাফল্য এবং ধর্মভিত্তিক দলগুলোর ব্যর্থতা থেকেই উপলব্ধি করা যায়।

সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর লেখক ও সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করতে প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবিতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিবাদ সমাবেশের খবর সরকারি পত্রিকা হয়েও *দৈনিক পাকিস্তান* নিয়মিত প্রকাশ করতে থাকে। ১৯৭০ সালের ১৫ জানুয়ারি পত্রিকাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় প্রেস অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবিতে অনুষ্ঠিত সমাবেশের খবর প্রকাশ করে।[৬৪] একইভাবে পত্রিকাটি পরদিন শিরোনাম করে, 'শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রতিবাদ সভা মিছিল প্রেস অর্ডিন্যান্স বাতিল ও সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের দাবী'।[৬৫] পত্রিকাটি এই নীতি বজায় রাখে এবং রেডিও-টেলিভিশনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তব্য প্রচারের উদ্যোগকে 'সংগ্রামী জনতার বিজয়' বলে উল্লেখ করে।[৬৬]

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের আগেই ১৯৭০ সালের ২৪ নভেম্বর মওলানা ভাসানীর উদ্ধৃতি দিয়ে *দৈনিক পাকিস্তান* স্বাধীনতার ধারণাও প্রকাশ করে। ৪ কলামব্যাপী প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ'[৬৭]। *দৈনিক পাকিস্তান*-এর সবচেয়ে সাহসী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭০ সালে ১২ নভেম্বরের পর। পত্রিকাটি সরকারি মালিকানাধীন হওয়ার পরও ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সরকারি ব্যর্থতার সমালোচনা করে প্রাণহানির জন্য সরাসরি সরকারকে দায়ী করে। ১৯৭০ সালের ১৯ নভেম্বর সম্পাদকীয় কলামে পত্রিকাটি মন্তব্য করে:

> ... এদের মৃত্যুর জন্য প্রকৃতিকে নিশ্চয়ই দায়ী করা যেতে পারে না। ... এদের মৃত্যুও মেন-মেড। ... রিলিফ কমিশনার স্বীকার না করলেও ইতিমধ্যেও যে তাদের গাফেলতির জন্য বেশ কিছু সংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছে – একটু সহৃদয় চেষ্টা চালালেই তাদের বাঁচানো অসম্ভব ছিল না।[৬৮]

নির্বাচনের পরদিন ৮ ডিসেম্বর পত্রিকাটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বাঙালি জনগণকে সাধুবাদ জানায়। এভাবে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে *দৈনিক পাকিস্তান*-এর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

১.৫ অন্যান্য

ক. *পাকিস্তান অবজারভার*

পাকিস্তান অবজারভার প্রথম থেকেই নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান নেয় এবং আইন কাঠামো আদেশের প্রশংসা করে। পত্রিকাটির মালিক হামিদুল হক চৌধুরী ছিলেন রাজনৈতিক ভাবে আওয়ামী লীগ বিরোধী। তিনি ছিলেন ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের সমর্থক যেটি পরবর্তী সময়ে তার মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থান থেকে বের হয়ে আসে।[৬৯] পত্রিকাটি উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র সমাজের আন্দোলনেরও বিরোধী ছিল।[৭০] ফলে ছয় দফা ও এগারো দফাকে পত্রিকাটি সরাসরি সমর্থন বা বর্জন কোনোটি করেনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা মামলা থেকে মুক্ত হওয়ার পর ছয় দফা বাস্তবায়ন করতে না পারার জন্য ১৯৬৯ সালের ১৪ মার্চ ঢাকায় যেসব অসহযোগীর নাম ঘোষণা করেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হামিদুল হক।[৭১]

১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি পত্রিকাটিতে উঠে আসে। এক্ষেত্রে দুটো সংবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়। ভাসানী পূর্ব বাংলায় বন্যার প্রেক্ষিতে নির্বাচন পেছানোর এবং ভোটের আগে ভাতের দাবি করে বক্তব্য দিলেও তার বক্তব্যের একটি ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ১৯৭০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয়। 'Bhasani Not Against Polls' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভাসানীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়, "We shall participate in the elections as a part of our struggle to realise peoples demands and not to go to power"[৭২] পাশাপাশি পত্রিকাটি ঐ সময় দেওয়া বিভিন্ন শ্লোগানও প্রকাশ করে যেখানে বলা হয়, "Bhoter age bhater neta – Maulana Bhashani (Leader that demands food before polls – Maulana Bhasani), Kick the ballot box"[৭৩]

নির্বাচনের ঠিক আগেই ৫ ডিসেম্বর পত্রিকাটি পল্টন ময়দানে ন্যাপের (ভাসানী) সমাবেশের খবর প্রকাশ করে। ঐ সমাবেশে লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম (Autonomous and Sovereign) পূর্ব পাকিস্তান দাবি করা হয় বলে *পাকিস্তান অবজারভার* উল্লেখ করে।[৭৪] তবে পত্রিকাটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সবসময়ই ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করে। পূর্ব পাকিস্তানে বন্যাজনিত কারণে অক্টোবর মাসের অনুষ্ঠিত নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হলে বিষয়টিকে *পাকিস্তান অবজারভার* স্বাগত জানায়। কোনোভাবেই যেন নির্বাচন বাধাগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে নির্বাচনের দিন 'A Date with Destiny' শিরোনামে পত্রিকাটি একটি নির্দেশনামূলক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয় কলামে মন্তব্য করা হয়, "…the country is clam and in an expected mood. Let us hope and pray that this clam will continue today and through the days to come …We cannot, we must not, let anything happen that can make the elections infructous."[৭৫]

খ. *মর্নিং নিউজ*

সরকারি মালিকানাধীন ইংরেজি দৈনিক *মর্নিং নিউজ* এর ভূমিকা ছিল বিশেষত্বহীন। *দৈনিক পাকিস্তান* সরকারি পত্রিকা হয়েও বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে পরোক্ষভাবে যে কৌশলী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় *মর্নিং নিউজ* তা পারেনি বা সে চেষ্টাও পত্রিকাটি করেনি। পত্রিকাটির সংবাদ বিশ্লেষণ করে ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপের প্রতি সমর্থন কিছুটা দৃষ্টিগোচর হয়। ন্যাপের অপর অংশ (মোজাফ্ফর) সম্পর্কে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পত্রিকাটি প্রকাশ করেনি। তাছাড়া ভাসানীকেই সমগ্র ন্যাপের সভাপতি এবং তার নেতৃত্বাধীন দলটিকেই মূলধারার ন্যাপ হিসেবে প্রচার করার চেষ্টা ছিল লক্ষণীয়। যেমন – ১৯৬৯ সালের ১১ আগস্ট ভবিষ্যৎ সংবিধান নিয়ে ভাসানীর জাতীয় কনভেনশন আহ্বান করার বিষয়ে পত্রিকাটি মন্তব্য করে, "Addressing a press conference the NAP chief, however announced the postponement of the all-party convention he had called to discuss the constitutional issues and other problems facing the people."[৭৬]

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহিয়া খানের বক্তব্যের সাথে মিল আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এমন সব দাবি *মর্নিং নিউজ* প্রকাশ করলেও অবশিষ্ট অনেক কিছুই তারা এড়িয়ে গেছে। যেমন – বঙ্গবন্ধু প্রাপ্ত বয়স্ক ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানালে পত্রিকাটি সেটি প্রকাশ করে কিন্তু ছয় দফা ও এগারো দফা ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি, ন্যাপ (মোজাফ্ফর) এর এগারো দফা কিংবা প্রেস অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করার দাবিতে সাংবাদিক ও লেখকদের প্রতিবাদ সমাবেশের খবর পত্রিকাটি সম্পূর্ণভাবেই এড়িয়ে গেছে। নির্বাচনের পরদিন পত্রিকাটি শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

গ.*দৈনিক পূর্বদেশ*

হামিদুল হক চৌধুরীর মালিকানাধীন বাংলা পত্রিকা ছিল *পূর্বদেশ*। ফলে পত্রিকাটির নীতির সাথে *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার নীতিগত মিল পাওয়া যায়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে পত্রিকাটি সব রাজনৈতিক দলের প্রচারণার খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। তবে পত্রিকাটির ডানপন্থি অবস্থানের বিষয়টি কিছু কিছু সংবাদ ও সম্পাদকীয় থেকে উপলব্ধি করা যায়। ভাসানী ১৯৭০ সালের নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর কৌশল হিসেবে গ্রামে গ্রামে চোর ডাকাত ধরার মত বিভিন্ন অরাজনৈতিক কর্মসূচি দেওয়ার ঘোষণা দেন। বিষয়টিকে অভিনন্দিত করে *পূর্বদেশ* মন্তব্য করে, "যে-কোনো কারণেই হোক, মাওলানা সাহেবের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি পরিবর্তনের যে লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা স্থায়ী হলে আমরা তাকে অবশ্যই দেশের জন্য আশাব্যাঞ্জক মনে করি।"[৭৭]

পূর্বদেশ পত্রিকার বঙ্গবন্ধুকে বিরোধিতার বিষয়টি সামনে চলে আসে ১৯৭০ সালের ২ জুন 'এটা সত্য নয়' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয় থেকে। এতে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ এনে মন্তব্য করা হয়, "প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সভা সমিতিতে শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতারা বলতে শুরু করেছেন, আইয়ুব সরকারের পতনের জন্য একমাত্র তারাই আন্দোলন করেছেন। রাজনৈতিক সুবিধা লোটার দিক থেকে এটা যতই লাভজনক প্রচারণা হোক না কেন, আদপেই কিন্তু কথাটা সত্য নয় বরং ঐতিহাসিক সত্যের মস্ত বড় অপলাপ"[৭৮] পত্রিকাটির 'তৃতীয় মত' কলামে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে স্থূলভাবে বঙ্গবন্ধুর ধারাবাহিক সমালোচনা করা হয়। তবে ১২ নভেম্বরের (১৯৭০) ঘূর্ণিঝড়ের পর *পূর্বদেশ* মর্মস্পর্শী বিবরণ তুলে ধরে এবং পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে প্রকারান্তরে পাকিস্তানি শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনমতকে সংগঠিত করে। পত্রিকাটি পাকিস্তানি নেতাদের ছবি দিয়ে শিরোনাম করে, 'ওরা কেউ আসেনি'[৭৯]

Dhaka University Institutional Repository

ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত খবর বাঙালিদের মধ্যে কঠোর আলোড়ন সৃষ্টি করে যার প্রভাব ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাওয়া যায়। নির্বাচনের পর পরাজিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিযোগের জবাবে পত্রিকাটি দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার পর সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়াকেই গুরুত্ব দেয়।

ঘ. বামপন্থি পত্রিকা

বামপন্থি পত্রিকাগুলো মূলত সাপ্তাহিক। যদিও আলোচ্য গবেষণায় শুধুমাত্র দৈনিক পত্রিকা বিবেচনায় আনা হয়েছে, কিন্তু ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও পরবর্তী ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় ঢাকার সাপ্তাহিক *হলিডে* ও *গণশক্তি* পত্রিকাকেও বিবেচনায় আনা হলো। *গণশক্তি* পত্রিকায় নির্বাচনের একদিন আগে ৬ ডিসেম্বর 'পূর্ব বাংলার মুক্তিকামী জনগণ সতর্ক হও' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে আওয়ামী লীগ ও ছয় দফার সমালোচনা করা হয়।[৮০]

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হওয়ার পরও এই সমালোচনা অব্যাহত থাকে। *সাপ্তাহিক হলিডে* পত্রিকায় 'Will Democracy be Restored' শিরোনামে বামপন্থি নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডকে পেটি বুর্জোয়াদের সাথে তুলনা করেন।[৮১]

ঙ. উগ্র ডানপন্থি পত্রিকা - *দৈনিক সংগ্রাম*

জামায়াত-ই-ইসলামির মুখপত্র *দৈনিক সংগ্রাম* নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে অবস্থান নিলেও পত্রিকাটিতে আওয়ামী লীগের সমালোচনামূলক বিভিন্ন সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। যেমন - নির্বাচনের আগে ১৯৭০ সালের ১০ নভেম্বর পত্রিকাটি আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে মন্তব্য করে, "আওয়ামী লীগ হিংস্র কর্মপন্থার অনুসরণ করে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কণ্ঠ রুদ্ধ করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে"।[৮১(ক)] পরবর্তী সময়ে জামায়াত ও অন্যান্য ইসলামি দলগুলোর ভরাডুবির প্রেক্ষিতে *দৈনিক সংগ্রাম* নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করে নির্বাচনি ফল সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে।[৮১(খ)]

২.ক্ষমতা হস্তান্তরে ষড়যন্ত্র

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর পশ্চিম পাকিস্তান গণতন্ত্র চর্চা ও বিকাশে কতটুকু আন্তরিক এবং নিষ্ঠাবান তা নিয়েই নির্বাচনোত্তর ঘটনা প্রবাহিত হতে থাকে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নটি আসতেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে যুক্ত হয়। বাঙালিরা পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় আসবে বিষয়টি পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। তবে এই নির্বাচন ছিল অবাধ ও সুষ্ঠু। মূলত পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই সামরিক সরকার একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন দেওয়ার সাহস করে। তাদের ধারণা ছিল পিডিপি, মুসলিম লীগ, জামায়াত-ই-ইসলামি প্রমুখ ডানপন্থি দল নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করবে।[৮২] কিন্তু নির্বাচনি ফলে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় বাঙালি জনমতের বিরুদ্ধে মুখ্য ভূমিকা পালন করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী। এর সাথে যুক্ত হন পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে বাঙালিরা ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্র সহজেই উপলব্ধি করতে পারে।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরাও এই ষড়যন্ত্রের বিপক্ষে সচেতন ভূমিকা পালন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি পত্রিকাই সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর ভূমিকাকে ১৯৭১ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ এই দুই ভাগে বিশ্লেষণ করা হলো।

ক. জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

দৈনিক পাকিস্তান

নির্বাচনের পর ১৯৭১ সালের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাস জুড়েই ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়ন করার বিষয়ে বিভিন্ন দলের মতামত ও বক্তৃতা বিবৃতি পত্রিকাগুলো প্রকাশ করতে থাকে। সরকারি পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান* ধারাবাহিক ভাবে এসব খবর প্রকাশ করেছে। পত্রিকাটির সংবাদ প্রকাশের ধরন থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি এর সমর্থন স্পষ্ট হয়। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ নেন এবং ঘোষণা করেন যে ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'[৮৩] রবীন্দ্র সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। এই শপথ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পত্রিকাটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। এতে পূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের শিল্পপতি জহুরুল ইসলাম নিজের নামে বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় বঙ্গবন্ধু দাবি আদায়ে রক্ত দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে সবাইকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।[৮৪]

১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু-ইয়াহিয়া বৈঠকের খবর *দৈনিক পাকিস্তান* গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। বৈঠকের শেষে ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে তিনি সেটা অস্বীকার করেন।[৮৫] এই সংবাদ অবাঙালি নেতৃত্বের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বাঙালি জনগণকে সচেতন করে তোলে।

১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসের মত ফেব্রুয়ারি মাসেও *দৈনিক পাকিস্তান* ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভবিষ্যৎ সংবিধান নিয়ে সংবাদ প্রকাশ অব্যাহত রাখে। এ সময় বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর বিভিন বক্তৃতা বিবৃতি *দৈনিক পাকিস্তান* তুলে ধরে। ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমিতে ভাষা আন্দোলনের স্মরণসভায় বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য পত্রিকাটি প্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধু মন্তব্য করেন, "একদিন বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলা যেত না। কিন্তু আজ এই জাতীয়তাবাদ সত্য, আয়নার মত সত্য"।[৮৬]

ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই বিভিন্ন সংগঠন ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে সন্দেহের কথা জানিয়ে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য দিতে শুরু করে। বাঙালি যে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত এই খবরাখবর *দৈনিক পাকিস্তান*-এ প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকাটি ১৭ ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) এর স্বাধীনতার দাবি প্রকাশ করে। সংগঠনটি ১৪ ফেব্রুয়ারি জরুরি কাউন্সিলে স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে বলে, "৫ পাকিস্তানের যে মূল পাঁচটি ভাষাভাষী জাতির অবস্থান উহাদের সকলকে পাকিস্তান ফেডারেশন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের অধিকার দিতে হইবে"।[৮৭]

পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের নেতারা ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর কাছে ছয় ও এগারো দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নে সমর্থনের কথা জানান। এ বিষয়ে *দৈনিক পাকিস্তান* ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারির ১৩, ১৯, ২০, ২৩ তারিখে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।[৮৮] ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল হওয়া সংক্রান্ত একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি *দৈনিক পাকিস্তান* 'সর্বশেষ খবর' কলামে প্রকাশ করে যে, ৩ মার্চ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে এবং তা স্থগিত হবে না। পত্রিকাটি আরও উল্লেখ করে পশ্চিম পাকিস্তানের সকল দলই অধিবেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, এমনকি ভুট্টোর পিপলস পার্টিও সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করছে বলে পত্রিকাটি উল্লেখ করে।[৮৯] ক্ষমতা হস্তান্তর,

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যৎ সংবিধান ও জাতীয় পরিষদের অধিবেশন নিয়ে যখন চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে সে সময় *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকার সংবাদ থেকে জানা যায় যে, ২৭ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে খসড়া সংবিধান পেশ করা হয় যেটি পাঠ করে শোনান ড. কামাল হোসেন।[৯০] এই সাংবিধানিক অগ্রগতির খবর স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালি জনগণকে অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।

আজাদ

১৯৭১ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে *আজাদ* একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। তবে পত্রিকাটি তার সাম্প্রদায়িক নীতি থেকে বের হতে কিছুটা সময় নেয়। এই সাম্প্রদায়িক নীতির প্রমাণ পাওয়া যায় নির্বাচনের আগেই করাচি টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে সোভিয়েত নেতা লেনিনের জন্মবার্ষিকীতে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারের সমালোচনা করে প্রকাশিত সম্পাদকীয় থেকে। *আজাদ* ঐ সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে, "... বস্তুসর্বস্ব সমাজতান্ত্রিক নেতা তৌহিদবাদী পাকিস্তানি জনগণের আদর্শ হইতে পারে না"।[৯১] এ পরিস্থিতিতে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে *আজাদ* আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি উভয় দলকেই সহযোগিতার ভিত্তিতে গণতন্ত্র হেফাজত করার দাবি জানিয়ে খবর ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। পত্রিকাটির ১৩ ও ২০ ডিসেম্বর যথাক্রমে 'নির্বাচনের ফলাফল ও প্রেসিডেন্টের পাঁচ দফা' এবং 'গণতন্ত্রের জয়' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়গুলোর বিষয়বস্তু ছিল এটি।[৯২]

তবে ১৯৭১ সালের শুরু থেকেই *আজাদ* সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ তথা বাঙালি জনমতের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে শুরু করে। রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণের প্রশংসা করে পত্রিকাটি ৬ জানুয়ারি 'শেখ মুজিবুর রহমানের অভিভাষণ' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এক সময় ছয় দফার সমালোচনা করলেও নির্বাচনে ছয় দফার প্রতি জনগণের সমর্থনকে গুরুত্ব দিয়ে *আজাদ* তার নীতিতে পরিবর্তন আনে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হওয়ার পরও বঙ্গবন্ধুর ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনায় দৃঢ়চেতা মনোভাব এবং সকলের সাথে সহযোগিতা করার নীতির প্রশংসা করে *আজাদ* মন্তব্য করে, "জনগণের রায়ে একদিন যাহা নবীন সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাই বিরাট জনসমাবেশের পরিমণ্ডলে নূতনতর তাৎপর্যে নন্দিত হইয়াছে"।[৯৩]

এর পরের কয়েকদিন *আজাদ* মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টো বৈঠক নিয়ে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। *আজাদ* সাংবিধানিক সংকট নিরসন ও ক্ষমতা হস্তান্তর দ্রুততর করতে আওয়ামী লীগকেই উদ্যোগী হয়ে ভুট্টোর সাথে

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনার প্রস্তাব উত্থাপন করে। পাশাপাশি পত্রিকাটি যুক্তি দিয়ে তুলে ধরে যে, পাকিস্তান পিপলস পার্টিকে অগ্রাহ্য করার অর্থ সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে অগ্রাহ্য করা নয়।[৯৪]

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে *আজাদ* পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য বিশেষ করে প্রতিরক্ষা ও সামরিক খাতে বৈষম্যের দিকটি নিয়ে ১৯৭১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি 'দেশরক্ষা ব্যবস্থা ও পূর্ব পাকিস্তান' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।[৯৫] কিন্তু ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে কোনো সমঝোতা না হওয়ায় *আজাদ* উদ্বেগ প্রকাশ করে 'উদ্বেগজনক পরিস্থিতির অবসান হউক' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে প্রেসিডেন্টের উদ্যোগে পরিচালিত সমঝোতার সাফল্যের প্রতি আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। ভবিষ্যতের প্রতি আশংকা জানিয়ে *আজাদ* মন্তব্য করে, "পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখা অথবা অধিবেশন চলাকালে কোনোরূপ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতে দেওয়া কোনো দিক হইতেই সঙ্গত হইবে না"।[৯৬]

ইত্তেফাক

পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান এবং ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে ১৯৭১ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস জুড়েই *ইত্তেফাক* সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে পত্রিকাটি পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃত্ব বিশেষ করে ভুট্টোর বিভিন্ন অজুহাতে পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার বিষয়টি সামনে নিয়ে আসে। ভুট্টো ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার কারণ হিসেবে ভারত ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসলে *ইত্তেফাক* ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানায়, "পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ বলেন যে, আওয়ামী লীগের ছয় দফার ব্যাপারে আপোষ বা পুনর্বিন্যাসের আশ্বাস পাওয়া না গেলে তার দল জাতীয় পরিষদের আসন্ন ঢাকা অধিবেশনে যোগদান করতে পারবেনা। ... ভারতের শত্রুতা এবং ছয় দফা না মানার ফলে ঢাকায় তাদের অবস্থান হবে ডবল জিম্মির শামিল"।[৯৭]

খ. মার্চ (১-২৫ মার্চ)

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শুরু থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান ও অন্যান্য কয়েকটি দলের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার অজুহাত দিয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এডমিরাল আহসানকে পদচ্যুত করে লে. জে. সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োগ করা হয়। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে জারি করা হয় ১১০ নং সামরিক বিধি যেখানে বলা হয়, "পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ছবি, খবর, অভিমত, বিবৃতি, মন্তব্য প্রভৃতি মুদ্রণ বা প্রকাশ করা থেকে সংবাদপত্রসমূহকে বারণ করা হচ্ছে। এই আদেশ লংঘন করা হলে ২৫ নং সামরিক বিধি জারি করা হবে যার সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড"।[৯৮]

নির্বাচনের পর ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো কিছুটা নমনীয় সুরে কথা বললেও এ পর্যায়ে পত্রিকাগুলো তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। পত্রিকাগুলো এ সময় একযোগে দমনমূলক সামরিক আইনের বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ছবি, সংবাদ, সম্পাদকীয়, বিশেষ নিবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ করতে থাকে। মার্চের প্রথম দিনই *ইত্তেফাক, আজাদ* ও *সংবাদ* বঙ্গবন্ধুকে উদ্ধৃত করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ও ক্ষমতা হস্তান্তর করার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধু ভুট্টোকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করেছিলেন, "৮৩ জন সদস্য নিয়ে আপনি যদি ঢাকা আসতে না চান, ১৬০ জন সদস্য নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আমরাও যদি বলি, আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে যাব না, তখন কি হবে?"[৯৯] পাশাপাশি ২ মার্চ থেকে পত্রিকাগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি প্রকাশ করতে থাকে। ঐ তারিখের *ইত্তেফাক, সংবাদ* ও *আজাদ* থেকেই জানা যায় যে ঢাকা পরিণত হয়েছিল মিছিলের শহরে। ঐ দিন *ইত্তেফাক* 'জনতার সংগ্রাম চলবেই' শিরোনামে চেতনাসমৃদ্ধ আবেদন জানিয়ে একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।[১০০] *সংবাদ* 'অধিবেশন স্থগিত, নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদ' এই নিয়মিত সংবাদের পাশাপাশি 'মিছিলের নগরী ঢাকা' শীর্ষক একটি বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করে। এখানে বাঙালিদের প্রতি সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, 'এসো জনতার ঐক্যে, এসো মুখরিত সখ্যে'।[১০১] সরকারি পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান* সরকারের সমালোচনা করে অধিবেশন স্থগিত করাকে 'হতাশাব্যঞ্জক' বলে মন্তব্য করে। পাশাপাশি পত্রিকাটি ভুট্টোর দাবিকে 'কৌতুকপ্রদ' বলে অভিহিত করে। পত্রিকাটি ঢাকা শহরে হরতাল পালন উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠনের কর্মসূচির বিবরণ প্রকাশ করে।[১০২]

২ মার্চ বাঙালিদের প্রতিবাদ মিছিলে গুলিবর্ষণ করা হয়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় অনেকেই পত্রিকা অফিসগুলোতে আশ্রয় নেয়। *ইত্তেফাক* অফিসে গুলিবিদ্ধ ২ জন, *দৈনিক পাকিস্তান* কার্যালয়ে স্টেডিয়াম এলাকায় কারফিউ চলাকালে গুলিবিদ্ধ ৩ জন, *সংবাদ* অফিসে ২ জন এবং *মর্নিং নিউজে* গুলিবিদ্ধ ২ জনকে মিছিলকারীরা রেখে যায়।[১০৩]

৩ মার্চ পত্রিকাগুলো হরতাল ও নিহতের খবর এবং ছবি প্রকাশ করে। *ইত্তেফাক* স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালনের খবর নিয়ে শিরোনাম করে 'বিক্ষুব্ধ নগরীর ভয়াল গর্জন – আমি শেখ মুজিব বলছি'।[১০৪] ৩ মার্চের *সংবাদ*

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি নিয়ে। বঙ্গবন্ধুকে উদ্ধৃত করে পত্রিকাটি শিরোনাম করে, 'আজ জাতীয় শোক দিবস(শেখ মুজিবের আহ্বান)'।[১০৫] মার্চের ৩ তারিখে *দৈনিক পাকিস্তান* বিভিন্ন সংগঠনের কর্মসূচি নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে মন্তব্য করে, "...আজ নব নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরুর যে কথা ছিল তা স্থগিত রাখা হয়েছে। এবং এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারা বাংলায় হরতাল পালিত হচ্ছে। ভোর ৬ টা থেকে বেলা ২ টা পর্যন্ত এই হরতাল"।[১০৬] সরকারি পত্রিকা হলেও *দৈনিক পাকিস্তান* 'বঙ্গবন্ধু' এবং 'সারা বাংলায়' শব্দের প্রয়োগ করে যেটি ছিল অনন্য। মার্চের ৪, ৫ ও ৬ তারিখেও *দৈনিক পাকিস্তান* এভাবে কর্মসূচির খবর প্রকাশ করে। পত্রিকাগুলো এ সময় নিয়মিতভাবে মিছিলের স্লোগান প্রকাশ করতে থাকে। যেমন - ৩ মার্চ *দৈনিক পাকিস্তান* একটি প্রতিবেদনে মন্তব্য করে, "... ছাত্র জনতা ও শ্রমিকেরা কারফিউর বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলে কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। তাদের শ্লোগান ছিল, 'সান্ধ্য আইন মানি না', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর – বাঙলাদেশ স্বাধীন কর'।"[১০৭]

সংবাদ এবং *আজাদ* ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর উদ্ধৃতি দিয়ে বাঙালির স্বাধীনতার দাবি তুলে ধরে। বঙ্গবন্ধুর ২ মার্চের বিক্ষোভ সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেন, "...বাঙালিরা আর নির্যাতিত হতে রাজি নয় এবং তারা একটি 'স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক' হতে দৃঢ় সংকল্প"।[১০৮]

৪ মার্চ আন্দোলন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের সময় নিহতের ঘটনা নিয়ে ছবি, খবর ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে অধিকাংশ পত্রিকা। *ইত্তেফাক* 'ক্ষান্ত হউন' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে গুলিবর্ষণ ও নিহত হওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে মন্তব্য করে, "ঊনসত্তরের ফেব্রুয়ারী-মার্চের ন্যায় একাত্তরের মার্চেও আবার গুলী চলিয়াছে, কার্ফু জারী হইয়াছে, আবার আগুন জ্বলিয়াছে, আবার জনতা পথে নামিয়াছে, জনসমুদ্রে আবার জাগিয়াছে প্রবল জলোচ্ছাস আর উত্তাল ঊর্মিমালা।"[১০৯] পত্রিকাটি বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জয়ী হওয়ার সংকল্প জানিয়ে বলে, "অতীতে আমরা বহুবার বলিয়াছি, আজও বলিতেছি, মানুষের গণতান্ত্রিক স্বাধিকারের দাবী দাবাইয়া রাখার ক্ষমতা বন্দুকের গুলী কেন, পারমাণবিক বোমারও নাই"। *ইত্তেফাক*-এর পাশাপাশি *দৈনিক পাকিস্তান* ও *সংবাদ* ৪ মার্চ নিহত হওয়ার খবরকে শিরোনাম করে। *দৈনিক পাকিস্তান* বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের একটি বিবৃতি প্রকাশ করে।[১১০]

আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারের দমনপীড়ন যতই কঠোর হতে থাকে পত্রিকাগুলো ততই তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। ৫ মার্চ *ইত্তেফাক* 'জয় বাংলার জয়' শিরোনামে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে মন্তব্য করে, "ক্ষমতার দুর্গ নয়, জনগণই দেশের সত্যিকার শক্তির উৎস, বাংলাদেশের বিগত তিনদিনের ঘটনাবলী তাহাই

Dhaka University Institutional Repository

নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করিয়াছে।"[১১১] ৫ তারিখেই বেতার-টেলিভিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রদেশের বিশজন শিল্পীর একটি যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়। সরকারি কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থক *দৈনিক পাকিস্তান* পুলিশের নির্যাতনে আহতদের বাঁচানোর আকুতি জানিয়ে ৫ মার্চ 'আহতদের বাঁচান' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। পাশাপাশি পত্রিকাটি ঢাকার হরতাল পরিস্থিতি নিয়েও প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে – "... মানুষ নেই অফিস আদালতে ... বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা যেন ভেঙ্গে পড়েছে" এই মন্তব্য থেকে হরতাল পালনের স্বতঃস্ফূর্ত চিত্রটি প্রকাশ পায়।[১১২] এ সময় সংবাদপত্র শিল্পের সাথে জড়িত কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে একাগ্রতা ঘোষণা করেন। বিশেষ করে সাংবাদিক ইউনিয়ন, সাংবাদিক সমাজ, সংবাদপত্র হকার সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন সংগঠন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেয়। ঢাকার পত্রিকাগুলো নিয়মিতভাবে এসব আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। যেমন - *ইত্তেফাক* ৬ মার্চ তারিখের সংখ্যায় সাংবাদিক ইউনিয়নের তৎকালীন সভাপতি আলী আশরাফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশের খবর প্রকাশ করে। এ সময় সাংবাদিক সংগঠনগুলো সরকার বা মালিকপক্ষ থেকে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে বাধা দেওয়া হলে সেটি লঙ্ঘন করার ঘোষণা দেয়।[১১৩] হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে *আজাদ* এ সময় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ৬ মার্চ 'রক্তপাত বন্ধ কর' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে বলা হয়, "জনমনের বজ্রকঠিন সংকল্পের চূড়ায় আঘাতকে যত কঠিন করিয়াই তোলা হক না কেন, তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হইতে পারে না। ... জনসাধারণ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর – এই দুইটির কোনোটির জন্যই অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করিতে রাজী নয়"।[১১৪]

৭ মার্চ *সংবাদ* সফলভাবে হরতাল পালন করায় 'বীর জনগণের প্রতি অভিনন্দন' শিরোনামে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে মন্তব্য করে, "পরিষদের অধিবেশন বসুক আর নাই বসুক এই আন্দোলন বন্ধ হইবে না। জনগণের যে কোন দাবি একমাত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই অর্জিত হইতে পারে, আপোষ বা আত্মবিক্রয়ের পথে নয়"।[১১৫] *সংবাদ*-এর ঐ দিনের সংখ্যায় ন্যাপ, ছাত্রলীগ, উদীচিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের আন্দোলনের খবর প্রাধান্য পায়। ৭ মার্চ সংখ্যায় *দৈনিক পাকিস্তান*-এর প্রতিবেদনের ভাষা ছিল কিছুটা ব্যতিক্রমী। পত্রিকাটি সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'বাঙলা ছাড়ো' কবিতার মাধ্যমে নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরে। কবিতার অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

> রক্তচোখের আগুন দেখে ঝলসে যাওয়া আমার বছরগুলো
> আজকে যখন হাতের মুঠোয় কণ্ঠনালীর খুন পিয়াসী ছুরি
> কাজ কি তখন আগলে রেখে বুকের কাছে কেউটে সাপের ঝাঁপি

Dhaka University Institutional Repository

আমার হাতেই নিলাম আমার নির্ভরতার চাবি

তুমি আমার আকাশ থেকে সরাও তোমার ছায়া

তুমি বাঙলা ছাড়ো ...[১১৬]

এই কবিতায় কবি প্রতিবাদের তীব্রতর ভাষা প্রয়োগ করে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালি জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। একইদিন *দৈনিক পাকিস্তান* বঙ্গবন্ধুর জনসভা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে বলা হয়, "আজ বেলা ২ ঘটিকায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। জনসভায় শেখ সাহেব গতকল্যকার প্রেসিডেন্টের ভাষণের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে"।[১১৭] ঐ দিন *আজাদ* হত্যা ও গুলিবর্ষণ বন্ধে আতাউর রহমানের বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়ে খবর প্রকাশ করে।[১১৮]

৮ মার্চ ঢাকার প্রায় সবকটি পত্রিকা ভাষণরত শেখ মুজিবুর রহমান এবং জনগণের বিশাল ছবি প্রকাশ করে। ঐ দিন *আজাদ* শিরোনাম করে 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম', 'অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন চলিবে'[১১৯] তবে *সংবাদ* বা *ইত্তেফাক* বঙ্গবন্ধুর পুরো ভাষণটি প্রকাশ করেনি। এটি সম্পূর্ণ প্রকাশ করে *পূর্বদেশ*। পত্রিকাটি ৮ মার্চ শেষের পাতায় 'সামরিক আইন প্রত্যাহার কর' শিরোনামে পুরো ভাষণটি প্রকাশ করে।[১২০]

মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন সর্বাত্মক রূপ লাভ করে এবং সরকারি, আধা সরকারি, ব্যাংক বীমা সহ সকল প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকে। ঢাকার পত্রিকাগুলোও তাদের সম্পাদকীয় ও খবরের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকার করে নেয়। ৮ মার্চ *সংবাদ*-এ প্রকাশিত 'কর্মচারীদের কাজ বর্জন : ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র বন্ধ' শিরোনামে প্রতিবেদন থেকে এই সত্যটি স্পষ্ট হয়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে *আজাদ* 'একমাত্র পথ' শিরোনামে ৮ মার্চ প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে ভুট্টোর সমালোচনা করার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য যে চারটি শর্ত দিয়েছেন তার প্রতি সমর্থন জানানো হয়।[১২১]

দৈনিক পাকিস্তান কিছুটা কৌশলী হয়ে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের আইনগত দিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। পত্রিকাটি বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে ১০ মার্চ প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে:

> গত ৭ মার্চ তারিখে রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় পরিষদে যোগদানের প্রশ্ন বিবেচনার জন্য যে চারটি শর্ত উল্লেখ করিয়াছেন আইনগত দিক হইতেও সেগুলি পূরণ করা সম্ভব বলিয়া বিশেষজ্ঞ মহল মতামত

Dhaka University Institutional Repository

দিয়াছেন। কাজেই আমরা আশা করি যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং তাঁহার সরকার কাল বিলম্ব না করিয়া বর্তমান সংকট দূর করার জন্য কার্যকর পন্থা উদ্ভাবন করিবেন।[১২২]

পাশাপাশি ১০ মার্চ পত্রিকাটি 'আর দেরী নয়' শীর্ষক সম্পাদকীয় কলামে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমেই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে জানায়।[১২৩] *আজাদ* বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে দেওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের মন্তব্য তুলে ধরে। যেমন – ১০ মার্চ সংখ্যায় আজগর খানের মন্তব্য প্রকাশিত হয়।[১২৪]

বাংলাদেশের বাইরেও এ সময় স্বাধীনতার দাবিতে জনমত সংগঠিত হতে থাকে এবং ঢাকার সংবাদপত্রগুলো বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে। যেমন – *ইত্তেফাক* ৯ মার্চের সংখ্যায় উল্লেখ করে যে ২৮ ফেব্রুয়ারি লন্ডনে বাঙালি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, লন্ডন আওয়ামী লীগ ও মুক্তিফ্রন্ট পাকিস্তান হাইকমিশনের সামনে দিবা-রাত্রি অবস্থান ধর্মঘট পালন করে, পাকিস্তানের পতাকা ও ইয়াহিয়ার ছবি পুড়িয়ে দেয় এবং স্বাধীন বাংলার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে।[১২৫]

ইত্তেফাক ধীরে ধীরে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তার অবস্থান আরও দৃঢ় করে। পত্রিকাটি ১১ মার্চ সংখ্যায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের জরুরি সভায় 'স্বাধীন বাংলাদেশ' ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন করার খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। পাশাপাশি ঐ দিন পত্রিকাটি নিজেদের অবস্থান জানিয়ে 'স্বাধীকার সংগ্রাম ও দায়িত্ব' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। *ইত্তেফাক* ছাড়াও *সংবাদ* ও অন্যান্য পত্রিকার ১১ মার্চের সংখ্যায় বিভিন্ন ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিবাদের খবর এবং পুলিশের সাথে সংঘাতের বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই ধারা অব্যাহত থাকে পরবর্তী দুই দিন অর্থাৎ ১২ ও ১৩ মার্চ। ১৩ তারিখের *আজাদ*–এ 'ইউনিয়ন পর্যায়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।[১২৬]

এই বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কয়েকজন জেনারেলসহ ঢাকায় আসেন এবং ১৬-২৪ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সাথে বৈঠক করেন। ২১ মার্চ থেকে ভুট্টোও এতে যোগ দেন। বৈঠকের আগে ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু নতুন ৩৫ দফা নির্দেশনা জারি করেন। এসব নির্দেশনার মধ্যে অন্যতম ছিল – রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র চালু থাকবে তবে গণআন্দোলনের খবর প্রচার না করলে কর্মীরা কাজে সহযোগিতা করবে না। এ সময় ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোও সক্রিয় ভূমিকা রাখে। রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে পত্রিকাগুলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা নেয়। ১৪ মার্চ *আজাদ*, *ইত্তেফাক*, *সংবাদ*, *দৈনিক পাকিস্তান* একযোগে 'আর সময় নাই', 'Time is Running out' শিরোনামে যৌথ সম্পাদকীয় প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

করে। সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট ও জোরালো ভাষায় লিখিত এই সম্পাদকীয়তে বঙ্গবন্ধুর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। পাশাপাশি সামরিক আইন প্রত্যাহার করে দ্রুত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর সাথে সমঝোতায় আসার দাবি জানানো হয়। সম্পাদকীয় কলামে মন্তব্য করা হয়:

> ... আমরা ঢাকার সংবাদপত্রসমূহ একযোগে বিশ্বাস করি যে, আজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন আসিয়াছে এবং এই মুহূর্তে এক বাক্য এক সুরে কয়েকটি কথা বলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ... আমাদের বিচারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উচিত দেশের বুক হইতে সামরিক আইন তুলিয়া লইয়া অবিলম্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাহার ফলশ্রুতিতে জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়।[১২৭]

১৪ মার্চ *আজাদ*-এ প্রকাশিত আরেকটি সংবাদ গুরুত্ব বহন করে। ইয়াহিয়ার সাথে বঙ্গবন্ধুর বৈঠকের আগেই পত্রিকাটি ন্যাপ প্রধান ওয়ালীর মন্তব্য উদ্ধৃত করে প্রকাশ করে যে তিনি বঙ্গবন্ধুর দাবির সাথে সম্পূর্ণ একমত।[১২৮] এ পর্যায়ে এসে *আজাদ* ১৬ মার্চ সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য ভুট্টোকে দায়ী করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। *আজাদ* মন্তব্য করে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো নেতাই ভুট্টোকে সমর্থন করে না এবং তার ক্ষমতা লিপ্সার কারণেই সংকট তৈরি হয়েছে।[১২৯] অপরদিকে ইয়াহিয়া ও বঙ্গবন্ধুর আলোচনায় কোনো সমাধান না আসায় *সংবাদ* উদ্বেগ জানিয়ে ১৭ মার্চ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।[১৩০]

ঢাকার পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত সংবাদ থেকে এটি স্পষ্ট যে বাঙালিরা ততদিনে স্বাধীনতার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। ১৬ মার্চ *সংবাদ* 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ', 'জনতার সংগ্রাম চলবে'; [১৩১] *দৈনিক পাকিস্তান* ১৩ মার্চ 'লেখক, পটুয়া ও শিল্পীদের কর্মসূচী';[১৩২] *আজাদ* ১৮ মার্চ 'স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পীর তুলি আজ হাতিয়ার'[১৩৩] শিরোনামে স্বাধীনতার দাবির কথাই তুলে ধরে। লক্ষণীয় যে পত্রিকাগুলো এ সময় ব্যাপকভাবে 'স্বাধীনতা' শব্দের ব্যবহার করতে থাকে। ১৮ মার্চ তারিখেই বিভিন্ন সংগঠনের কর্মসূচি প্রকাশ করতে গিয়ে *আজাদ* অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে মন্তব্য করে, "স্বাধীনতা এবং বিদ্রোহী বাংলার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের সপ্তদশ দিবসে গৃহীত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি"[১৩৪] *আজাদ* বাঙালি জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সচেতন করে তুলতে সেনাবাহিনীর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে। যেমন – রাজশাহীতে ১৭ মার্চ টেলিফোন অফিসের সামনে সামরিক বাহিনীর গুলিতে আহতদের স্থানীয় মুসলিম কর্মাশিয়াল ব্যাংকের বারান্দায় ফেলে রাখা হয়। *আজাদ*-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী আহতদের কয়েকজন তাদের নিঃসারিত রক্ত দিয়ে ব্যাংকের দেয়ালে লেখেন, "বাংলাদেশ স্বাধীন কর"।[১৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৪ মার্চ *আজাদ* এবং ১৬ মার্চ *সংবাদ* আওয়ামী লীগের তহবিলে চাঁদাদাতাদের তালিকা প্রকাশ করে। এটি স্বাধীনতার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসকেই ইঙ্গিত করে। মার্চের ২০ তারিখের পর থেকে প্রতিটি পত্রিকাই স্বাধীনতার দাবির সাথে একাত্মতা জানিয়ে দেওয়া বিভিন্ন সংগঠনের ঘোষণা ও বিবৃতি প্রকাশ করতে থাকে। যেমন *ইত্তেফাক* ২২ মার্চ শিরোনাম করে যথাক্রমে 'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম আহূত প্রতিরোধ দিবসের কর্মসূচি' এবং 'আজ থেকে আমরা আর প্রাক্তন নই : নেতা ও জনতার সহিত একাত্মতা ঘোষণা প্রসঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিক"[১৩৬] *সংবাদ* বাঙালি জনগণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ২১ মার্চ 'অগ্রসর! সংগ্রামী জনতা!!' শিরোনামে সম্পাদকীয় বের করে। পত্রিকাটি স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে গঠনমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং 'গ্রাম বাংলাকে সংগঠিত করা দরকার' শিরোনামে উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।[১৩৭]

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীরাও উল্লেখযোগ্যভাবে অংশগ্রহণ করেন। এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল মার্চ মাসের শুরু থেকেই যা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর জোরালো হয়। নারীদের এই প্রস্তুতির খবর ঢাকার সংবাদপত্রগুলো তুলে ধরে। *সংবাদ* এ বিষয়ে 'মহিলাদের কুচকাওয়াজ' শিরোনামে ১৭ মার্চ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[১৩৮]

২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে ঢাকায় পাকিস্তানের পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ঐদিন ঢাকার পত্রিকাগুলো 'বাংলাদেশের মুক্তি দিবস' হিসেবে বিশেষ ক্রোড়পত্র[১৩৯] সম্পাদকীয় ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার সমর্থক *দি পিপল* 'A new flag is born' শিরোনামে ২৩ মার্চ সংখ্যায় মন্তব্য করে:

> A new flag is born today – a flag with a golden map of Bangladeshimplanted on a red circle placed in the middle of deep green rectangle base. This is the latest flag added to the total list of the flags representing various states and nation of the contemporary world. This is the flag for 'Independent Bangladesh'. This is the flag that symbolizes the emancipation of 75 million Bangalees.[১৪০]

ইত্তেফাক 'এবারের ২৩ মার্চ' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে আত্মবিশ্বাসী বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষারই প্রতিধ্বনি ঘটায়। পাশাপাশি পত্রিকাটি '৭১ – এর ২৩ মার্চের সুর : আমরা শুনেছি ঐ মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ' শিরোনামে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[১৪১] অপরদিকে *সংবাদ*-এ প্রকাশিত বিশেষ সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল, '২৩ মার্চ – আত্মজিজ্ঞাসার দিন'[১৪২] ২৩ মার্চ *দৈনিক পাকিস্তান* কবি

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যিকদের প্রতিবাদের খবর প্রকাশ করে। ২২ মার্চ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে, 'অসহযোগ আন্দোলনের বজ্র শপথ' শীর্ষক কবিতা পাঠের আয়োজনের খবর এখানে তুলে ধরা হয়।[১৪৩]

এ সময় বিভিন্ন মহল থেকে ওঠা স্বাধীনতার দাবিকে পত্রিকাগুলো যেমন সামনে তুলে ধরে তেমনি ভবিষ্যতে বাঙালিদের ওপর আঘাত আসার বিষয়টিও কয়েকটি পত্রিকা আঁচ করতে পারে। আসন্ন ধ্বংসাত্মক সামরিক অভিযানের আশংকার কথা জানিয়ে *সংবাদ* সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী ২৪ মার্চ সম্পাদকীয় কলামে লিখেছিলেন, "জনগণ সচেতনভাবে অগ্রসর হও"।[১৪৪] ২৩ মার্চের পর কয়েকটি পত্রিকা সরাসরি স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে। *আজাদ* ২৪ তারিখ ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক কর্মচারীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে একাত্মতা জানিয়ে মিছিলের এবং ২৫ মার্চ সংবাদপত্র হকারদের সমাবেশ থেকে বাঙালিদের স্বাধীনতা অর্জনের দাবি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[১৪৫] ২৫ মার্চ *আজাদ* একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করে। ঐ সংবাদে বলা হয় সৈন্যবাহী একটি বিদেশি বিমান ২৪ মার্চ কোনো এক অজ্ঞাতস্থানে গোপনে অবতরণ করে।[১৪৬] মাত্র একদিন পরেই এই সংবাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে নিজদের আশংকা প্রকাশ অব্যাহত রাখে সংবাদ এবং ২৫ মার্চ 'অসহনীয় অনিশ্চয়তা' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।[১৪৭]

বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচির প্রথম থেকেই বিভিন্ন সংগঠন উপলব্ধি করতে পারে অচিরেই হয়ত তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিতে হবে। ৭ মার্চের ভাষণের পর এই উপলব্ধি আরও তীব্র হয়। ফলে বিভিন্ন সংগঠন প্রস্তুতি হিসেবে কুচকাওয়াজে অংশ নেয় যেটি ঢাকার সংবাদপত্রগুলোতে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। যেমন –*দৈনিক পাকিস্তান* ১৬ মার্চ তারিখে সেগুনবগানে মহিলা সেচ্ছাসেবী বাহিনীতে ভর্তি, শরীর চর্চা ও কুচকাওয়াজ, ১৯ মার্চ বাংলা কলেজ প্রাঙ্গণে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজ, ২০ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে ছাত্র ইউনিয়নের প্যারেড ও কুচকাওয়াজ কর্মসূচির সংবাদ প্রকাশ করে।[১৪৮] *দৈনিক পাকিস্তান*-এর পাশাপাশি *সংবাদ* ১৭ ও ১৮ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কুচকাওয়াজ কর্মসূচির সংবাদ প্রকাশ করে। এসব কর্মসূচির সংবাদ স্বাভাবিকভাবেই অনাগত অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বাঙালি জনগণকে সচেতন করেছিল।

এসব পত্রিকার বাইরে ইংরেজী দৈনিক *দি পিপল* অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা রাখে। পত্রিকাটি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে 'অকুপেশন আর্মি' বলে অভিহিত করে ইয়াহিয়া খানের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে। পত্রিকাটি সরাসরি স্বাধীনতা অর্জনের আহ্বান জানায় এবং 'Sovereign and Independent

Dhaka University Institutional Repository

Bangladesh' কথাটি ব্যবহার করে। বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়ার বৈঠক সম্পর্কে 'Mujib-Yahya meeting to decide whether Pakistan to stay or go : Independence of Bangladesh at Fair Accompli' শীর্ষক প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধুর প্রতি সমর্থন জানিয়ে *দি হলিডে* মন্তব্য করে:

> The frustrated people finally raised the demand of Sovereign and independent Bangladesh. They are no more prepared to be subjected to the undemocratic and repressive measures of a Government sitting, 1300 miles away… The Bangalees are resolute to achieve Independence, which under their dedicated leader, Sheikh Mujibur Rahman has already been accepted as almost a faitaccompli.[১৪৯]

এসবের বাইরে কিছু কিছু পত্রিকা বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরোধী অবস্থান নেয়। সরকারি পত্রিকা *মর্নিং নিউজ* এবং জামায়াত-ই-ইসলামি সমর্থক পত্রিকা *দৈনিক সংগ্রাম*-এর সাথে অপ্রত্যাশিত ভাবে যুক্ত হয় *পাকিস্তান অবজারভার*। পত্রিকাগুলো অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন না করলেও জনমত ও ব্যবসায়িক স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আন্দোলনের খবরাখবর ও ছবি প্রকাশ করতে থাকে। যেমন – সরকার সমর্থক *মর্নিং নিউজ*-এর মার্চ মাসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিরোনাম ছিলো –'Slogans break calm of night';[১৫০] 'Press workers pledge solidarity with current movement';[১৫১] 'Bikshubdha Shilpee Samaj';[১৫২] 'I will shed last drop of blood for people – says Mujib';[১৫৩] 'Teachers demand transfer of power';[১৫৪] 'Dhaka turns into a city of processions';[১৫৫] 'Bangladesh Flag hoisted on Govt. House'।[১৫৬] সম্পাদকীয় কলামে পত্রিকাটির সরকার বিরোধী কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার বিষয়টি ছিল লক্ষণীয়। পাশাপাশি পত্রিকাটি একটি সমঝোতার মাধ্যমে সমাধানের প্রতি গুরুত্ব দেয়।

হামিদুল হক চৌধুরীর মালিকানাধীন ইংরেজী পত্রিকা *পাকিস্তান অবজারভার* আন্দোলনের খবরাখবর প্রকাশ করলেও কিছু কিছু কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে। পত্রিকাটির এই নীতি অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই দৃষ্টিগোচর হয়। পত্রিকাটি ঐ সময় ছাত্র রাজনীতির বিরোধী অবস্থান নেয়। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসেও পত্রিকাটি আন্দোলন সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করে। যেমন – ৪ মার্চ সম্পাদকীয় কলামে পত্রিকাটি বাঙালি জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে লুততরাজ এবং অরাজকতা বলে মন্তব্য করে।[১৫৭] পাশাপাশি অন্যান্য সম্পাদকীয়তেও পত্রিকাটি আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত রূপটি সম্পর্কে যথেষ্ট সোচ্চার ছিল না। পত্রিকাটির ১৯৭১ সালের জানুয়ারি - মার্চ মাসের সম্পাদকীয় কলামের মূল বিষয়বস্তু ছিল শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান। *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার এই ভূমিকাকে তখনকার

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সংগঠন সমালোচনা করে যা অন্যান্য পত্রিকাতেও উঠে আসে। যেমন – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমতি *পাকিস্তান অবজারভার* - এর সমালোচনা করে পত্রিকাটি বর্জনের আহ্বান জানায়। *ইত্তেফাক* ৫ মার্চ সংখ্যায় বিবৃতিটি প্রকাশ করে।[১৫৮]

এছাড়া বামপন্থি সাপ্তাহিক *গণশক্তি*, বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করে মন্তব্য করে জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও শেখ মুজিব তাকে কাজে লাগাতে চান না।[১৫৯] আরেক বামপন্থি সাপ্তাহিক *হলিডে* সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ১৪ মার্চ গণহত্যার আশঙ্কার কথা জানায়।[১৬০] ২৫ মার্চ রাতে এই আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়।

সার্বিকভাবে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে *আজাদ*। এর পরেই ছিল *সংবাদ* ও *ইত্তেফাক*। *আজাদ* মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে ১২ টি প্রধান শিরোনাম, ১৫ টি সম্পাদকীয় ও ১৫৫টি ছবি ছাপায়। একই সময় *ইত্তেফাক* প্রায় ৬ টি প্রধান শিরোনাম, ১৯ টি সম্পাদকীয়, ১১৫ টি ছবি এবং *সংবাদ* প্রায় ৬ টি প্রধান শিরোনাম, ২০ টি সম্পাদকীয় এবং ৯৩ টি ছবি প্রকাশ করে। *মর্নিং নিউজ* ও *পাকিস্তান অবজারভার* সরাসরি অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক না হলেও তারা এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না। *মর্নিং নিউজ* প্রধান শিরোনাম করেছে ৩ টি, সম্পাদকীয় ১৪ টি এবং ৯৪ টি ছবি প্রকাশ করে। অন্যদিকে *পাকিস্তান অবজারভার* ৮ টি প্রধান শিরোনাম, ১৫ টি সম্পাদকীয় এবং ৯৪ টি ছবি প্রকাশ করে।[১৬১] সুতরাং এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রধান শিরোনাম ও ছবি প্রকাশ করেছে *আজাদ*। অপরদিকে সবচেয়ে বেশি সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে *সংবাদ*।

৩. ২৫ মার্চ এবং অতঃপর

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকেই বিশেষ করে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে শক্তিশালী ভূমিকা রাখায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সব আক্রোশ গিয়ে পড়ে সংবাদপত্রের ওপর। ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালিকে হত্যা করা ছাড়াও তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল সংবাদপত্র অফিস। ঐ রাতেই *দি পিপল* এবং *গণবাণী* পত্রিকার অফিসে আক্রমণ করা হয়। *দি পিপল* পরদিন প্রকাশের জন্য শিরোনাম করেছিল – ‘Remain prepared for Supreme Sacrifice’ কিন্তু ২৫ মার্চ রাতেই পেট্রোল বোমা ও গোলাবর্ষণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় পত্রিকা অফিসটি। এ সময় নিহত হন ছয় জন সাংবাদিক

Dhaka University Institutional Repository

ও কর্মচারী।[১৬২] ২৬ মার্চ আক্রান্ত হয় *ইত্তেফাক* অফিস। বিদেশি সাংবাদিকদের (প্রায় ৩৫ জন) হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আটক রাখা হয়। পাকিস্তান সরকার যখন সারা দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে বলে প্রচার করছিল সেই সময়েই ২৮ মার্চ সংবাদ অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এ সময় সাংবাদিক শহীদ সাবের অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহত হন।[১৬৩]

বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থক বিভিন্ন পত্রিকার পাশাপাশি বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার ওপর আঘাত হানা হয়। নিষিদ্ধ হয় সংবাদ সংস্থা এনা এবং ইস্টার্ণ নিউজ এজেন্সি। ২৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ৭৭ নং সামরিক বিধি জারি করেন। এই বিধির আওতায় সরকার নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র ব্যতীত সব ধরনের রাজনৈতিক সংবাদ মুদ্রণ নিষিদ্ধ করা হয়। এতে বলা হয়, "কোনো ব্যক্তি সংবাদপত্রে বা কাগজে বা অন্য কোনো দলিলে এমন কিছু মুদ্রণ বা প্রকাশ করতে পারবে না যার মধ্যে পাকিস্তানের কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা কোনো নেতা অথবা কনো সদস্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টা ও ঝোঁক রয়েছে।"[১৬৩(ক)] ২৬ মার্চ সকালে ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশি সাংবাদিকদের ৩০ মিনিটের মধ্যে ঢাকা ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাদের সকল আলোকচিত্র ও প্রতিবেদন আটক করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে সরাসরি বিমানে তুলে দেওয়া হয়।[১৬৪] তবে সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ থাকলে দেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে এটি বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণ করা যাবে না - এ চিন্তাধারা থেকেই সামরিক সরকার অবিলম্বে পত্রিকা প্রকাশের জন্য পত্রিকা মালিকদের নির্দেশ দেয়। ২৯ মার্চ থেকেই প্রকাশিত হয় সরকারি মালিকানাধীন *মর্নিং নিউজ* এবং হামিদুল হক চৌধুরীর বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক – *পূর্বদেশ* ও *পাকিস্তান অবজারভার*। হামিদুল হক চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থান নেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে পাকিস্তান চলে যান। ১ এপ্রিল ও ২১ মে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে *আজাদ* ও *ইত্তেফাক*। *দৈনিক পাকিস্তান* ৩০ মার্চ প্রকাশিত হলেও পত্রিকাটির নিজস্ব প্রতিবেদন ছাপা হয় ২৭ এপ্রিল 'আজ শেরে বাংলার মৃত্যুবার্ষিকী' শিরোনামে। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টায় *সংবাদ* প্রকাশিত হয়নি।[১৬৫]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে কোনো পত্রিকা ছাপা না হলেও জামায়াত-ই-ইসলামির মুখপত্র *দৈনিক সংগ্রাম* নিয়মিত ছাপা হয়েছে। ২৬ মার্চের *সংগ্রাম* আগের রাতে নারকীয় হত্যাকাণ্ড, ধ্বংসযজ্ঞ, ধর্ষণ ও লুটপাটের কোনো সংবাদই ছাপায়নি। এর পরিবর্তে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন নির্দেশ ও প্রেসনোট প্রকাশ করা হয়। পত্রিকাটি মূলত দেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিল।[১৬৬] ২৬ মার্চ থেকে *সংগ্রাম* ১ পৃষ্ঠা করে ছাপা হয়েছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী জামায়াত-ই-ইসলামির

Dhaka University Institutional Repository

মুখপত্র হয়েও প্রেসের কর্মচারীদের অনুপস্থিতি এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের অভাবে এমনটি হয়। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পরিসরেই পত্রিকাটি যা প্রকাশ করেছে তার মূল কথা ছিল ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষা করেছে।

১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ *পাকিস্তান অবজারভার* ২৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান প্রদত্ত ভাষণ ছাপায়। পাশে ছোট করে বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার হওয়ার খবর প্রকাশ করা হয়। একই সংবাদ *মর্নিং নিউজ* ছাপায়।[১৬৭] পরদিন ৩০ মার্চ *মর্নিং নিউজ* এক পাতা প্রকাশিত হয়। এতে প্রধান দুটো শিরোনামের একটিতে বলা হয় যে মুজিব ১৯৬৬ সাল থেকেই বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে ভুট্টোর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয় যে, পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে। ৩১ মার্চ ঢাকার চারটি সংবাদপত্র ছাপা হয়। এগুলো হলো – *দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ, পাকিস্তান অবজারভার, মর্নিং নিউজ*। প্রতিটি পত্রিকাতেই দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। হামিদুল হক চৌধুরীর *পূর্বদেশ* মন্তব্য করে, শান্তিপ্রিয় বেসামরিক নাগরিকদের যেসব সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী হয়রানি করেছিল তাদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা সাফল্যের সাথে শেষ হয়েছে।[১৬৮] এভাবে ২৫ মার্চের গণহত্যায় বৈধতা দেওয়া হয়।

মূল্যায়ন

১৯৪৭-৭১(মার্চ) কালপর্বে ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ছয় দফার প্রশ্নে গণভোট হিসেবে বিবেচিত এই নির্বাচন বাঙালি জনমনে যে ঐক্য ও বিশ্বাস তৈরি করে তার সূত্র ধরেই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনি ইশতাহারে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির বিভিন্ন মৌলিক দাবি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে বামপন্থিদের প্রভাবাধীন বিশাল সংখ্যক শ্রমিক শ্রেণির সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়। স্বায়ত্তশাসনের জাতীয়তাবাদী দাবি এবং বাঙালির অন্যান্য মৌলিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ অন্য যে কোনো দলের চেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জাতীয়তাবাদী দাবির সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং নির্বাচনে সাফল্য পায়। এসব দাবি প্রচার ও প্রচারণার মাধ্যমে জনমত গঠনে প্রধান ভূমিকা রাখে *ইত্তেফাক*। পত্রিকাটি পাকিস্তানি শোষণ ও বঞ্চনা থেকে বেরিয়ে আসতে নির্বাচন ও স্বায়ত্তশাসনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে। *দৈনিক পাকিস্তান* সরকারি পত্রিকা হলেও বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা বিবৃতি প্রচারণায় জনমত তৈরিতে পত্রিকাটির ভূমিকাও কম নয়। অন্যান্য পত্রিকার মধ্যে *আজাদ, পাকিস্তান অবজারভার* ও *পূর্বদেশ* ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচারণা ও কর্মসূচির খবর প্রকাশ করতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

আজাদ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান, রাজনীতি, নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে একাধিক গঠনমূলক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। অপরদিকে *সংবাদ* ন্যাপ সমর্থিত হওয়ায় ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পত্রিকাটি নির্বাচন স্থগিত করার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল।

অনেক পত্রিকা বিশেষ করে বামপন্থি পত্রিকাগুলো সরাসরি বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের সমালোচনা করলেও *সংবাদ* সরাসরি বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকে। *দৈনিক পাকিস্তান* সরকারি পত্রিকা হলেও বাঙালি জনমত ও জাতীয়তাবাদের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। বাংলাদেশের ইতিহাসের গতি প্রকৃতি পরিবর্তনকারী ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে ছয় দফা ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করে *পূর্বদেশ* বা *সাপ্তাহিক গণশক্তি* প্রভৃতি পত্রিকা ইতিহাসের ইতিবাচক ধারার অংশ হতে ব্যর্থ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবির মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবোধ যে তীক্ষ্ণ ও তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে বামপন্থি দলগুলো তা উপলব্ধি করতে পারেনি। ফলে পত্রিকাগুলো নির্বাচনের ফলাফলকেও যথার্থ ভাবে মূল্যায়ন করতে পারেনি।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার সাথে সাথে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ১১০ নং সামরিক বিধি জারি করা হলেও কয়েকটি পত্রিকা বাদে ঢাকার অধিকাংশ পত্রিকা ছবি, খবর, সম্পাদকীয়, বিশেষ নিবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে অবস্থান নেয়। সাংবাদিকরাও রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। মার্চ মাসে দেশব্যাপী কারফিউ থাকায় সংবাদপত্রের মাধ্যমেই বাঙালি জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন, সরকারের দমনপীড়ন ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই বাঙালি প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে থাকে আর এতে সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখে সংবাদপত্র। ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে *আজাদ*। এর সাথে যুক্ত হয় *সংবাদ*, *ইত্তেফাক*, *দি পিপল*। *সংবাদ* ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা বিবৃতিকে উপজীব্য করে সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। এক সময় *আজাদ* ছয় দফা বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করলেও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ছয় দফার প্রতি গণরায়কে পত্রিকাটি তাদের মূল আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। এ সময় অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে সবচেয়ে বেশি প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় ও ছবি প্রকাশ করে *আজাদ*। অপরদিকে তফাজ্জল হোসেনের (মানিক মিয়া) মৃত্যুর পরও *ইত্তেফাক* বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সরাসরি সমর্থন দেয়। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ এবং সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান থেকে ২৫ মার্চ আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত *ইত্তেফাক* বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করে। পত্রিকাগুলো ১৯৭১ সালের মার্চে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ও সংগঠনের কর্মসূচির কথা প্রচার করে জনমত তৈরি করে। পাশাপাশি একবাক্যে অধিকাংশ পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব মেনে নেয়। পত্রিকাগুলো ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে তার চারটি শর্তের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করতে থাকে। ১৯৪৭ সালের পর দল ও মতের ওপরে উঠে স্বাধীনতার পক্ষে পত্রিকাগুলোর এমন ঐক্যবদ্ধ বলিষ্ঠ প্রয়াস আর দেখা যায়নি। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পর বঙ্গবন্ধু ছয় দফা বাস্তবায়ন করতে না পারার জন্য হামিদুল হক চৌধুরীর অসহযোগিতাকে দায়ী করেছিলেন। এই অভিযোগকে সত্য প্রমাণিত করে পত্রিকাটি ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরোধী অবস্থান নেয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল আপোশমূলক এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন বিতর্কিত। হামিদুল হক চৌধুরী রাজনৈতিক ও আদর্শগতভাবে বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের বিরোধী হিসেবে বিবেচিত ছিলেন। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় থেকেই তার এই ভূমিকা স্পষ্ট হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা বিরোধী অবস্থানে পর্যবসিত হয়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধাপে ধাপে মুক্তি সংগ্রামের মোহনায় আনতে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা অনন্য ভূমিকা পালন করেন। অনেক সংবাদপত্র মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থান নিলেও অধিকাংশই ছিল স্বাধিকার আন্দোলনের সমর্থক। এদের অনেকেই ত্রিশ লক্ষ বাঙালির সাথে সাথে রক্তমূল্যে রাত্রির তপস্যায় দিনের আলোর সন্ধান দিয়ে যায়।

তথ্যসূত্র

১. এরপর থেকে শুধু বঙ্গবন্ধু।

২. আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করার পর যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ একই বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, নিয়মতান্ত্রিক শাসন কায়েমের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া সেনাবাহিনী এবং তার নিজের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। বিস্তারিত – *দৈনিক পাকিস্তান* এবং *পাকিস্তান অবজারভার*, ২৭ মার্চ ১৯৬৯।

৩. *আজাদ*, ১ এপ্রিল, ১৯৬৯।

৪. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ নভেম্বর, ১৯৬৯; ঐতিহাসিকদের মতে ইয়াহিয়া খান নির্বাচন দিয়েছিলেন এই আশায় যে পূর্ব বাংলায় একাধিক রাজনৈতিক দল থাকায় কোনো দলের পক্ষে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হবে না। ফলে

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে তিনি দেশের ওপর এমন একটি সংবিধান চাপিয়ে দেবেন যা পুরাতন শাসকচক্রের ক্ষমতাকে অক্ষুন্ন রাখবে। ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা করা সম্ভব না এই বিশ্বাস থেকে তিনি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত অনুপম সেন, 'বাংলাদেশ সংগ্রামের সামাজিক পটভূমি', *রক্তাক্ত বাংলা*, মুজিবনগর/ ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭১/ ২০০৯, পৃ. ১৯৪-১৯।

৫. আইন কাঠামো আদেশের বিস্তারিত – Golam Morshed, 'Pakistan 1970 Elections and the Liberation of Bangladesh : A Political Analysis', *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol. XL, (1988), pp. 109-110।

৬. *ইত্তেফাক*, ৫-৭ এপ্রিল ১৯৭০।

৭. পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলো হচ্ছে – আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফ্ফর), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম, কনভেনশন, কাউন্সিল – এই তিনটি গ্রুপ), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, জামায়াত-ই-ইসলামি প্রভৃতি। ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে প্রথম থেকেই পরস্পরবিরোধী বক্তব্য প্রদান করে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ নেয়নি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বিস্তারিত – ড. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, ঢাকা : সময়, ২০০৭, পৃ. ২১৬।

৮. আওয়ামী লীগের নির্বাচনি প্রচার সম্পর্কে বিস্তারিত - Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh*, Dhaka : UPL, 1986।

৯. Golam Morshed, *op.cit*, pp. 113-115।

১০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ৫৮৬।

১১. মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা : ইউপিএল, ২০১৫, পৃ. ১৬৭।

১২. ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাহজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর তৎকালীন ভিপি ও জিএস যথাক্রমে আ স ম আব্দুর রব ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন। বিস্তারিত – ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস : ১৮৩০-১৯৭১*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, পৃ. ২৯৫।

১৩. বঙ্গবন্ধু বেলুচিস্তানের কসাই হিসেবে কুখ্যাত টিক্কা খানের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা না করার নির্দেশ দিলে প্রধান বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকী ৯ মার্চ শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে অস্বীকৃতি জানান। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭১-৬৭৪, ৭১৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *৭১ এর দশমাস*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ৪১-৪২।

১৫. অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনার বিস্তারিত - রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪-৮২, এই জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞের কথা ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং এর লুকিয়ে তোলা ছবির মাধ্যমে বিশ্ববাসী জানতে পারে, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮৮-৭৯২।

১৬. মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাটে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঘোষণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ বেতারকর্মীদের মাধমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭. হসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১।

১৮. *ঐ*, পৃ. ২।

১৯. জুলফিকার হায়দার, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা*, ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ১৭৬।

২০. এরপর থেকে শুধু ন্যাপ (মোজাফ্ফর) এবং ন্যাপ (ভাসানী) লেখা হবে।

২১. মোঃ এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮, পৃ. ১৯১।

২২. *আজাদ*, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯।

২৩. *ঐ*, ১৫ নভেম্বর ১৯৬৯।

২৪. *ইত্তেফাক*, ২৮ মার্চ ১৯৬৯; তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) সব সময় সামরিক শাসনের বিরোধিতা করে এসেছেন। তিনি সামরিক শাসনকে রাজনৈতিক কোন্দল নিরসনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পরও তিনি একাধিক সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন যেটি অভিসন্দর্ভের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

২৫. *ঐ*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯।

২৬. *ঐ*, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯।

২৭. *ঐ*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯।

২৮. *ঐ*, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৬৯; পূর্ব বাংলার প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশ নামের প্রতি সমর্থন জানালেও পিডিপি ও জামায়াত-ই-ইসলামি বাংলাদেশ নামের বিরোধিতা করে। ১৯৭০ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে মঞ্চের পেছনে 'জয় বাংলা' স্লোগান লেখা হয়। তবে স্লোগানটি সাধারণের মধ্যে প্রচারণা পায় ১৯৭০ সালের

Dhaka University Institutional Repository

১১ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুর প্রথম অনুষ্ঠিত জনসভায়; মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, *বং বঙ্গ বাঙ্গালা বাংলাদেশ*, ঢাকা : সময়, ১৯৯৯, পৃ. ২৬।

২৯. *ঐ*, ২৯ মার্চ ১৯৭০।

৩০. *ঐ*, ৩ অক্টোবর ১৯৭০।

৩১. *ঐ*, ১ নভেম্বর ১৯৭০।

৩২. *ঐ*, ১২ নভেম্বর ১৯৭০; প্রকৃতপক্ষে ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে ন্যাপ গঠন করার পর থেকেই *ইত্তেফাক*–ভাসানী নেতিবাচক সম্পর্ক তৈরি হয়।

৩৩. *পূর্বদেশ*, ১৯ জানুয়ারি ১৯৭০।

৩৪. *ইত্তেফাক*, ১৯ অক্টোবর ১৯৭০।

৩৫. *ঐ*।

৩৬. *ঐ*, ২১ অক্টোবর ১৯৭০।

৩৭. *ঐ*, ১ নভেম্বর ১৯৭০।

৩৮. *ঐ*, ৫ নভেম্বর ১৯৭০।

৩৯. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৭ নভেম্বর ১৯৭০।

৪০. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ, আতাউর রহমান, ওয়ালী খান প্রমুখ নেতারা নির্বাচন পেছানোর দাবি জানান। ১৯৭০ সালের ২৪ নভেম্বর ভাসানীপন্থি ন্যাপ তাদের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়; *সংবাদ*, ২৫ নভেম্বর ১৯৭০।

৪১. *ইত্তেফাক*, ২৭ নভেম্বর ১৯৭০।

৪২. *ঐ*, ১৬ নভেম্বর ১৯৭০; দাঁড়িপাল্লা – জামায়াত-ই-ইসলামি, বই – জমিয়াতুল উলেমা ও নেজামে ইসলামের, খেজুর গাছ – জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, গাভী – শর্ষিনা পীরের ইসলামিক গণতন্ত্রী দলের, গরুর গাড়ী – পাকিস্তান দরদী সংঘের নির্বাচনি প্রতীক ছিল।

৪৩. *ঐ*, ২৮ নভেম্বর ১৯৭০।

৪৪. *ঐ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. *ঐ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭০।

৪৬. *আজাদ*, ৯ আগস্ট ১৯৬৯।

৪৭. *ঐ*, ১৫ জুন ১৯৬৯।

৪৮. *ঐ*, ১৪ আগস্ট ১৯৬৯।

৪৯. *ঐ*, ২৩ আগস্ট ১৯৬৯।

৫০. *ঐ*, ২০ জানুয়ারি ১৯৭০।

৫১. *ঐ*, ৫ মার্চ ১৯৭০।

৫২. *ঐ*, ৮ জুন ১৯৭০।

৫৩ মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১।

৫৪. উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় ভাসানী সমর্থিত ন্যাপ যোগদান না করায় *সংবাদ* দলটির সমালোচনা করে যা অভিসন্দর্ভের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

৫৫. *সংবাদ*, ১৩ জুন ১৯৬৯।

৫৬. *ঐ*, ৫ জানুয়ারি ১৯৭০।

৫৭. *ঐ*, ২৭ অক্টোবর ১৯৭০।

৫৮. *ঐ*, ২৯ নভেম্বর ১৯৭০।

৫৯. *ঐ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭০।

৬০. *ঐ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০।

৬১. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৬৯।

৬২. *ঐ*, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৬৯।

৬৩. *ঐ*, ১২ জানুয়ারি ১৯৭০।

৬৪. *ঐ*, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭০।

Dhaka University Institutional Repository

৬৫.	*ঐ*, ১৬ জানুয়ারি ১৯৭০।

৬৬.	*ঐ*, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭০।

৬৭.	*ঐ*, ২৪ নভেম্বর ১৯৭০।

৬৮.	*ঐ*, ১৯ নভেম্বর ১৯৭০।

৬৯.	আজম বেগ, 'চৌধুরী হামিদুল হক', *বাংলাপিডিয়া*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭ (সিডি সংস্করণ)।

৭০.	*পাকিস্তান অবজারভার*, ১৯ জানুয়ারি ১৯।

৭১.	জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা : সুবর্ণ, ২০০৯, পৃ. ৫২।

৭২.	*পাকিস্তান অবজারভার*, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭০।

৭৩.	*ঐ*।

৭৪.	*ঐ*, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭০।

৭৫.	*ঐ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০।

৭৬.	*মর্নিং নিউজ*, ১১ আগস্ট ১৯৬৯।

৭৭.	*পূর্বদেশ*, ২৩ মে ১৯৭০; কাগমারী সম্মেলনে ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামুয়ালাইকুম' জানিয়ে যে দৃঢ়তার পরিচয় দেন পরবর্তী সময়ে তিনি এই নীতি থেকে বের হয়ে আসেন। নির্বাচনে অংশ না নিলেও ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে টেলিভিশন ভাষণে ভাসানী মন্তব্য করেন, "Even if there are thousands of difference among us; all should love Pakistan. The name of this country is Pakistan, there is no such country anywhere in the world." (*দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ৫৫৭)। এ সময় ভাসানীর বক্তব্যে কিছুটা সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ পায়। তিনি ইসলামি সমাজতন্ত্র প্রচলন করার কথা বলেন আবার পূর্ব বাংলার বামপন্থি নেতাদের 'হিন্দু' বলেও অভিহিত করেন। ভাসানীর এই পরিবর্তিত অবস্থাকে *পূর্বদেশ*-এর পাশাপাশি জামায়াত-ই-ইসলামির মুখপত্র পত্রিকা *সংগ্রাম* ১৯৭০ সালের ২৮ মে সংখ্যায় অভিনন্দিত করে।

৭৮.	*পূর্বদেশ*, ২ জুন ১৯৭০।

৭৯.	ড. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৪।

৮০.	*সাপ্তাহিক গণশক্তি*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭০।

Dhaka University Institutional Repository

৮১. *সাপ্তাহিক হলিডে*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৭০।

৮১(ক). *দৈনিক সংগ্রাম*, ১০ নভেম্বর ১৯৭০।

৮১(খ). *ঐ*, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭০।

৮২. ড. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৮।

৮৩. স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত।

৮৪. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭১।

৮৫. *ঐ*, ১৫ ও ১৮ জানুয়ারি।

৮৬. *ঐ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১।

৮৭. *ঐ*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১।

৮৮. এসব নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন – বেলুচিস্তানের নবাব আকবর খান বুগতি, পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মাদ খান রাইসানী, ওয়ালী ন্যাপের সাইফুর রহমান, সিন্ধু যুক্তফ্রন্ট ও জিয়ে সিন্ধ এর নেতা জি. এম. সৈয়দ, মাওলানা গোলাম গাউস হাজারভি প্রমুখ।

৮৯. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১।

৯০. *ঐ*।

৯১. *আজাদ*, ২৮ এপ্রিল ১৯৭০।

৯২. *ঐ*, ১৩ ও ২০ ডিসেম্বর ১৯৭০।

৯৩. *ঐ*, ৬ জানুয়ারি ১৯৭১।

৯৪. *ঐ*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭১।

৯৫. *ঐ*, ১৯ ফেব্রুয়াররি ১৯৭১।

৯৬. *ঐ*, ২৮ ফেব্রুয়াররি ১৯৭১।

Dhaka University Institutional Repository

৯৭. *ইত্তেফাক*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১; ভুট্টো যদিও মন্তব্য করেছিলেন যে, পাকিস্তানের প্রতি ভারতের যুদ্ধংদেহী মনোভাবের কারণে পশ্চিম পাকিস্তানে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু ভারত পাকিস্তান সম্পর্ক সে সময় যথেষ্ট ভালো ছিল - ড. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮৫।

৯৮. সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫, পৃ. ৯৫।

৯৯. *ইত্তেফাক*, *আজাদ*, *সংবাদ*, ১ মার্চ ১৯৭১।

১০০. *ঐ*, ২ মার্চ ১৯৭১।

১০১. *সংবাদ*, ২ মার্চ ১৯৭১।

১০২. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২ মার্চ ১৯৭১।

১০৩. *আজাদ সংবাদ*, ৩ মার্চ ১৯৭১।

১০৪. *ইত্তেফাক*, ৩ মার্চ ১৯৭১।

১০৫. *সংবাদ*, ৩ মার্চ ১৯৭১।

১০৬. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৩ মার্চ ১৯৭১।

১০৭. *ঐ*, ৩ মার্চ ১৯৭১।

১০৮. *সংবাদ*, *আজাদ*, ৩ মার্চ ১৯৭১।

১০৯. *ইত্তেফাক*, ৪ মার্চ ১৯৭১।

১১০. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৪ মার্চ ১৯৭১।

১১১. *ইত্তেফাক*, ৫ মার্চ ১৯৭১।

১১২. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৫ মার্চ ১৯৭১।

১১৩. *ইত্তেফাক*, ৬ মার্চ ১৯৭১।

১১৪. *আজাদ*, ৬ মার্চ ১৯৭১।

১১৫. সংবাদ, ৭ মার্চ ১৯৭১।

১১৬. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৭ মার্চ ১৯৭১।

১১৭. *ঐ*, ৭ মার্চ ১৯৭১।

১১৮. *আজাদ*, ৭ মার্চ ১৯৭১।

১১৯. *ঐ*, ৮ মার্চ ১৯৭১।

১২০. *পূর্বদেশ*, ৮ মার্চ ১৯৭১।

১২১. *আজাদ*, ৮ মার্চ ১৯৭১।

১২২. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১০ মার্চ ১৯৭১।

১২৩. *ঐ*।

১২৪. *আজাদ*, ১০ মার্চ ১৯৭১।

Dhaka University Institutional Repository

১২৫. *ইত্তেফাক*, ৯ মার্চ ১৯৭১।

১২৬. *আজাদ*, ১৩ মার্চ ১৯৭১।

১২৭. *আজাদ*, *ইত্তেফাক*, *সংবাদ*, *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৪ মার্চ ১৯৭১।

১২৮. *সংবাদ*, ১৪ মার্চ ১৯৭১।

১২৯. *আজাদ*, ১৬ মার্চ ১৯৭১।

১৩০. *সংবাদ*, ১৭ মার্চ ১৯৭১।

১৩১. ঐ, ১৬ মার্চ ১৯৭১ ।

১৩২. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৩ মার্চ ১৯৭১।

১৩৩. *আজাদ*, ১৮ মার্চ ১৯৭১।

১৩৪. *ঐ*।

১৩৫. *আজাদ*, ১৮ মার্চ ১৯৭১।

১৩৬. *ইত্তেফাক*, ২২ মার্চ ১৯৭১।

১৩৭. *সংবাদ*, ২১ মার্চ ১৯৭১।

১৩৮. *ঐ*, ১৭ মার্চ ১৯৭১।

১৩৯. মওদুদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১।

১৪০. *দি পিপল*, ২৩ মার্চ ১৯৭১।

১৪১. *ইত্তেফাক*, ২৩ মার্চ ১৯৭১।

১৪২. *সংবাদ*, ২৩ মার্চ ১৯৭১।

১৪৩. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৩ মার্চ ১৯৭১; ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন – আহসান হাবীব, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আলাউদ্দীন আল আজাদ, মেহেরুন্নেসা, দাউদ হায়দার প্রমুখ। তারা স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

১৪৪. *সংবাদ*, ২৪ মার্চ ১৯৭১।

১৪৫. *আজাদ*, ২৪ ও ২৫ মার্চ ১৯৭১।

১৪৬. *ঐ*, ২৫ মার্চ ১৯৭১।

১৪৭. *সংবাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৭১।

১৪৮. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৬, ১৯, ২০ মার্চ ১৯৭১।

১৪৯. *দি হলিডে*, ১৭ মার্চ ১৯৭১; এর আগে ১৪ মার্চ পত্রিকাটি ভবিষ্যৎ গণহত্যার আশংকা জানিয়ে এবং জনযুদ্ধের চরিত্র ব্যাখ্যা করে মন্তব্য করে : “Faced as they are with people’s war … They might as well go for indiscriminate violence or genocide which literally means the total extermination of an intransigent people.”

১৫০. *মর্নিং নিউজ*, ৪ মার্চ ১৯৭১।

Dhaka University Institutional Repository

১৫১. *ঐ*, ১৪ মার্চ ১৯৭১।

১৫২. *ঐ*, ১৭ মার্চ ১৯৭১।

১৫৩. *ঐ*, ১৮ মার্চ ১৯৭১।

১৫৪. *ঐ*, ২২ মার্চ ১৯৭১।

১৫৫. *ঐ*, ২৫ মার্চ ১৯৭১।

১৫৬. *ঐ*, ২৫ মার্চ ১৯৭১।

১৫৭. *পাকিস্তান অবজারভার*, ৪ মার্চ ১৯৭১।

১৫৮. *ইত্তেফাক*, ৫ মার্চ ১৯৭১; ৫৫ জন শিক্ষক বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন।এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রফেসর আবু মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, প্রফেসর মোজাফ্‌ফর আহমেদ চৌধুরী, ড. আহমেদ শরীফ, প্রফেসর মুনীর চৌধুরী, ড. খান সারোয়ার মুর্শিদ প্রমুখ।

১৫৯. *সাপ্তাহিক গণশক্তি*, ২২ মার্চ ১৯৭১।

১৬০. *সাপ্তাহিক হলিডে*, ১৪ মার্চ ১৯৭১।

১৬১. সুব্রত শংকর ধর,*প্রাগুক্ত*, পৃ.৯৬।

১৬২. তপন বাগচী, *তৃণমূল সাংবাদিকতার উন্মেষ ও বিকাশ*, ঢাকা : ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার, ১৯৯৯, পৃ. ৬৯।

১৬৩. সুব্রত শংকর ধর,*প্রাগুক্ত*, পৃ.১০১; মুক্তিযুদ্ধের সময় যে সব সাংবাদিক শহীদ হন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন – সিরাজুদ্দীন হোসেন (*ইত্তেফাক*), আবদুল মান্নান লাডু (*পাকিস্তান অবজারভার*), আ. ন. ম. গোলাম মোস্তাফা এবং শিব সাধন চক্রবর্তী (*দৈনিক পূর্বদেশ*), সেলিনা পারভীন (*সংবাদ*)। এছাড়া শহীদ হন শহীদুল্লাহ কায়সার, খোন্দকার আবু তালেব, নিজামুদ্দীন আহমদ, আ. ন. ম. গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ নাজমুল হক, এ. কে. এম. শহীদুল্লাহ (শহীদ সাবের), আবুল বাশার, চিশতী শাহ হেলালুর রহমান, মুহম্মদ আনোয়ার প্রমুখ। ঢাকার পত্রিকাগুলোর অনেক সাংবাদিক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন – এম. আর. আখতার মুকুল, আবুল হাসনাত ও ফয়েজ আহমদ (পাকিস্তান অবজারভার), আবদুল গাফফার চৌধুরী, রণজিৎ পাল চৌধুরী ও কামাল লোহানী (*পূর্বদেশ*), সন্তোষ গুপ্ত (সংবাদ), আবিদুর রহমান (*দি পিপল*) এবং আরও অনেকে। এর বিপরীতে অনেক সাংবাদিক পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন – হামিদুল হক চৌধুরী (*পাকিস্তান অবজারভার*), আখতার ফারুক (*সংগ্রাম*), সাংবাদিক ইউনিয়ন নেতা আনোয়ার জাহিদ, খোন্দকার আবদুল হামিদ (*ইত্তেফাক*), মাহবুবুল আলম (*পূর্বদেশ*), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আতিকুজ্জামান, মওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতি (*সংগ্রাম*), কামারুজ্জামান (স্বাধীনতা পরবর্তী *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা* পত্রিকার সম্পাদক), মওলানা আবদুল মান্নান (*ইনকিলাব* পত্রিকার মালিক), আবদুল কাদের মোল্লা (*দৈনিক সংগ্রাম*-এর সহকারী সম্পাদক)

Dhaka University Institutional Repository

১৬৩(ক). হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র (সপ্তম খণ্ড)*, ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২।

১৬৪. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২-১৮৩।

১৬৫. সুব্রত শংকর ধর,*প্রাগুক্ত*, পৃ.১০৪।

১৬৬. *সংগ্রাম*, ২৬ মার্চ ১৯৭১।

১৬৭. *পাকিস্তান অবজারভার, মর্নিং নিউজ*, ২৯ মার্চ ১৯৭১।

১৬৮. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬।

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

১৯৭১ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ হলো সেই মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিরোধাভাস যা পাকিস্তান নামে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র তৈরি করেছিল। ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮ ও ১৯৫২), ১৯৫৬ সালের সংবিধান, ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন, ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালের ছাত্র আন্দোলন, আইয়ুব আমলে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী, বাংলা ভাষা সংস্কার ও রবীন্দ্র সংগীত বর্জনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ইত্যাদি ঘটনা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে এককেটি মাইলফলক বা ভিত্তিভূমি। এসব ভিত্তিভূমিকে অবলম্বন করে জনমতকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রয়োজন কেবলমাত্র পরাধীনতার স্বরূপ প্রকাশের জন্যই নয় বরং একটি স্বাধীন দেশে জনগণের ভূমিকার বিশ্লেষণ সংবাদপত্রই করতে পারে। আলোচ্য গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে ১৯৪৭-৭১ (মার্চ) সময়কালে বাঙালি জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার আদায় ও মুক্তি অর্জনে ঢাকার বিভিন্ন সংবাদপত্র মুখপত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। একই সাথে গবেষণায় এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, পত্রিকাগুলো

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ সময় যতটা সাংবাদিকতার নীতি ও আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি পরিচালিত হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও নীতির প্রভাবে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে সব পত্রিকার ভূমিকা একই সমতলে থাকেনি। রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারণে এক পত্রিকা অন্য পত্রিকার বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করার ঘটনাও পাকিস্তান আমলে লক্ষ্য করা যায়। পত্রিকাগুলোর এই অনৈক্য বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের পথে ছিল অন্তরায়। কিন্তু অনৈক্য থাকলেও পত্রিকাগুলো বাঙালি জাতির ক্রান্তিকালীন সময় ঐক্যবদ্ধ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর।

বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রথম প্রকাশ ঘটে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। এ সময় ভাষার পক্ষে যে সব যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে তার প্রায় সবই ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার পাতায় ছিল। তবে এ সময় পত্রিকাগুলো রাজনৈতিক আদর্শগত কারণে বাংলা ভাষার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে পারেনি। মুসলিম লীগ সমর্থক *মর্নিং নিউজ* ও *সংবাদ* ভাষা আন্দোলন বিরোধী ভূমিকা রাখে। *আজাদ* ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখলেও পত্রিকাটির নীতি ছিল অনেকাংশেই বৈপরীত্যমূলক। কারণ পত্রিকাটি অনেকক্ষেত্রেই বাংলা ভাষা বিরোধী সংবাদ, সম্পাদকীয় এবং নিবন্ধ প্রকাশ করে। এর বাইরে *পাকিস্তান অবজারভার, ইনসাফ* ও *মিল্লাত* ভাষা আন্দোলনের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখে। তবে ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই জনগণের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ প্রকাশের একটি ধারা ঢাকার সংবাদপত্রগুলোতে লক্ষ্য করা যায়।

১৯৫৪-৫৮ সাল পর্যন্ত সময়কাল ছিল পাকিস্তানের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যে পরিপূর্ণ। এ সময় ক্ষমতার ভাগ বণ্টন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যেমন দলাদলি ভাঙ্গন ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে তেমনি সমঝোতাও হয়েছে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময়ও রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে ঢাকার সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে মুসলিম লীগের অবস্থান নিম্নমুখী হলেও *আজাদ, মর্নিং নিউজ* এবং *সংবাদ*-সহ ঢাকার প্রায় সব দৈনিক মুসলিম লীগকে সমর্থন করে। অপরদিকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখেই সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয় *ইত্তেফাক*। পত্রিকাটি যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময় *মিল্লাত* এবং নির্বাচনের পর *সংবাদ* পত্রিকার মালিকানায় পরিবর্তন আসে। পরিবর্তিত মালিকানায় পত্রিকা দুটো হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগের সমর্থক এবং খসড়া সংবিধান বিরোধী অবস্থান নেয়। সার্বিকভাবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন জারির পূর্ব পর্যন্ত *ইত্তেফাক* আওয়ামী

Dhaka University Institutional Repository

লীগের, *পাকিস্তান অবজারভার* কেএসপি তথা কৃষক শ্রমিক পার্টির এবং *মর্নিং নিউজ* ও *আজাদ* মুসলিম লীগকে সমর্থন করে।

১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনকে কেন্দ্র করে *সংবাদ* মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এর সমর্থক হয়ে ওঠে। *আজাদ* এর ভূমিকা ছিল আওয়ামী লীগ বিরোধী এবং এ সময় পত্রিকাটি বিভিন্ন সংবাদ ও সম্পাদকীয়তে শাসন ব্যবস্থার ইসলামিকরণ অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক নীতির প্রকাশ ঘটায়। রাজনৈতিক বিভাজনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের বিষয়টিও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে সংবাদপত্রসমূহের ঐক্যবদ্ধ চেতনা বিকাশের পথে ছিল অন্তরায়। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের (সোহরাওয়ার্দী – আবুল হাশিম) সমর্থক হওয়ায় *ইত্তেহাদ* পত্রিকাকে পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগ সরকার কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরের অনুমোদন দেয়নি। ১৯৫৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর *ইত্তেফাক* বন্ধ হয়ে গেলে পত্রিকাটি এজন্য সরাসরি *আজাদ* ও মুসলিম লীগকে দায়ী করে। হামিদুল হক চৌধুরী মুসলিম লীগ থেকে বের হয়ে গেলে তার পত্রিকা *পাকিস্তান অবজারভার* কিছুদিন নিষিদ্ধ থাকে এবং বিষয়টিকে *মর্নিং নিউজ* অভিনন্দিত করে।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করার পর বিভিন্নভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়। ১৯৬২ সালের ৮ জুন সামরিক শাসন তুলে নেওয়ার পরও আইয়ুব খান সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। ফলে ১৯৬৩ সালে প্রণয়ন করা হয় সংশোধিত প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন অধ্যাদেশ। কিন্তু এসব নিবর্তনমূলক বিধিনিষেধের মধ্যেও *ইত্তেফাক, সংবাদ* ও *পাকিস্তান অবজারভার* বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি তথা অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে অবস্থান নেয়। বিশেষ করে *ইত্তেফাক* ও *সংবাদ* ১৯৬০ এর দশক জুড়েই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। *আজাদ* যেখানে আইয়ুব খানকে তোষণ করে বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশ করে সেখানে *ইত্তেফাক* ও *সংবাদ* স্বৈরাচার বিরোধী সংবাদ প্রকাশ করে নিয়মিত। এ সময় *আজাদ* রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশনা, রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালন ও ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। পত্রিকাটি ছয় দফারও বিরোধিতা করে। অপরদিকে ছয় দফার ভিত্তিতে জনমত সংগঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করে *ইত্তেফাক*। তবে ১৯৬০ এর দশক জুড়েই *আজাদ, ইত্তেফাক* ও *পাকিস্তান অবজারভার* পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকা রাখে। *ইত্তেফাক*– এর সাথে অন্যান্য পত্রিকার মূল পার্থক্য হলো *ইত্তেফাক* আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে একটি জাতীয় দাবিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়। মূলত প্রতিষ্ঠার পর থেকেই *ইত্তেফাক* বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা, দাবি উত্থাপন, শোষণ ও

Dhaka University Institutional Repository

বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরার ক্ষত্রে আপোশহীন ভূমিকা রাখে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে *ইত্তেফাক*-এর ভূমিকা অনন্যসাধারণ ও ঐতিহাসিক। কোনো ব্যক্তি তাঁর লেখা দিয়েই যে একটি জতিকে জাগাতে পারেন তাঁর প্রমাণ *ইত্তেফাক* সম্পাদক মানিক মিয়া। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে মাঠের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু আর বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন 'মোসাফির' তথা মানিক মিয়া। অপরদিকে *পাকিস্তান অবজারভার* পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য নিয়ে সোচ্চার থাকলেও ছয় দফাকে সমর্থন করেনি। ১৯৬০ এর দশকের শেষ থেকেই পত্রিকাটির একটি আপোশমূলক চেহারা পরিলক্ষিত হয়।

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানেও *আজাদ* বৈপরীত্যমূলক নীতির পরিচয় দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে পত্রিকাটি সামগ্রিক বিষয়কে ভারতীয় গোয়েন্দাদের তৎপরতা হিসেবে উল্লেখ করলেও একটি পর্যায়ে পত্রিকাটি সরকারের দমননীতির বিপক্ষে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পক্ষে ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে *ইত্তেফাক* নিষিদ্ধ থাকায় আগরতলা মামলা সম্পর্কিত খবর প্রকাশে *আজাদ* একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি *সংবাদ* আইয়ুব খান সরকারের কঠোর সমালোচনা এবং আন্দোলনের খবর প্রকাশ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে। অপরদিকে *পাকিস্তান অবজারভার* সরাসরি ছাত্রদের আন্দোলনে যোগদান করার বিরোধী ছিল। এসবের বাইরে ট্রাস্ট মালিকানাধীন *মর্নিং নিউজ* ও *দৈনিক পাকিস্তান* আইয়ুব আমল জুড়েই সরকারি পক্ষ অবলম্বন করে। তবে আসাদের মৃত্যুর পর *দৈনিক পাকিস্তান*-এর একটি পরিবর্তিত রূপ পরিলক্ষিত হয়। পত্রিকাটি এ সময় আন্দোলনের পক্ষে বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশ করে যা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও অভাবনীয়।

রাজনৈতিক আদর্শজনিত কারণে ঢাকার পত্রিকাগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বিভক্তি থাকলেও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ছয় দফার পক্ষে বাঙালি জনগণের রায় এসব পত্রিকাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে ভূমিকা রাখে। নির্বাচনের আগে ছয় দফার পক্ষে প্রচারণা ও জনমত তৈরিতে প্রধান ভূমিকা রাখে *ইত্তেফাক*। *দৈনিক পাকিস্তান* এর পরিবর্তিত অবস্থান এ সময়ও অব্যাহত থাকে এবং বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা বিবৃতি প্রচারণায় জনমত তৈরিতে পত্রিকাটির ভূমিকাও কম নয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নটি আসতেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে যুক্ত হয়। বাঙালিরা পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় আসবে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ সেটি মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়। শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখে *আজাদ*। এর সাথে

Dhaka University Institutional Repository

যুক্ত হয় *সংবাদ, ইত্তেফাক* ও *দি পিপল*। *দৈনিক পাকিস্তান* সরকারি পত্রিকা হলেও আন্দোলনের খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতে থাকে। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার ভূমিকা ছিল আপোশমূলক এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিতর্কিত।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৪৭-৭১(মার্চ) কালপর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে। তবে এ সময় সংবাদপত্রসমূহের চলার পথ মোটেও মসৃণ ছিল না। আলোচ্য সময়কালে আর্থিক সংকট ও অন্যান্য কারণে বিভিন্ন পত্রিকা বন্ধ হয়েছে। আবার মালিকানাও পরিবর্তিত হয়েছে। শাসক শ্রেণি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করতে আরোপ করেছে বিভিন্ন বিধিনিষেধ। পত্রিকার মালিকানার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক হওয়ায় পত্রিকার নীতিতেও এর প্রভাব পড়েছে। এসব কিছুই ছিল ১৯৪৭-৭১(মার্চ) কালপর্বে সংবাদপত্রের স্বাধীন মত প্রকাশের পথে অন্তরায়। এসব বাঁধা দূর করে অধিকাংশ পত্রিকাই শেষ পর্যন্ত 'বাংলাদেশ' প্রশ্নে একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট – ১

১৯৪৭-৭১(মার্চ) সময়কালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রের তালিকা

পত্রিকার নাম	**প্রথম প্রকাশ**	**প্রথম সম্পাদক**
জিন্দেগী	১৯৪৭	এস এম ফজলুল হক
পাকিস্তান অবজারভার	১৯৪৯	মোহাম্মদ শেহাবউল্লাহ
ইনসাফ	১৯৫০	মহীউদ্দীন আহমদ
সংবাদ	১৯৫১	খায়রুল কবীর
মিল্লাত	১৯৫১	মোহাম্মদ মোদাব্বের
আমার দেশ	১৯৫২	মহীউদ্দীন আহমদ
ইত্তেফাক	১৯৫৩	তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)
ইত্তেহাদ	১৯৫৫	কাজী মোহাম্মদ ইদরিস
বুনিয়াদ	১৯৫৫	শাহেদ আলী
চাষী	১৯৫৬	মুজিবুর রহমান খান
নাজাত	১৯৫৮	আব্দুস শহীদ
জেহাদ	১৯৬২	আবুল কালাম শামসুদ্দীন
পয়গাম	১৯৬৪	মুজিবর রহমান খান

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক পাকিস্তান	১৯৬৪	আবুল কালাম শামসুদ্দীন
সান্ধ্য দৈনিক আওয়াজ	১৯৬৭	আব্দুল গাফফার চৌধুরী
দি পিপল	১৯৬৯	আবিদুর রহমান
পূর্বদেশ	১৯৬৯	মাহবুবুল হক
দৈনিক সংগ্রাম	১৯৭০	আখতার ফারুক

সূত্র - জুলফিকার হায়দার, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা*, ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ২০১০

পরিশিষ্ট – ২

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা

নীতি – কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩. পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনায়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের ন্যায্য মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রীসভার আমলের পাট কেলেঙ্কারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪. কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে সকলপ্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. পূর্ববঙ্গকে লবণশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমস্ত উপকূলে কুটিরশিল্প ও বৃহৎশিল্পে লবণ তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণের কেলেঙ্কারি সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণির গরিব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকলপ্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৯. দেশে সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০. শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২. শাসন ব্যয় সর্বাত্মক ভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুষ্ঠ সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোনো মন্ত্রী এক হাজারের বেশি বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারী ব্যবসায়ীদের ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাবনিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করত বিনাবিচারে আটক বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্তমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলাভাষা গবেষণাগারে পরণত করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮. ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌম করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত সমস্ত বিষয় (অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনায়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পকিস্তান ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মানের কারখানা নির্মাণ করত পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্রবাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোনো অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবে।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।

সূত্র - হাসান হাফিজুর রহমান(সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪

পরিশিষ্ট– ৩

১৯৫৮ সালের সামরিক আইন জারি

Dhaka University Institutional Repository

Registered No. DA-1.

The Dacca Gazette

Extraordinary

Published by Authority

MONDAY, OCTOBER 13, 1958

PART V—**Acts of the National Assembly of Pakistan and Ordinances promulgated by the President.**

GOVERNMENT OF PAKISTAN

PRESIDENT'S SECRETARIAT

President's Order (Post-Proclamation) No. I of 1958

Karachi, the 10th October 1958

In pursuance of the Proclamation of the 7th October 1958, and of all powers enabling him in that behalf the President is pleased to make and promulgate the following Order:—

1. (1) This Order may be called the Laws (Continuance in Force), Order, 1958.

(2) It shall come into force at once and be deemed to have taken effect immediately upon the making of the Proclamation of the seventh day of October 1958, hereinafter referred to as the Proclamation.

(3) It extends to the whole of Pakistan.

2. (1) Notwithstanding the abrogation of the Constitution of the 23rd March, 1956 hereinafter referred to as the late Constitution, by the Proclamation and subject to any Order of the President or Regulation made by the Chief Administrator of Martial Law the Republic, to be known henceforward as Pakistan, shall be governed as nearly as may be in accordance with the late Constitution.

(2) Subject as aforesaid all Courts in existence immediately before the Proclamation shall continue in being and, subject further to the provisions of this Order, in their powers and jurisdictions.

(3) The law declared by the Supreme Court shall be binding on all Courts in Pakistan.

2441

Dhaka University Institutional Repository

(4) The Supreme Court and the High Courts shall have power to issue the writs of *habeas corpus*, *mandamus*, prohibition, *quo warranto* and *certiorari*.

(5) No writ shall be issued against the Chief Administrator of Martial Law, or the Deputy Chief Administrator of Martial Law, or any person exercising powers or jurisdiction under the authority of either.

(6) Where a writ has been sought against an authority which has been succeeded by an authority mentioned in the preceding clause, and the writ sought is a writ provided for in clause (4) of this Article, the Court notwithstanding that no writ may be issued against an authority so mentioned may send to that authority its opinion on a question of law raised.

(7) All orders and judgments made or given by the Supreme Court between the Proclamation and the promulgation of this Order are hereby declared valid and binding on all Courts and authorities in Pakistan, but saving those orders and judgments no writ or order for a writ issued or made after the Proclamation shall have effect unless it is provided for by this Order, and all applications and proceedings in respect of any writ which is not so provided for shall abate forthwith.

3. No Court or person shall call or permit to be called in question—

(i) the Proclamation;

(ii) any Order made in pursuance of the Proclamation or any Martial Law Order or Martial Law Regulation;

(iii) any finding, judgment or order of a special Military Court or a Summary Military Court.

4. (1) Notwithstanding the abrogation of the late Constitution, and subject to any Order of the President or Regulation made by the Chief Administrator of Martial Law, all laws, other than the late Constitution, and all Ordinances, Orders-in-Council, Orders other than Orders made by the President under the late Constitution, such Orders made by the President under the late Constitution as are set out in the Schedule to this Order, Rules, by-laws, Regulations, Notifications, and other legal instruments in force in Pakistan or in any part thereof, or having extra-territorial validity, immediately before the Proclamation, shall, so far as applicable and with such necessary adaptations as the President may see fit to make, continue in force until altered, repealed or amended by competent authority.

(2) In this Article a law is said to be in force if it has effect as law whether or not the law has been brought into operation.

(3) No Court shall call into question any adaptation made by the President under clause (1).

5. (1) The powers of a Governor shall be those which he would have had had the President directed him to assume on behalf of the President all the functions of the Government of the Province under the provisions of Article 193 of the late Constitution and such powers of making Ordinances as he would have had and within such limitations had Article 106 and clauses (1) and (3) of Article 102 of the late Constitution been still in force.

Dhaka University Institutional Repository

(2) In the exercise of the powers conferred by the previous clause the Governor shall act subject to any directions given to him by the President or by the Chief Administrator of Martial Law or by any person having authority from the Chief Administrator.

(3) Nothing in this Article shall prejudice the operation of any Regulation made by the Chief Administrator of Martial Law or by any person having authority from the Chief Administrator of Martial Law to make martial law Regulations and where any Ordinance or any provision thereof made under clause (1) of this Article is repugnant to any such Regulation or part thereof the Regulation or part shall prevail.

6. All persons who immediately before the Proclamation were in the service of Pakistan as defined under clause (1) of Article 218 of the late Constitution and those persons who immediately before the Proclamation were in office as Governor, Judge of the Supreme Court or a High Court, Comptroller and Auditor-General, Attorney-General or Advocate-General, shall continue in the said service or in the said office on the same terms and conditions and shall enjoy the same privileges, if any.

7. Any provision in any law providing for the reference of a detention order to an Advisory Board shall be of no effect.

ISKANDER MIRZA,
President.

Q. U. SHAHAB,
Secretary to the President.

SCHEDULE

1. The Karachi Courts Order, 1956.
2. The Federal Capital (Essential Supplies) Order, 1956.
3. The Adaptation (Security Laws) Order, 1956 (except so far as concerns the reference of a detention order to an Advisory Board).
4. The Stamp Act (Amendment) Order, 1956.
5. The Essential Services Maintenance (Adaptation) Order, 1956.
6. The Hoarding and Black Market Order, 1956.
7. The Karachi Courts (Amendment) Order, 1956.
8. The Karachi Rent Restriction Act (Amendment) Order, 1956.
9. The Requisitioned Land (Continuance of Powers) Order, 1956.
10. The University of Karachi (Amendment) Order, 1956.
11. The High Courts (Bengal) (Adaptation) Order, 1957.
12. The Karachi Development Authority Order, 1957.
13. The Karachi Development Authority (Amendment) Order, 1958.

Dhaka University Institutional Repository

14. The High Court Judges (Daily Allowances) Order, 1958.
15. The Federal Capital (Powers and Duties of the Chief Commissioner) (Declaration) Order, 1958.
16. The Federal Capital (Essential Supplies) (Amendment) Order, 1958.
17. The Gwadur (Government and Administration) Order, 1958 except clause (2) of Article 2.
18. The Gwadur (Government and Administration) (Application of Laws) Order, 1958.

Printed and Published by Naziruddin Ahmed, Officer on Special Duty, Home Department, at East Pakistan Government Press, Dacca.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট – ৪

সামরিক শাসনকে বৈধতা দিয়ে আইয়ুব খানের বিবৃতি

Dhaka University Institutional Repository

Registered No. DA-1.

The Dacca Gazette

Extraordinary

Published by Authority

WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 1958

PART IA—Orders and Notifications by the Government of Pakistan republished for general information

[*Republished from the Gazette of Pakistan, dated the 31st October, 1958.*]

Karachi, the 25th October 1958.

No. F. 81/Pres/58—The following Proclamation made by the President at 10-30 p. m. on the 7th day of October 1958, is hereby published for general information:

"For the last two years, I have been watching, with the deepest anxiety the ruthless struggle for power, corruption, the shameful exploitation of our simple, honest, patriotic and industrious masses, the lack of decorum and the prostitution of Islam for political ends. There have been a few honourable exceptions. But being in a minority, they have not been able to assert their influence in the affairs of the country.

"These despicable activities have led to a dictatorship of the lowest order. Adventurers and exploiters have flourished to the detriment of the masses and are getting richer by their nefarious practices.

"Despite my repeated endeavours, no serious attempt has been made to tackle the food crisis. Food has been a problem of life and death for us in a country which should be really surplus. Agriculture and land administration have been made a hand maiden of politics so that in our present system of Government, no political party will be able to take any positive action to increase production. In East Pakistan, on the other hand, there is a well organized smuggling of food, medicines and other necessities of life. The masses there suffer due to the shortages so caused in and the consequent high prices of, these commodities. Import of food has been a constant and serious drain on our foreign exchange earnings in the last few years, with the result that the Government is constrained to curtail the much needed internal development projects.

Dhaka University Institutional Repository

"Some of our politicians have lately been talking of bloody revolution. Another type of adventurers among them think it fit to go to foreign countries and attempt direct alignment with them which can only be described as high treason.

"The disgraceful scene enacted recently in the East Pakistan Assembly is known to all. I am told that such episodes were common occurrences in pre-partition Bengal. Whether they were or not, it is certainly not a civilized mode of procedure. You do not raise the prestige of your country by beating the Speaker, killing the Deputy Speaker and desecrating the National Flag.

"The mentality of the political parties has sunk so low that I am unable any longer to belive that elections will improve the present chaotic internal situation and enable us to form a strong and stable Government capable of dealing with the innumerable and complex problems facing us today. We cannot get men from the Moon. The same group of people who have brought Pakistan on the verge of ruination will rig the elections for their own ends. They will come back more revengeful, because, I am sure that the elections will be contested, mainly, on personal, regional and sectarian basis. When they return, they will use the same methods which have made a tragic farce of democracy and are the main cause of the present widespread frustration in the country. However much the administration may try, I am convinced, judging by shifting loyalties and the ceaseless and unscrupulous scramble for office, that election will neither be free nor fair. They will not solve our difficulties. On the contrary, they are likely to create greater unhappiness and disappointments leading ultimately to a really bloody revolution. Recently, we had elections for the Karachi Municipal Corporation. Twenty per cent. of the electorate exercised their votes, and out of these, about fifty per cent. were bogus votes.

"We hear threats and cries of civil disobedience in order to retain private volunteer organisations and to break up One Unit. These disruptive tendencies are a good indication of their partiotism and the length up to which politicians and adventurers are prepared to go to achieve their parochial aims.

"Our foreign policy is subjected to unintelligent and irresponsible criticism, not for patriotic motives, but from selfish view of points, often by the very people who were responsible for it. We desire to have friendly relations with all nations, but political adventurers try their best to create bad blood and misunderstanding between us and countries like the U. S. S. R., the U. A. R., and the Peoples Republic of China. Against India, of course, they scream for war, knowing full well that they will be nowhere near the firing line. In no country in the world, do political parties treat foreign policy in the manner it is done in Pakistan. To dispel the confusion so caused, I categorically reiterate that we shall continue to follow a policy which our interests and geography demand and that we shall honour all our international commitments, which, as is well known, we have undertaken to safeguard the security of Pakistan and, as a peace loving nation, to play our part in averting the danger of war from this troubled world.

"For the last three years, I have been doing my utmost to work the Constitution in a democratic way. I have laboured to bring about coalition after coalition, hoping that it would stabilise the administration and that the

Dhaka University Institutional Repository

affairs of the country would be run in the interests of the masses. My detractors, in their dishonest ways, have, on every opportunity, called these attempts as Palace intrigues. It has become fashionable to put all the blame on the President. A wit said the other day 'If it rains too much it is the fault of the President and if it does not rain it is the fault of the President'. If only I alone was concerned I would go on taking these fulminations with the contempt they deserve. But the intention of these traitors and unpatriotic elements is to destroy the prestige of Pakistan and the Government by attacking the Head of the State. They have succeeded to a great extent, and, if this state of affairs is allowed to go on, they will achieve their ultimate purposes.

"My appraisal of the internal situation has led me to believe that a vast majority of the people no longer have any confidence in the present system of Government and are getting more and more disillusioned and disappointed and are becoming dangerously resentful of the manner in which they are exploited. Their resentment and bitterness are justifiable. The leaders have not been able to render them the service they deserve and have failed to prove themselves worthy of the confidence the masses had reposed in them.

"The Constitution which was brought into being on 23rd March 1956, after so many tribulations, is unworkable. It is so full of dangerous compromises that Pakistan will soon disintegrate internally if the inherent malaise is not removed. To rectify them, the country must first be taken to sanity by a peaceful revolution. Then, it is my intention to collect a number of patriotic persons to examine our problems in the political field and devise a Constitution more suitable to the genius of the Muslim people. When it is ready, and at the appropriate time, it will be submitted to the referendum of the people.

"It is said that the Constitution is sacred. But more sacred than the Constitution or anything else is the country and the welfare and happiness of its people. As Head of the State, my foremost duty before my God and the people is the integrity of Pakistan. It is seriously threatened by the ruthlessness of traitors and political adventurers, whose selfishness, thirst for power and unpatriotic conduct cannot be restrained by a government set up under the present system. Nor can I any longer remain a spectator of activities designed to destroy the country. After deep and anxious thought, I have come to the regrettable conclusion that I would be failing in my duty, if I did not take steps, which, in my opinion, are inescapable in present conditions, to save Pakistan from complete disruption. I have, therefore, decided that:

(*a*) The Constitution of the 23rd March 1956 will be abrogated.

(*b*) The Central and Provincial Governments will be dismissed with immediate effect.

(*c*) The National Parliament and Provincial Assemblies will be dissolved.

(*d*) All political parties will be abolished.

(*e*) Until alternative arrangements are made, Pakistan will come under Martial Law. I hereby appoint General Mohammed Ayub Khan, Commander-in-Chief, Pakistan Army, as the Chief Martial Law Administrator and place all the Armed Forces of Pakistan under his command.

"To the valiant Armed Forces of Pakistan, I have to say 'that having been closely associated with them since the very inception of Pakistan, I have learnt to admire their patriotism and loyalty. I am putting a great strain on them. I fully realise this but I ask you Officers and men of the Armed Forces on your services depends the future existence of Pakistan as an independent Nation and a bastion in these parts of the Free World. Do your job without fear or favour and may God help you'.

"To the people of Pakistan, I talk as a brother and fellow compatriot. Present action has been taken with the utmost regret but I have had to do it in the interests of the country and the masses finer men than whom it is difficult to imagine. To the patriots and the law abiding, I promise you will be happier and freer. The political adventurers, the smugglers, the black-marketeers, the hoarders will be unhappy and their activities will be severely restricted. As for the traitors, they had better flee the country if they can and while the going is good.".

Q. U. SHAHAB,
Secretary to the President.

Printed and Published by Naziruddin Ahmed, Officer on Special Duty, Home Department, at East Pakistan Government Press, Dacca.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৫

আইয়ুব আমলে ৩৮ নং সামরিক বিধি

Dhaka University Institutional Repository

Martial Law ... respect of Court No. 1 for Dacca ... in
Against 2nd member—*For* "PA-3838 Capt A. H. KHATTACK",
Read PA-1186 Major M. K. SATTI, psc".

Order No. 37

Owners/Managers of all cinema houses throughout East Pakistan shall submit the details of the films screened in their cinema houses during the last three years viz. 1956, 1957 and 1958, to the Deputy Collector of Land Customs and Central Excise, 64, Husaini Dalan Road, Dacca by 15th January 1959 in the following pro forma:—

1. Name and Location of cinema house:
2. Particulars of the owner:

Date	Title of Film.	Time of screening		Print supplied by
		From	To	

False or fictitious details shall not be given.

Non-compliance of this Order shall be punishable under Martial Law Regulation.

Order No. 38

(*a*) Whoever makes a genuine complaint or report, or gives true information about any misdeeds or malpractices of any public servant or any other person shall not be harassed or victimized by any one in any manner.

(*b*) No person shall make a false or malicious complaint or peport, or give mischievous or misleading information against any person on any subject.

Contravention of this order shall be punishable under CMLA Regulation 16(*a*) which prescribes a maximum punishment of 14 years' rigorous imprisonment.

Place: *DACCA CANTT.*
Date: *13th December 1958.*

M. UMRAO KHAN,
Major-General,
Administrator, Martial Law Zone 'C'
(East Pakistan.)

By order of the Commander,
14 Division and Administrator,
Martial Law in East Pakistan,

A. ISLAM,
Dy. Secy. to the Govt. of East Pakistan.

Printed and Published by Naziruddin Ahmed, Officer on Special Duty, Home Department, at East Pakistan Government Press, Dacca.

পরিশিষ্ট – ৬

আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচি (১৯৬৬)

Dhaka University Institutional Repository

১. দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমনি হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে ফেডারেশন ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

২. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে। যথা – দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

৩. মুদ্রার বিষয়ে যে কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে –

ক. সমগ্র দেশের জন্য দুইটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে। অথবা

খ. বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্য কেবলমাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসু ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক ও অর্থ বিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

৪. ফেডারেশনের অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির সব রকম করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

৫. ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে। বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারে থাকবে। কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিই মিটাবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধা-নিষেধ থাকবে না। শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বসার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

৬. আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

সূত্র -*আমাদের বাঁচার দাবী, ৬ দফা কর্মসূচী*, প্রকাশক আব্দুল মমিন, প্রচার সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা - ২।

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

১. মুখ্য উপাদান

ক. সংবাদপত্র

১. *আজাদ*

২. *ইত্তেহাদ*

৩. *জিন্দেগী*

৪. *ইনসাফ*

৫. *সংবাদ*

৬. *মিল্লাত*

৭. *ইত্তেফাক* (সাপ্তাহিক ও দৈনিক)

৮. *দৈনিক পাকিস্তান*

৯. *পূর্বদেশ*

১০. *দৈনিক ইত্তেহাদ* (ভাসানী প্রকাশিত)

১১. *দৈনিক সংগ্রাম*

১২. *পয়গাম*

১৩. *সাপ্তাহিক গণশক্তি*

১৪. *মর্নিং নিউজ*

১৫. *পাকিস্তান অবজারভার*

১৬. *দি পিপল*

১৭. *দি হলিডে* (সাপ্তাহিক)

খ. সরকারি দলিলপত্র

Dhaka University Institutional Repository

১.*The Gazette of Pakistan* (1947-1971)

২. *The Dacca Gazette* (1947-1971)

২. গৌণ উপাদান

ক. ইংরেজি গ্রন্থ

- A. F. Salahuddin Ahmed, *Bengali Nationalism and the Emergence of Bangladesh, Dhaka: UPL, 1994.*
- A. B. M. Mofizul Islam, *Protection of the-Constitution and Fundamental Rights Under the Martial Law in Pakistan 1958-1962*, Dhaka : 1988.
- Ahmed Kamal, *State Against the Nation*, Dhaka: UPL, 2009.
- A. M. A. Muhith, *Bangladesh Emergence of a Nation,* Dhaka: 1987.
- A. K. Choudhury, *The Independence Of East Bengal: a Historical Process*, Dhaka: 1984.
- Alen Gledhil, *Pakistan, Development of its Law and Legislature,* London: 1957.
- Azizul Haque, *Trent's in Pakistan External Policy: 1947-1971*, Dhaka :1985.
- Badruddin Umar, *Political and Society in East Pakistan and Bangladesh*, Dacca: Mowla Brothers, 1973.
- C. H. Philips (ed.), *The Evolution of India and Pakistan, 1958-1947, Select Document*, London: OUP,1962.
- Geoff Eley and Ronald Grigor Sunny (ed.), *Becoming National: A Reader*, New York and Oxford: OUP, 1996.
- G. W. Choudhury, *Documents and Speeches on the Constitution of Pakistan,* Dacca: Green Book House, 1967.
- G. W. Choudhury, *The Last Days of united Paskistan*, Dhaka: UPL, 1998.
- Harun-Or Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh, Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1936-47,* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1987.
- Hasan Zaheer, *The Separation of East Pakistan: The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism*, Dhaka: UPL, 2001.
- Hemendra Prasad Ghose, *The Newspaper in India*, Calcutta: 1952.
- Joyoti Sen Gupta, *History of Freedom Movement in Bangladesh 1943-1973*, Calcutta: Naya Prakash, 1974.

Dhaka University Institutional Repository

- Jayanti Mitra, *Muslim Politics in Bengal 1855-1906: Collaboration and Confrontation,* Culcutta: K.P. Bagchi Co., 1948.
- James Edgar Swain, *A History of World Civilization,* New York: Mcgraw-Hill Book Co., 1947.
- Kamal Hossain, *Bangladesh Quest for Freedom and Justice,* Dhaka: UPL, 2013.
- Kamruddin Ahmed, *The Social History of East Pakistan,* Dhaka: Progoti Publishers, 1967.
- Karl Von Vorys, *Political Development in Pakistan,* London: Oxford University Press, 1965.
- Keith Callard, *Pakistan – A political Study,* London, George Allen & Unwin Ltd., 1958.
- Md. Abdul Wadud Bhuiyan, *Emergence of Bnagladesh and Role of Awyami League,* Dhaka: Punjeree Publication Ltd., 2008.
- Mohammad Ayub khan, *Friends Not Masters: A Political Autobiography,* London: OUP, 1967.
- Muhammad Enamul Haq, *A History of Sufism in Bengal*, Dhaka: Asiatic Society of bangadesh.
- Mrinal Kanti Chandra, *History of the English Press in Bengal, 1780-1857,* Calcutta: South Asia Books.
- Munir Ahmed, *Legislatures in Pakistan, 1947-1958,* Lahore: Department Of Political Science, University of Panjab.
- Najma Chowdhury, *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-58, Dacca: University of Dacca, 1980.*
- Nehal Karim, *The Emergence of Nationalism in Bangladesh,* Dhaka: University of Dhaka, 1992.
- Penderal Moon, *Divide and Quit*, London: Chatto and Windus, 1967.
- Rushbrook Williams, *The State of Pakistan*, London: Faber and Faber, 1962.
- Rangalal Sen, *Political Elite in Bangladeshi,* Dhaka: UPL, 1986.
- Rounaq Jahan, *Pakistan Failure in National Integration*, Dhaka: UPL, 2001.
- Shaikh Maqsood Ali, *From East Bengal to Bangladesh*, Dhaka: UPL, 2009.
- Shireen Hasan Osmany, *Evolution of Bangladesh*, Dhaka: A H Development Publishing House, 2014.
- S. A. Akanda (edited), *Studiesin Modern Bengal,* Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1981.

Dhaka University Institutional Repository

- Talukder Moniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh,* Dhaka: Bangladesh Book International, 1975.
- Talukdar Moniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and its aftermath,* Dhaka: UPL, 1988.

খ. বাংলা গ্রন্থ

- অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫,* ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০৪।
- অনুপম সেন, 'বাংলাদেশ সংগ্রামের সামাজিক পটভূমি', *রক্তাক্ত বাংলা,* মুজিবনগর/ ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭১/২০০৯।
- আজিজুর রহমান মল্লিক, *বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান,* (দিলওয়ার হোসেন অনূদিত), ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮২।
- আতাউর রহমান খান, *স্বৈরাচারের দশ বছর,* ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০১।
- আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন : অর্থনৈতিক পটভূমি,* ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৯০।
- আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাঙালি মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান,* ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৯, পৃ. ৩৫।
- আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি,* ঢাকা : খোশরোজ পাবলিকেশনশ লিমিটেড, ১৯৬৮।
- আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০১৫।
- আবুল ফজল, *সাংবাদিক মুজিবর রহমান,* ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৬৭।
- আবদুল হক, *চেতনার এলবাম এবং বিবিধ প্রসংগ,* ঢাকা : বাংলাদেশ একাডেমি, ১৯৯৩।
- আবদুল হক, *ভাষা আন্দোলনের আদি পর্ব,* ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৬।
- আবদুর রউফ, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার নাবিক জীবন,* ঢাকা : প্যাপিরাস প্রকাশনী, ১৯৯২।
- আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি,* অখণ্ড সংস্করণ, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ২৩২।
- আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস,* ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।
- আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি,* ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৩।
- আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব,* ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০।
- ইসরাইল খান, *পূর্ববাংলার সাময়িকপত্র, ১৯৪৭-১৯৭১,* ঢাকা : বাংলা একাডেমি। ১৯৯৯।
- এম. আর. আখতার মুকুল, *ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা,* ঢাকা : শিখা প্রকাশনী, ২০১৪।
- এম. আর. আখতার মুকুল, *পাকিস্তানের চব্বিশ বছর ভাসানী মুজিবের রাজনীতি,* ঢাকা : সাগর পাবলিসার্স, ১৯৬৯।
- এস এস বারনভ, *পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য (১৯৪৭-৭১),* ড. তাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

- এ টি এম আতিকুর রহমান, *বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মহাম্মদ আকরম খাঁ,* ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫।
- কে. জি. মুস্তাফা, *সিরাজুদ্দিন হোসেন তৎকালীন রাজনীতি ও সাংবাদিকতা,* সেমিনার, সিরডাপ মিলনায়তন, ২৬ ডিসেম্বর, ২০০১।
- কর্নেল শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা,* ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১১।
- কৃষ্ণ ধর ও অন্যান্য(সম্পাদিত), *বাংলার ক'জন সেরা সাংবাদিক,* প্রবন্ধ সংকলন, কলকাতা : গণমাধ্যম কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৩।
- খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক,* ঢাকা : বর্তমান সময়, ২০১০।
- খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম,* ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪।
- গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি,* ঢাকা: অবসর, ২০০৬, পৃ. ২৩।
- গোলাম মুরশিদ, *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ রবীন্দ্র চর্চা,* ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮১।
- জুলফিকার হায়দার, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা,* ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ২০১০।
- জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস,* ঢাকা : সুবর্ণ, ২০০৯।
- জেমস যে নোভাক, *বাংলাদেশ : জলে যার প্রতিবিম্ব,* ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৫।
- ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১,* ঢাকা : ২০০৮,বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী।
- ড. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা,* ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩।
- ড. মোঃ মাহবুবুর রাহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১,* ঢাকা : সময়,২০০৫।
- ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০ থেকে ১৮৭১,* ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০১৩।
- ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস,* কলিকাতা: এহাকিম এণ্ড সন্স, ১৯৯৬।
- ড. সুকুমার বিশ্বাস, *অসহযোগ আন্দলন'৭১ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব,* ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।
- তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর,* ঢাকা : বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, ১৯৮১।
- তারিক আলী, *পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ : জান্তা না জনতা,* ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭।
- তপন বাগচী, *তৃণমূল সাংবাদিকতার উন্মেষ ও বিকাশ,* ঢাকা : ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার, ১৯৯৯।
- দেবেশ ভট্টাচার্য, *উপনিবেশে সমাজ ও বাংলা সাংবাদিকতা গদ্য,* কলকাতা : ১৯৯০, পৃ.৭৭।
- দেলওয়ার হাসান, *বাংলাদেশের স্বাধিনতার পটভূমি মানিক মিয়া ও সমকালীন রাজনীতি,* ঢাকা : মানিক মিয়া রিসার্চ একাডেমি, ১৯৯৬।
- নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস: আদি পর্ব,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃ. ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

- নুরুল হুদা (সম্পাদিত), আবদুল হক, *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা, প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ১৯৫৩-'৭৩*, ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৯৬।
- *প্রেসক্লাব স্মরণিকা*, ঢাকা, ১৯৯৯।
- প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, মোনায়েম সরকার, ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০১৩।
- ফয়েজ আহমদ, *'আগরতলা মামলা', শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪।
- বশীর আলহেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০৩।
- বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯৯৫।
- রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *৭১ এর দশমাস*, ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ২০১২।
- মোঃ এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮।
- মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, ঢাকা : নভেল পাবলিশিং হাউজ, ২০১৩।
- মোঃ শাহ আলমগীর (সম্পাদিত), *বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম*, ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ২০১৩।
- মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, *মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন*, ঢাকা : ১৯৮৩।
- মোরশেদ শফিউল হাসান, *স্বাধীনতার পটভূমি ১৯৬০ দশক*, ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ২০১৪।
- মোনায়েম সরকার (সম্পাদিত), *বাঙালির কণ্ঠ*, ঢাকা : বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ১৯৯৯।
- মাহমুদউল্লাহ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা : গতিধারা, ১৯৯৯।
- মাহফুজ উল্লাহ, *পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গৌরবের দিনগুলি*, ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশনস, ২০১২।
- মাযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪।
- মনসুর মুসা (সম্পাদিত), *বাঙলাদেশ*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।
- মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, *স্মরণীয় সাংবাদিক*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭।
- মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *মোহাম্মদ আক্রম খাঁ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭।
- মুহম্মদ শামসুল হক, *স্বাধীনতার সশস্ত্র প্রস্তুতি: আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অপ্রকাশিত জবানবন্দি*, চট্টগ্রাম : বলাকা, ২০০৯।
- মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ, ১৯৮৭।
- মুনতাসির মামুন, জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ১৯৪৭-১৯৯০*, ঢাকা : সময়, ২০১৪।
- মুনতাসির মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ ও সাময়িকপত্র*, ২য়, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।
- মুনতাসির মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ ও সাময়িকপত্র*, ৩য়, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

- মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, *বং বঙ্গ বাঙ্গালা বাংলাদেশ*, ঢাকা : সময়, ১৯৯৯।
- মনি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১।
- মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা : ইউপিএল, ২০১৫।
- রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও আন্দোলন (১৯৪৭-৭১)*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬।
- রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় : একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য*, ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।
- লেনিন আজাদ, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৯৭।
- লে. ক. আব্দুর রউফ, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার জীবন*, ঢাকা : প্যাপিরাস প্রকাশনী, ১৯৯২।
- সীমা মোসলেম, কাজী শফিকুর রহমান, সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস ১৭৮০-১৯৪৭*, ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ২০১৫।
- সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।
- সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।
- সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা, তত্ত্ব ও পদ্ধতি*, ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ২০০০।
- সাহিদা বেগম, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, ঢাকা: ২০০০।
- হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও সপ্তম খণ্ড), ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২।

গ. ইংরেজি প্রবন্ধ

- Golam Morshed, ‘Pakistan’s 1970 Elections and the Liberation of Bangladesh: A Political Analysis’, *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol. XL, 1988.
- M. Rashiduzzaman, ‘The Awami League in the Political Development of Pakistan’, *Asian Survey*, Vol. X, No. 7, July 1970.
- Rfiqul Islam, ‘The Bengali Language Movement and Emergence of Bangladesh’, *Asian Studies*, Vol. XI, 1978.
- S. A. Akanda, ‘The 1962 Constitution of Pakistan and the Reaction of the people of Bangladesh’, *The journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol. III, 1978, p.71.
- S. A. Akanda, ‘Was Parliamentary System of Government a Failure in Pakistan? A Case Study of a Constitutional Debate in Pakistan during Martial Law, 1958-1962’, *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol. VI, 1982-83.

Dhaka University Institutional Repository

- S. A. Akanda, 'The National League Issue: Potent Force for Transforming East Pakistani Regionalism into Bengali Nationalism', *Journal of the Institute of Bangladesh Studies(IBS),* Vol. I, No. 1, 1976.
- S. A. Akanda, 'The Working of the Ayub Constitution of Pakistan and the People of Bangladesh', *Journal of the Institute of Bangladesh Studies(IBS),* Vol. IV, 1979-80.

ঘ. বাংলা প্রবন্ধ

- আশা ইসলাম, 'জাতীয়তাবাদ', *বাংলাপিডিয়া,* ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭ (সিডি সংস্করণ)
- আজিজুর রহমান মল্লিক, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ভিত্তি', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১,* ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ৫৪১।
- আজম বেগ, 'চৌধুরী হামিদুল হক', *বাংলাপিডিয়া,* ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭ (সিডি সংস্করণ)।
- আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা : সমস্যা ও সম্ভবনা', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,* সংখ্যা ৪১, অক্টোবর ১৯৯১।
- আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও এস. এম. রেজাউল করিম, '১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার ও পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া', *সমাজ নিরীক্ষণ,* ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, নং ৮৭, ২০০৩।
- আবুল কাশেম, 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন : প্রকৃতি পরিধি', *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা,* সংখ্যা : ২৩-২৪, ১৪০২-০৪।
- ইসরাইল খান, 'সমকালের সংস্কৃতি ১৯৫৭-৭৭', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* চতুর্দশ খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৬।
- এ. বি. এম. মুসা, 'রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংবাদপত্রের ভূমিকা', *পয়তাল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণিকা,* জাতীয় প্রেস ক্লাব, অক্টোবর, ১৯৯৯, পৃ. ৩১।
- কামালউদ্দিন আহমেদ, 'চুয়ান্ন সালের নির্বাচন : স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গ', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১,* ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ৪৭১।
- জাকির হোসেন রাজু, 'উনিশ শতকে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ', *নিরীক্ষা* (বিপিআই), জুন, ১৯৯০।
- নিরঞ্জন হালদার, 'মানিক ভাই ও বংলাদেশের স্বাধীনতা', *ইত্তেফাক: তফাজ্জল হোসেন স্মৃতি সংখ্যা,* আগস্ট, ১৯৭৩।
- বদরুদ্দীন উমর, 'ভাষা আন্দোলন', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১,* ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ৪৩৩।
- মোহাম্মদ শাহ, 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১,* ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ৭৩০।
- মাহবুব-উল-আলম, 'মহান সত্তা', *ইত্তেফাক: তফাজ্জল হোসেন স্মৃতি সংখ্যা,* আগস্ট, ১৯৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

- মোঃ শামসুল আলম, 'ছয় দফা আন্দোলন আনুপূর্বিক ইতিহাস', *The JahangirnagarRivew, Part – CN, Vol. – 1997-98, p.13.*
- মোঃ এমরান জাহান, 'উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙালি মুসলমানের ভাষা সংকট', *Clio,* Journal Of the Dept. of History Jahangirnagar University, Vol. XX, June, 2003.
- মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, '১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়', *আইবিএস জার্নাল,* ১৪০৪-১৪০৫, রাজশাহী।
- মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, 'সেকালের ঢাকা, সংস্কৃতি চর্চা', *দৈনিক জনকণ্ঠ ঈদুল ফেতর সংখ্যা,* ১৯৯৯।
- মেজবাহ কামাল, 'উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : একটি সমীক্ষা', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,* ত্রয়োদশ সংখ্যা কার্তিক ১৩৩২ (অক্টোবর ১৯৮৫)।
- মুহম্মদ নূরুল কাইয়ুম, 'বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতার উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* চতুর্দশ খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৮।
- মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, 'ছয় দফা আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা', *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা,* সংখ্যা: ২৩-২৪, ১৪০২-০৪।
- মুস্তফা নূর-উল-ইসলাম, 'আধুনিক জনমতের উন্মেষ ও সাময়িকপত্র সাধনা', *মুসলিম বাংলা সাহিত্য,* রাজশাহী, মিত্রসংঘ – ১৯৬৮।
- রেহমান সোবহান, 'বাঙালী জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১,* ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ৬১২।
- রাশেদ খান মেনন, 'চৌষট্টির ছাত্র আন্দোলন', *বিচিত্রা* , ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭।
- শাহ আহমদ রেজা, 'স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা : সমস্যার কতিপয় দিক', আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা,* ঢাকা : ১৯৯৩।
- সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ', সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন,* ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ৪২০।
- সৈয়দ মুর্তজা আলী, 'বাংলাদেশের সংবাদপত্র : ইতিহাস ও ঐতিহ্য', *নিরীক্ষা,* বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।
- সাঈদ-উর-রহমান, 'আইয়ুব খানের আমলে জাতীয় ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,* ৭ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১৮৪।
- সানাউল্লাহ নূরী, 'সভ্যতার বিবর্তন এবং বাংলা সংবাদপত্রের বিকাশের যুগ', *জাতীয় প্রেস ক্লাব স্মরণিকা,* ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

- সীমা মোসলেম, 'বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস : একটি রূপরেখা ১৭৮০-১৯৪৭', *নিরীক্ষা*, ঢাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮।
- 'সিরাজুদ্দীন হোসেন : তৎকালীন রজনীতি ও সাংবাদিকতা', শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন স্মৃতি পরিষদ কতৃক আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, সিরডাপ মিলনায়তন, ঢাকা, ২৬ ডিসেম্বর, ২০০১।

ঙ. অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ

- দিল আরা আক্তার, *১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার*, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, ঢাকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।
- বীনা রানী রায়, *বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী ১৯৪৭-১৯৭১*, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, ঢাকা, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।
- মোঃ খায়রুল আহসান সিদ্দিকী, *বাংলাদেশের রাজনীতি ১৯৫৩-১৯৬৬*, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬।
- মোশারফ হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা*, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, ঢাকা, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪।

Dhaka University Institutional Repository